জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ, ১৩৬১

প্রকাশক :—
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত
৫।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট
শ্রীনরেন মল্লিক

মুদ্রক—
শ্রীপরিতোষ রায়
আর্থিক জগৎ প্রেস
১২২, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রুফ-রীডার—
বন্দ মিত্র

চার টাকা

এই উপন্যাসখানি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সামান্য কাটছাঁট করিয়া এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল।

—প্রকাশক

মফস্বল শহর। হাল আমলের সব কিছুই এসে গেছে এখানে। সিনেমা, চুল কাটার সেলুন, নিউকাট্, হাই-হিল্ থেকে শুরু করে পণ্ডিত জওহরলালের ডিস্‌কভারী অব ইণ্ডিয়ার মতো বই রাখা হয় এমন ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর, কলেজ, পার্ক, পাম্প-করে-জল-তুলে-রাখা সাঁতারু পুকুর, পরিচ্ছন্ন পথঘাট, ক্লাব, টেনিস-মাঠ, কি নেই এখানে, কি না হয়েছে এখন এই ক্ষুদে শহরে।

হয়নি ট্রাম বাস। কিন্তু তাতে কি। নতুন ঝক্‌ঝকে এক ডজন সাইকেল-রিক্সা আমদানী হয়েছে ইদানিং। ঘোড়ার গাড়ি আছে চলাফেরার স্থবিধার জন্যে। আর এসে গেছে, প্রায়ই চোখে পড়ে দামী নতুন মডেলের ক'টি বিচিত্র রঙের মনোহর মোটরগাড়ি। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে।

ট্রাম বাস নেই বলেই উকিল অটলবাবু হাসপাতালের লাল সুড়কি-ঢালা নির্জন রাস্তা ধরে বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোন যোগীন ডাক্তার অনায়াসে এসে তাঁর সঙ্গে পা মিলাতে পারেন, কথা কইতে পারেন মুখের কাছে মুখ নিয়ে, হাত নেড়ে, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে।

ট্রাম বাস শহরে না থাকায় আর একটা অস্থবিধা হল এই যে, অটলবাবুর ছেলে নিশানাথ তার সুন্দর ছ'ফুট শরীরে গিলে-করা আদ্দীর পাঞ্জাবী চড়িয়ে, সিগারেটের টিন হাতে, প্রায় আরাম কেদারায় বসার মত দুই পা ছড়িয়ে পিঠ ঢেলে দিয়ে রিক্সায় চেপে হেলতে দুলতে কোন কোন দিন ব্যাঙ্কে যায়। নিরঞ্জন রায়ের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কখন অফিসে যাচ্ছে কখন অফিস থেকে ফিরল কারো কারো চোখে এটা নির্ভুল নিয়মে ধরা পড়ে বৈকি।

যেদিন গায়ে টাই-স্যুট থাকে সেদিন নিশানাথ রিক্সার পিঠে হেলান না দিয়ে সোজা হয়ে বসে। সবল উন্নত ঋজু শক্ত শরীর একটু নড়ে না, যত জোরে গাড়ি চলুক। কেবল বুকের গোলাপ ফুলটা কাঁপতে থাকে বাতাসে। টকটকে লাল গদীওলা রিক্সা মেহগনীর মতো কালো প্রকাণ্ড নিশানাথকে নিয়ে বকুলবাগান রাস্তার বাঁক ঘুরে হাসপাতালের লাল সড়কে গিয়ে পড়ে, তারপর রৌদ্র ও ছায়া খেয়ে খেয়ে গাড়ি চলে যায় আদালত ট্রেজারী বাজার ও ব্যাঙ্ক যেখানে আছে সেই ব্যস্ত কিঞ্চিৎ জনবহুল মহল্লার দিকে।

মেহেদি-বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক জোড়া চোখ রাস্তার দিকে মেলে ধরে যে মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দুবেলা সে ঢাকনা গুটানো রিক্সার ওপর নিশানাথকে দেখতে পায় বৈকি। প্রাণ ভরে দেখে। মন্দগতি গাড়ির কল্যাণে এটা হয়েছে, ভাবে হয়ত মেয়েটি, আর গাঢ় নিশ্বাস ফেলে। আর হাত দিয়ে কপালের শুকনো একটু বা বাদামী রঙের চুল মুহুর্মুহু কানের ওপিঠে ঠেলে দেয়। বেড়ালের চোখের মত কটা চকচকে চোখ। বেজায় ফর্সা গায়ের রং। বাঙালী মেয়ের এত ফর্সা রং, হঠাৎ চোখে পড়লে বা কেউ প্রথম দেখলে চমকে ওঠে। মোটা নাক। মোটা ও বেঁটে নাক, বড় চোয়াল, আর কটা চক্ষু সত্ত্বেও এই মেয়ের চেহারার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, দেখলে মনে হয় ভারি সরল ও অল্পেতেই সন্তুষ্ট, নিজের একটু সুখসুবিধা বজায় থাকলে পৃথিবীতে আর কিছু চাইবার নেই ওর, বা আর কিছু নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। বা এমনও মনে হয়, অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মগজ নেই এই মেয়ের। যেন একটা ভাবনার ওপর আর একটা এসে গেল বা কেউ ওর মাথায় চাপিয়ে দিলে ও

মহাফাঁপরে পড়বে, কটা রঙের চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে, যতক্ষণ না চোখে জল এসে যায়। মোটা চেপ্টা নাক কান্নার ধমকে আরও বেশি ফুলে ওঠে তখন, আর কী সাংঘাতিক বোকা মনে হয় উনিশ বছরের মেয়েকে। অথচ এত ফর্সা, তার উপর এমন নধর স্বাস্থ্য। রমণীয় লোভনীয় শরীর বলতে এই শরীরকেই বোঝায়। এই শরীরে এই মন শিশুর মতো মনের এই অসহায়তা, কি আবেগ, এদিনে কেমন অদ্ভুত ঠেকে, অবাস্তব। শহরের আর পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে মেলে না। অবশ্য আর পাঁচটি মেয়ে থেকে ও আলাদাও হয়ে আছে। মেহেদি বেড়ার ওপারে ও বন্দিনী। বাইরে যাওয়া নিষেধ অনেকদিন। অনেকদিন সে বাইরে যায় না। ফাঁক পেলেই মেহেদির গা ঘেঁসে চেরী নিঝুম দাঁড়িয়ে থাকে। মোমের মত ওর নরম সাদা চামড়ায় কাঁটা ফুটলেও বুঝি তখন দিশা থাকে না, চোখ রাস্তার দিকে। পুরুষের চতুষ্কোণ বিশাল একটা পিঠ রিক্সার ঝাকুনিতে কেমন পাহাড়ের মত কেঁপে কেঁপে উঠছে, চেরী দেখছে আর পাহাড়ের বুকের ভিতরের কাঁপুনির মতো ওর বুকের ভিতর কাঁপে তখন। মেহেদীর একটা ডাল ও শক্ত করে চেপে ধরে নরম মাংসল হাতে। নিশানাথকে আর একজনের চোখের সামনে দিকে রোজ যাওয়া আসা করতে হয়।

হস্‌পিট্যাল্ রোডের লাগোয়া শিক্ষয়িত্রী কোয়ার্টার।

অরুণা সেন বাসা নিয়েছেন এখানে। নতুন হেড্‌মিসট্রেস।

এই শহরের মেয়ে-স্কুলের এই প্রথম হেডমিসট্রেস এলেন, যিনি কুমারী, অল্প বয়েস, এম এ পাশ। চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার সময় কুল পরিচয় নেওয়া হয়নি যাঁর। গোড়ায় মেয়ে স্কুলের হেডমিসট্রেস

ছিল না। ছেলে-স্কুলের হেডমাষ্টার নীলকণ্ঠবাবু যখন বার্ধক্যের দরুণ সেই স্কুলের চাকরি হারাণ তখন জীবিকার শেষ অবলম্বন-স্বরূপ এবং কতকটা মেয়ে-স্কুলের কমিটির আমন্ত্রণে অর্ধেক বেতনে তিনি মেয়েদের উঁচু ক্লাশে এক ঘণ্টা করে কেবল ইংরেজী পড়াতে রাজী হন।

আইভ্যান হো'র গল্প। ডেভিড কপারফিল্ড।

নীলকণ্ঠবাবু বড় মেয়েদের পড়াতে পড়াতে সেই বছরের ম্যাট্রিকের ফল বেরোবার আগেই নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হয়ে পরলোকগত হন। তারপর আসে প্রথম প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। সেই থেকে সুরু।

সেদিন থেকে আজ, অর্থাৎ অরুণা পর্যন্ত গার্লস স্কুলের এই তৃতীয় হেডমিস্ট্রেস নিযুক্ত হল।

শহর অগ্রসর হয়েছে এই জন্যে যে অরুণা যেদিন প্রথম এখানে আসে রেল ষ্টেশনে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গিছল। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী, বার-লাইব্রেরীর সেক্রেটারী অতুল দত্ত, স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট হরদয়াল চক্রবর্তী, যোগীন ডাক্তার এবং শহরের মান্যগণ্য এমনি আরও দু'একজন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন নতুন হেডমিস্ট্রেসকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে। ছিমছাম চোখে চশমা একটি মেয়ে। একটা সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে ট্রেণের কামরা থেকে নামল, সঙ্গে কেউ নেই। দূরদেশে আসছে মাষ্টারি করতে, দেশ ওর কোথায়, কে-ই-বা ওর আছে সেখানে এসব কোনো প্রশ্নই সেদিন কারোর মনে ছিল না। এমন একটি বিদুষী মেয়ে মফস্বলের ছোট্ট একটা স্কুলের দায়িত্ব নিতে রাজী হয়েছে এতেই এখানকার মেয়েদের অভিভাবকরা কৃতার্থবোধ করেছেন। কেননা, মেয়েদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাবা

তাগিদ এসে গেছে ঘরে ঘরে। ভাল করে গার্ল্স স্কুলটা দাঁড় করাও। অন্য শহর থেকে আমাদের এই শহর পিছিয়ে আছে নাকি কেনো দিক থেকে। বেশি টাকা দিয়ে তিনটে পাশ করা ভাল হেডমিস্ট্রেস আনানোর দরকার এখন।

ভিড়ের পিছনে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে অরুণা এই নিশানাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

অভিনন্দনে অংশ গ্রহণ না ক'রে সুন্দর শোভন বেশে সজ্জিত হয়ে সকলের থেকে একটু আলাদা হয়ে একটি যুবকের অন্যমনস্কের মত অন্য দিকে তাকিয়ে থাকা এবং অরুণাকে দেখবার জন্যে একবারও ঘাড় না ফেরানোর অর্থ তেইশ বছরের চতুরা অরুণা বুঝল। তিনটে আধুনিক শহর সে ঘুরে এসেছে এবং এই শহরেও আধুনিকতার ছোঁয়াচ লেগেছে প্রথম দিনই সে টের পেল। আধুনিক ছেলে কোনো মেয়ের দিকে মুখোমুখি তাকায় না, সরা-সরি। আমি দেখব কি, মেয়েটি আমাকে দেখুক। এই ভাব। এবং এই ভাব নিয়ে যুবক ভাল কাপড়চোপড় প'রে একটি নতুন রিক্সায় চেপে শিক্ষয়িত্রী কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে রোজ যাওয়া আসা করছে। অরুণা তাই ভেবেছিল প্রথম দু'দিন। তারপর শুনল,—না, শহরে একটা খুব বড় ব্যাঙ্ক এসেছে ইদানিং। নিশানাথ তার ম্যানেজার। এই রাস্তা দিয়ে সে অফিসে যায়। অবিবাহিত। বয়স তার খুব বেশি কি। এ বয়সে ও চাকরিতে এমন উন্নতি করবে কেউ কি আশা করেছিল। তিনবার বি এ ফেল্ ক'রে বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোলকাতা চলে গিছল। তিন বছর পরে ফিরে এসেছে এত ভাল ছেলেটি হয়ে। নিরঞ্জন রায়ের ডান হাত। নিশানাথ ছাড়া তার ব্যাঙ্ক নাকি অচল।

অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে সুশীলা, গণিতের শিক্ষয়িত্রী সুশীলা বোস বলছিল, 'কে কোন দিক দিয়ে জীবনে উন্নতি করে বলা তো যায় না।' সুশীলা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলেছিল।

'তুমি চিনতে ওঁকে ?' অরুণা প্রশ্ন করেছিল।

'আমাদের পাড়ার ছেলে আমি চিনব না!' ক্ষুব্ধ হয়েছিল সুশীলা। 'বেশ ভাল ক্যারম খেলতে জানে। আমরা একসঙ্গে বসে কত খেলেছি।'

সুশীলা অতীতের ভাণ্ডার উপুর ক'রে দিয়ে সব বলল। অটলবাবু একবার এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। সুশীলার মা ছিল তখন হেডমিসট্রেস। এই সুবাদে নিশানাথ কোয়ার্টারে আসত। সুশীলা স্কুলে পড়ত। নিশানাথ সুশীর মাকে ডাকত মাসীমা।

'তারপর ?' রুদ্ধশ্বাস হয়ে প্রশ্ন করেছিল অরুণা।

তারপর সুশীলা আর কিছু বলেনি। এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল ওর গাল বেয়ে।

শুকনো শক্ত চোয়াল মেয়েটির। বিধবা। হেডমিস্ট্রেস মা-ও বেঁচে নেই। বাপ ছিল। কি একটা কারণে সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে সন্ন্যাসী সেজে আগেই বেরিয়ে যায়। জীবিকার জন্যে সুশীলা এখন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

নিশানাথের রিক্সার দিকে অদ্ভুতভাবে শ্যামাঙ্গী সুশীর তাকিয়ে থাকার অর্থ অরুণা বুঝল। আর কোনো প্রশ্ন করেনি তাকে এই নিয়ে। এবং তারপর যতবার সেই রিক্সা এই রাস্তা ধরে যাচ্ছে কি আসছে সুশী গেছে দরজায় ঠিক সময়টিতে।

শহরের যে জায়গাটা আরও জনবিরল, ট্রাম বাস দূরে থাক তেমন দু'দশটা ঘরবাড়ীও ওঠেনি এখন পর্যন্ত; এই শুধু তৈরী হয়েছে, নদীর

ধার ধরে প্রকাণ্ড প্রশস্ত পীচ ঢালা কালো ঝক্‌-ঝকে পথ। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুপাশের বাদাম গাছের ডালে কালো কালো সব বাদুর ঝুলে থাকে। ভয়ঙ্কর নির্জন সেই রাস্তায় মেঘের মতো ঘোলাটে রঙের একটা অতিকায় ষ্টুডিবেকার যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলছিল। খুব আস্তে।

সুন্দর জায়গায় এসেছে তারা 'এ শহর এমন সুন্দর আমার জানা ছিল না।' নিরঞ্জন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এখানে ভাল লাগছে তো, পপি ?'

পপি মাথা নাড়ল। গাড়ির বাইরে ওর চোখ। মোমের পুতুলের মত ছোট্ট একটি শরীর। হাল্কা, বেশ পাত্‌লা গড়ন। 'ও যে কত নরম আর কী অসম্ভব দুর্বল।' নিরঞ্জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে বলত আগে আগে।

তাই বুঝি এই অদ্ভুত স্বাস্থ্য! বিশেষ করে আজকাল একটা জায়গায় গিয়ে তিনদিন পপির শরীর ভাল থাকছিল না। তাই নিয়ে নিরঞ্জনের অবশ্য ভাবনারও অন্ত নেই।

অথচ ব্যবসার খাতিরে নিরঞ্জনকে ঘোরাঘুরি না করলে নয়। তবু তো এখানকার কাজের এবং পপির বারো আনা ঝক্কি নিশানাথ পোহাচ্ছে। কাজের ছেলে। নিরঞ্জন মনে মনে স্বীকার করে।

এখানে ব্যাঙ্ক আনার ব্যাপারে নিশানাথের উৎসাহ ছিল। স্বাস্থ্যকর জায়গা। তাছাড়া উঠতি নতুন শহর। ভাল ব্যবসা চলে।

তখন তারা শিলঙ্‌-এ। নিরঞ্জনের মস্ত টি-গার্ডেন সেখানে। নিশানাথও সঙ্গে ছিল। পারতপক্ষে স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলিতেই নিরঞ্জন তার এক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে পপিরও হাওয়া বদল হয় আর নিরঞ্জনও চারদিকের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারে।

এই নিয়ে অবশ্য পপির সন্দেহের অন্ত নেই, কথায় কথায় খোঁচা দেয় স্বামীকে, 'সত্যি কি তুমি আমার স্বাস্থ্য দেখছ না তোমার ব্যবসা ?'

নিরঞ্জন একটু অপ্রস্তুত হয় বৈকি তখন। বেশ অসহায় দেখায় পাকা-পোক্ত ব্যবসায়ীর চেহারা। 'তুমি কি এখনও বিচার করতে পারছ না পপি আমার কাছে টাকা বেশি প্রিয় কি তুমি। টাকা জমিয়ে জমিয়ে যখন প্রায় বুড়ো হতে চললাম তখনই কি তোমাকে ঘরে আনলাম না, সাধ্বী' ইচ্ছা হয় এক এক সময় নিরঞ্জন বলে। কিন্তু বলতে পারে না।

মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মত জীবনে নারী-প্রতিষ্ঠা। কে তাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল ? অভাব অনুযোগ অতৃপ্তি অনুশোচনাকে বড় বেশি ঘৃণা করত নিরঞ্জন, ভয় করত। এখন ?

একটু একটু ক'রে তিল তিল ক'রে ভয়ঙ্কর পরিশ্রমী শিল্পীর মত তো জীবন গড়তে চলছিল সে, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে। কিন্তু তাতে হ'ল কি ?

ষ্টিয়ারিং হুইলের ওপর হাত রেখে নিরঞ্জন ভ্রূকুঞ্চিত করল। এখন বোঝে কোথায় ত্রুটি হয়ে গিছল, কিসের ত্রুটি।

চাপা ঈষৎ গোল থুঁতনি সামনের দিকে তুলে আস্তে আস্তে নিরঞ্জন গাড়ি চালায়। সতর্ক প্রহরীর মতো, চাকার সামনের একটা ইঁট বাঁচিয়ে অগ্রসর হতে হয় তাকে,—সতর্ক সে চিরদিনই। গাড়ির একটা কাচ ভাঙবে ভাববার আগে পপির কথা ভেবেছে। পপির নরম শরীর; ক্ষীণ দেহ।

পপি এখন প্রকাশ্যেই নিরঞ্জনকে তার বয়সের কথা নিয়ে খোঁচা দিচ্ছে।

'চল্লিশ পার ক'রে ফেললে তবু এদেশে মনসুন কখন আসে জান না, এই প্যাচ্‌প্যাচে বর্ষার দিনে কেউ পুরীতে আসে?' বলেছিল ও নিরঞ্জন যখন ওকে পুরীতে নিয়ে গেল। ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যাবার পথে সমস্ত রাস্তা নিরঞ্জনের সঙ্গে ও আর কথা কয়নি। তারপর মুখ খুলেছে আবার শিলঙ গিয়ে। 'নভেম্বর মাসে তুমি আমায় নিয়ে পাহাড়ে উঠলে আমার শরীর সারাবার জন্যে? না তোমার চা-বাগান দেখতে! যতটা ছেলেমানুষ ঠাওরেছ ততটা ছেলেমানুষ কি আমি?' একটা চোখ ছোট হয়ে গিছল পপির কথা বলার সময়। উনিশ বছরের একটি মেয়ে চল্লিশ অতিক্রান্ত পুরুষকে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে। করে। আগে জানত না নিরঞ্জন। এখন জানছে। শুনতে শুনতে এখন আর খারাপ লাগছে না।

না, সে ভাবছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিয়ের পর এই দেড় বছর, এভাবে সেভাবে কখনো কথা কয়ে কখন চুপ থেকে বা সম্পূর্ণভাবে একটানা তিন দিন হয়তো একেবারেই নিরঞ্জনের সামনে না এসে সকল সহযোগিতা বন্ধ রেখে মেয়েটি এই বোঝাতে চেয়েছে, তৃপ্ত নই আমি তৃপ্ত নই।

বয়সের বৈষম্যটাই সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠল। টের পায় নিরঞ্জন। আর, তখন তার সত্যি বলার কিছু থাকে না। ভয়ঙ্কর অসহায় বোধ করে নিজেকে।

এবং জীবনের এই একটা ত্রুটি সংশোধন করতে সহস্রভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে নিরঞ্জন নিজেকে, নিজের সব কিছু। যদি পপির মন ভাল থাকে, যদি ও ভালবোধ করে একটু।

'মনের অসুখ। মন থেকেই অসুখ এসে দেহে আশ্রয় নিচ্ছে।' সুন্দরভাবে ডাক্তাররা ঘোষণা করছে সর্বত্র। যত জায়গায় নিরঞ্জন

পপিকে নিয়ে গেছে। শিলঙে গিয়ে পপির অসুখটার অবশ্য বাড়াবাড়ি হয়েছিল, কিন্তু ওর মেজাজ কি আরো বেশি খারাপ হয়ে ওঠেনি তখন। এক-এক সময় নিরঞ্জন বিশ্বাসই করতে পারত না, এমন অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে কি করে পপি এত রাগারাগি, সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকত।

ভাগ্যিস ছেলেটি সঙ্গে ছিল,—নিশানাথ। আর এখানে ব্যাঙ্কের কাজ আশাতীত রকম ভাল চলবে নিরঞ্জন কোনোদিন ভাবেনি। 'আমার শহর। ছোটবেলা থেকে আমি এখানে মানুষ। এর জলবায়ু রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকচরিত্র আমার নখদর্পণে। ব্যাঙ্কের বিজনেস ভাল হবেই।' নিশানাথ বলে, 'একটিবার লক্ষ্য করুন মিসেস রায়ের শরীরও এই এক মাসেই কত ভাল হয়েছে।'—নিরঞ্জন সপ্রশংস চোখে উভয়ের দিকে তাকায়; কৃতজ্ঞ সে। পপির স্বাস্থ্য এবং তার ব্যাঙ্ক দুটোই সমানভাবে এখানে, বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি এত ভাল হয়ে উঠবে তা কি সে জানত।

গাড়িটা ঘুরিয়ে একটা পলাশ গাছের নিচে এনে দাঁড় করালে নিরঞ্জন। 'তুমি কি নেমে একটু বেড়াবে?' আস্তে আস্তে বলতে গিছল সে, তার আগেই গলায় সুন্দর একটা শব্দ করে ঝুপ্‌ করে পপি গাড়ি থেকে নেমে গেল।

হঠাৎ শ্রীমতীর অতিমাত্রায় খুশি হয়ে ওঠার কারণ নিরঞ্জন প্রথম বুঝতে পারেনি। পরে বুঝল। সে নিজেও খুশি হল হাল্কাবোধ করল একটু। নিশানাথ এসেছে।

পায়ে বুট গায়ে বুশ্‌ সার্ট।

কাঁধে বন্দুক। নিশানাথের হাতে ঝুলছে প্রকাণ্ড দুই বালিহাঁস। নদীর ওপার শিকার করতে গিছল।

হাঁস দেখেই নিরঞ্জন উল্লসিত হয় যেন বেশি।

পপি ততক্ষণে নিশানাথের হাত থেকে শিকার দুটো কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু নিলে হবে কি। মরা হাঁসের ভারে প্রায় নুয়ে পড়েছে, কাঁপছে। হাত থেকে দুটোকে নামিয়ে দিয়ে ঘাসের ওপর রাখল পপি। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে পপির।

আধসের ওজনের একটা বই পর্যন্ত হাতে তুলতে গিয়ে পপি হাঁপিয়ে উঠত এই কিছুদিন আগেও।

'দুঃসাহস করতে গেছলেন তো।' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিশানাথ হাসে। আলো নিভে গিছল। কিন্তু সেই মন্দ আলোয়ও ওর সাদা সুগঠিত বড় বড় দাঁতের পাশে বাধানো সোনার দাঁতটা ঝকঝক্ করে উঠতে দেখল নিরঞ্জন।

ছোট্ট ঢোক গিলে পপি ঘাড় তুলে নিশানাথের মুখ দেখছে। নিশানাথের মুখের দিকে যখন ও তাকায় প্রত্যেকবার ওর সরু থুঁতনিটা আকাশের দিকে উঠে যায়। এত ছোট্ট ও আর নিশানাথ এমন লম্বা। শাল গাছের মত দীর্ঘ উদ্ধত সুদৃঢ়।

চোখ নামিয়ে সরল শিশুর মত তাড়াতাড়ি মাটির ওপর উবু হয়ে ব'সে গেছে স্থূলোদর নিরঞ্জন। মোটা বেঁটে একখানা হাত বালিহাঁসের পেটের ওপর দু-তিনবার বুলিয়ে নরম পালকের নিচে তুলতুলে মাংস ও চর্বি পরীক্ষা করা আগে শেষ করল। নিশানাথ হঠাৎ এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলছে, 'আজ পৃথিবীতে আপনার মত সুখী কেউ নয়।'

'হব। রাত সাড়ে নটার পর।' পাইপ ধরিয়ে নিরঞ্জন নিশানাথের চোখে চোখে তাকায়। 'যখন ওরা টেবিলে উঠবে, তপ্ত মাংসখণ্ড থেকে ধোঁয়া বেরুবে।' কথার শেষে নিরঞ্জন হাসে

পপি ঘাড় ফেরায়। 'পঞ্চাশে তো এখনো পা পড়েনি, তার আগেই এমন হয়ে গেলে কেন?' স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েও পপি কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে পলাশ গাছের পাতার দিকে চেয়ে রইল। 'আগে ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন কর, তারপর তো তুমি মাংস খাবে। ও'র শিকার দুটো তোমার রান্নাঘরে যে ঢুকবেই কি করে তা জানলে?'

নিরঞ্জনের খেয়াল হ'ল।

দেখতে ছোট হলেও পপি যে তার চেয়ে ঢের বেশি সাংসারিক বুদ্ধি রাখে, সামাজিক কানুন ও শৃঙ্খলা-জ্ঞান তাতে সন্দেহ কি?

'আমি ভুলে গেছলাম।' বেশ অনুতাপের সুরে নিজেকে সংশোধন করে নিরঞ্জন নিশানাথের দিকে তাকায়। 'তুমি আজ আমার এখানে খাবে নিশীথ।'

'রাত্রে আপনার খাবার নিমন্ত্রণ রইল!' পপি নিশানাথকে বলল। শঙ্খের মত সাদা সরু-হয়ে-আসা ছোট্ট থুঁতনি আকাশ নয়, যুবকের মুখের দিকে তুলে ধরেছে স্ত্রী আবার।

অল্প হেসে ঘাড় নেড়ে নিশানাথ গৃহিণীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

নিঃশব্দে নিরঞ্জন গিয়ে গাড়িতে উঠল।

নিশানাথ সঙ্গে থাকলে সে-ই গাড়ি চালায়। বুদ্ধিমান। অল্প ক'দিনে গাড়ি চালাতে শিখে ফেলেছে।

চতুষ্কোণ বিশাল পিঠ দিয়ে গাড়ির সামনেটা প্রায় আড়াল করে বসেছে সে। সামনের দৃশ্য দেখবার জন্যে পপি তাই গলা বাড়িয়ে দেয় পিছনের সীট থেকে প্রায় যুবকের গলার কাছে মুখ নিয়ে। অন্ধকারেও পপির কানের হীরা দুটো অদৃশ্য কোনো আলোর রেখা লেগে ঝিকিয়ে উঠছিল থেকে থেকে।

চোখ নামিয়ে নিরঞ্জন একটা হাত আবার আস্তে আস্তে নিচের দিকে বাড়িয়ে মরা হাঁসের বুক পরীক্ষা করে।

আস্তে আস্তে গাড়ী চলে তাই বাদুড়ের ঝটপট শোনা যায় দুধারে বাইরের অন্ধকারে।

অটলবাবু এবং যোগীন ডাক্তার রাত আটটার পরও বেড়ান। শহরে নতুন ইলেকট্রিক আলো হওয়ার এই সুবিধা। পাকা সড়ক ধরে দুজন গল্প করতে করতে অনেক দূর চলে যান।

নিশানাথের বাবা অটলবাবু নিশানাথের মতই উঁচু লম্বা। শক্ত মজবুত গড়ন। এখন শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। যেন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। পঞ্চাশ পার হননি তবু। অবশ্য দেখলে বোঝা যায়, ঐ চেহারার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপ্টা দুঃখ কষ্ট ও হতাশার গ্লানি বয়ে গেছে।

সত্যি ডাক্তার যত কথা বলে অটলবাবু তত বলেন না, হাত নাড়েন কম. নিশ্বাস ফেলেন আস্তে।

হাঁটতে ও কথা বলতে গিয়েও কি যেন ভাবেন।

বলতে কি, অটলবাবু নিজের অবস্থা, অভাব ও দৈন্য সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন। তিনি জানেন উকিলদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে গরীব। তিনি ভুলে যাননি এণ্ট্রান্সে তিনি জলপানি পেয়েছিলেন। এই অঞ্চলে তাঁর মত ভাল ছেলে কেউ ছিল না।

আর পাঁচটি উচ্চাভিলাষী ভাল ছেলের মত তিনিও রাতারাতি ওকালতি পাশ করে ছুটে এসেছিলেন এই শহরে।

তিনি জানতেন ব্রিটিশ আমলে বিনা পুঁজিতে বড়লোক হওয়ার এই সোজা রাস্তা। ব্যবসার লাইনে এর চেয়ে ভদ্র ব্যবসা (ডাক্তারী ছাড়া) আর কিছু ছিলও না তখন ভদ্রলোকের ছেলের জন্যে।

অটলবাবু চোখের ওপর দেখেছেন ভূদেববাবু ওকালতি করে শহরে বিরাট দালান ফেঁদেছেন।

উকিল শশধর কী না করেছেন এ জীবনে। এমনকি তিনি মন্ত্রী হয়েছেন বুদ্ধি ও বুদ্ধিঅর্জিত পয়সার জোরে।

মেধাবী অটলবাবু যেই তিমিরে সেই তিমিরে।

তাঁর বৈঠকখানায় দুটো ভাঙ্গা বেঞ্চিতে ধূলো পড়ে রইল সারা-জীবন।

ছাত্রাবস্থায় একখানা কাপড় ছিল পরার, এখনও তা-ই। ছেঁড়া চটি, হাঁটুর ওপর কাপড় পরে অটলবাবু যখন যোগীন ডাক্তারের সঙ্গে হাঁটেন ভারি বিমর্ষ বিমূঢ় হয়ে থাকেন ভদ্রলোক।

তার ওপর একমাত্র ছেলে দিয়ে কোনো আশাই তিনি করতেন না। কোনদিনই না। ফোর্থ ক্লাসের ছেলে নিশানাথ সিগারেট টানতে শিখেছিল। কেমন করে ছেলের মধ্যে খারাপ জিনিষগুলি আগে ঢুকেছিল অটলবাবু বুঝতেই পারলেন না, আজও পারেন না।

অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি ভাবেন, এমন পরিষ্কার করে বই-এ লেখা ওকালতির কূটনীতিগুলি যখন তাঁর মাথায় ঢুকল না তখন বই-এ না লেখা সংসারের বিচিত্র কূট নিয়মগুলো কি করে ঢুকবে।

ছেলে খারাপ হওয়া সেই কূট নিয়মগুলিরই তো একটি অঙ্গ। ভূদেব বিদ্যাসাগর অটলবাবুর আদর্শ।

এর বাইরে, অর্থাৎ নীতিগত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এমন ছেলে কোনোদিন বড় হবে বা হয়েছে তিনি বিশ্বাস করতেন না। চোখে দেখলেও না।

ছেলে ভাল চাকরী করছে দেখে এখন পর্যন্ত তাঁর সন্দেহ বা সংশয় কাটেনি। যে-কোনো একটা দুর্বুদ্ধি এসে ওকে নিঃসংশয়ে ডুবিয়ে দেবে যেন এই আশঙ্কাই করছেন তিনি বরাবর।

যোগীনবাবু বলেন, 'আমি জানতুম আপনার ছেলে শাইন্ করবে। এরকম ছেলেরাই আজকাল উন্নতি করেছে, ব্রাদার। একটু বখাটে হওয়া ভাল এদিনে।'

'মরাল ডিগ্রেডেশান,' রাস্তায় একটু ধুলো উড়ছিল, অটলবাবু নাকে রুমাল গুঁজে বললেন 'যুগটাই যেন বদ্‌লে গেছে। আমাদের সময়ে কিন্তু ওরকম ছিল না।'

'আপনাদের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম ছিল। এখন একটা লোকের শুধু ভাত খেতে একশ টাকার বেশি লাগে। আদর্শ বজায় রেখে সুদিন আসবে ব'লে ঘরে বসে চুপ করে থাকতে হ'লে, পেটে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয়। একটু চালাক চঞ্চল দুরন্ত হওয়া ভাল এদিনে। একটু ডানপিটে না হলে পেট মান দুইই যায়। বুঝছেন না?' বলে টেকো মাথা ফর্সা যোগীন ডাক্তার গম্ভীর বিমর্ষ অটল রায়ের মুখের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।

অটলবাবু আরও বেশি গম্ভীর হয়ে থাকেন।

'আপনার ছেলে নিশানাথ জীবনে একটা কিছু করবেই আমার বরাবরের ধারণা।' যোগীনবাবু কেন জানি কথাটায় বেশ জোর দেন।

চুপ করে থাকেন অটলবাবু। ডাক্তার তারপরও অনর্গল কথা বলে, বিষয় বর্তমান যুগের ছেলেমেয়ে কোন্ ধাতুতে গড়া।

'তারা চঞ্চলতা চায়, হৈ-চৈ চায়। জীবনবোধের সচেতনতায় দিশা-হারা হয়ে ভালমন্দ একটা কিছু আঁকড়ে ধরবেই। আমি এটা পছন্দ করি। এই ধরুন আপনি। একটা গোল্ডমেডেলিষ্ট। বাঁধা ধরা চাকরীর চেয়ে মাথা খাটিয়ে ওকালতি করে পয়সা করব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখানে এসে আপনি মাথা খাটাতে পারলেন না। এর কারণ আপনার নীতিবোধ এবং আপনার আদর্শ আপনাকে কোণচাপা করে রেখেছে। জগতের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে দিলে না, আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলেন। তাই নয় কি?' কথা শেষ করে ডাক্তার প্রচণ্ড শব্দ করে হাসে। শক্তিমান জোয়ান পুরুষ। স্বাস্থ্য এত ভাল যে, অটলবাবুর পাশে দেখলে তাকে অটলবাবুর ছেলের মত মনে হয়। অথচ দুজন প্রায় সমবয়সী। গম্ভীর এবং আদর্শবাদী অটলবাবু জীবনে কিছু করতে পারেননি, ইদানিং নিশানাথের যদি কিছু হয় এবং ছেলের ভাগ্যে বাপের কিছু আসে এমন একটা মনের ভাব নিয়ে অথবা সন্দিগ্ধ আশার আলো সামনে রেখে মনমরা হয়ে বসে আছেন।

ডাক্তার বেশ দুপয়সা ক'রে ফেলেছে এর মধ্যেই। ডাক্তার সৌখিন লোক। আশাবাদী। বিদ্যা যা-ই থাক ডাক্তারীতে পসার জমিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। বিদ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্যা তিনি লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন অফুরন্ত। সর্বদলে এবং সকল দরবারে তিনি উপস্থিত। ছেলেরা থিয়েটার করছে সেখানে ডাক্তারবাবু। বড়রা মানে। শহরের সম্ভ্রান্ত প্রবীণ দল টাউনহলে সমবেত হয়েছেন দেশের এক মহাপুরুষের শততম মৃত্যু-বার্ষিকী করতে, সেখানেও যোগীনবাবু। দেখা গেল তিনিই শোকসভার উদ্যোক্তা এবং সকলের চেয়ে তাঁর উৎসাহ বেশি।

খেলার মাঠে এ বয়সেও কেডস পরে গায়ে হাফ শার্ট চড়িয়ে লাল ফিতে-বাঁধা বাঁশী মুখে গুঁজে পূর্ণ উদ্যমে শহরের ব্যাচেলার বনাম ম্যারিড দলের ফুটবল-ম্যাচে ডাক্তার রেফারিগিরি করে।

এ শহরে এ রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা গত তিন বছর ধরে নিয়মিত ভাবে চলছে। এবং প্রতি বছর আষাঢ় মাসের চিক্‌চিকে বর্ষার জল নামতে অন্য আর পাঁচটি প্রৌঢ়-সঙ্গ ছেড়ে ডাক্তার সোজা মাঠে নেমে যায়।

সঙ্গীরা হা করে চেয়ে থাকে। ভাবে লোকটা পাগল।

গৌরবর্ণ দোহারা শরীর। মাথায় টাক। পুরু কব্জিতে হাতঘড়ি হাতে সুদৃশ্য ডাক্তারী ব্যাগ, আর মুখে বর্মা চুরুট। ঠোঁট কালো হয়ে গেছে চুরুট টেনে টেনে।

এখানকার মহিলা-সমিতিতে ডাক্তার মোটা চাঁদা দিয়েছে।

অসহায় অনাথ হয়ে পড়েছে এমন কোনো মেয়েকে অথবা মেয়ের পরিবারকে ডাক্তার কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্তও আছে। ডাক্তারের নাম ডাক আছে শহরে। একটা আশ্রয়, একজন বন্ধু বটে।

আর ডাক্তার বলতে, অর্থাৎ যেটা তাঁর আপন পেশা, লোকে যোগীনবাবুকে জানে বেশি। চেনে অধিক। ভাল ডাক্তার কি মন্দ ডাক্তার বলে নয়।

ওঁর ওপর বিশ্বাস আছে সকলের। বাড়ির ছেলে থেকে বুড়ো সবাই যোগীন ডাক্তারের চিকিৎসা চায়, তার ধূসর মোটা রঙের পার্কার কলমের প্রেসক্রপশন-লেখা ওষুধ খেলে রোগ ভাল হয়ে যাবে। সবাইর ধারণা।

চোখে কালো গগলস।

গগ্‌লস, পার্কার কলম, সুদৃশ্য রিষ্টওআচ, বর্মা চুরুট, ব্যাগ এবং টাক নিয়ে যোগীন ডাক্তার শহরে ভয়ঙ্কর পরিচিত।

এ শহরে সরকারী ট্রেজারীর ইঁটরং দালানের মত, কলেজের সামনের একমাত্র খেলার মাঠটির মত, কি শহরের মাঝখানের পার্কের সমচতুষ্কোণ লালদীঘিটির মত। কাউকে বলে দিতে হয় না ইনি ডাক্তারবাবু।

পার্কে বেড়াতে এসে ডাক্তারের ছুটোছুটি দেখে তাঁর বয়স-ঘেঁসা লোকেরা কেউ কেউ অবশ্য চোখ টেপাটেপি করে, হাসে, বলাবলি করে 'বুড়ো শালিক।' একটু বেশি যাঁদের বয়স, বলেন, লোকটি রসিক, স্বাস্থ্যটি এখনো ভাল আছে, ভুড়ি বেরোয়নি, চামড়া ঢিলে হয় নি। মন্দ কি। ইয়ং থাকতে পারা কম কি।

আর যারা নবীন তাদের মুখে মুখে তিনি কাকাবাবু ছাড়া আর কিছু না।

তিনি ভাল কি মন্দ তা ওরা বলে না, বলে তিনি দরকারী। বলে, যোগীন ডাক্তার শহরে আছে বলেই শহরটায় প্রাণ আছে।

শহরে যে সভ্যতার ছিট লেগেছে, জীবন্ত সুন্দর হয়ে উঠছে এর চেহারা সিনিয়রদের মধ্যে ডাক্তারকে দেখলেই সকলের আগে মনে হয়। বাকি সব গার্জিয়ান এখনো ষোলআনা সেকেলে, ভয়ানক ব্যাকোয়ার্ড। ছেলেমেয়েরা অশান্ত হ'ল কি উচ্ছৃঙ্খল এই দুশ্চিন্তায় যদি অভিভাবক কি অভিভাবিকাদের না কাটল তো শহর আর এগুলো কি। যে তিমিরে সেই তিমিরে। এ শহরের ছেলেমেয়েরা এ জন্যে অসন্তুষ্ট।

ডাক্তার সাহসবাণী শোনায়, 'না একটু এগিয়ে আসুন আপনারা একটু সাহস করুন, তবে তো ছেলেরা আর একটু বেশিদূর এগোবে

আলাপের মোড় ফেরাবার জন্যে যোগীন ডাক্তার অটলবাবুর হাতে মৃদু চাপ দেয়। হাত ধরে ঈষৎ আকর্ষণ করে। 'আসুন সন্ধ্যেবেলা আজ একটু রেস্টুরেন্ট করা যাক্।'

অর্থাৎ অটলবাবু ডাক্তারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে 'প্যারাডাইজ'-এর দরজায় এসে গেছেন তখন।

শহরের সবচেয়ে নতুন রেস্তোঁরা এটি।

টিপয়, সুদৃশ্য চেয়ার, মেঝের ওপর বিছানো পুরু গালিচা, আর আলাদা আলাদা কামরা পর্দা-খাটানো, পাখা-লাগানো, যেন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বা দুটি মেয়ে ও দুটি ছেলে একসঙ্গে বসে একটু চা খাবার খেতে পারে মুখোমুখি, সংগোপনে, নিরিবিলি। রেডিও বসানো হয়েছে রেস্টুরেন্টে সম্প্রতি।

বয়স্করাও কেউ কেউ এখানে আসছেন সন্ধ্যাবেলা অথবা সন্ধ্যার পর দিল্লী কোলকাতার খবর শুনতে। বেড়াতে বেড়াতে।

অটলবাবু শুধু এক কাপ চা খাবেন। তা-ই সই,—যোগীনবাবু বন্ধু অটলবাবুকে জোর করে ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকিয়ে পরে নিজে ঢোকে। তারপর অর্ডার দেয় দু'খানা চিংড়ি কাটলেট দু' কাপ চা। আর সশব্দে হাসে।

অটলবাবুর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়েছে। নতুন বর্মা চুরুট ধরিয়ে যোগীন ডাক্তার নিচু গলায় বলল, 'টেনিস খেলে ফিরছিলাম ও-পাড়া থেকে। দেখলুম, রায়ের গাড়ি চালাচ্ছে আপনার ছেলে।'

'ওই আনন্দেই আছে ছোকরা।' বিমর্ষ চোখ তুলে বিমলিন হেসে অটল দত্ত ডাক্তারের মুখের দিকে তাকান।

'তা হোক' মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে ডাক্তার মাথা নাড়ল। 'দেখতে হবে কতটা আপন করে নিয়েছে নিশানাথকে ওরা। কাল দেখলাম—

ডাক্তারের কথা থেমে গেল। দু'টি মেয়ে ঢুকছে ভিতরে এই মাত্র। সুন্দর সেজেগুজে অরুণা সেন সুশীর হাত ধরে রেস্টুরেণ্টে এল খেতে।

ওদিকে তাকাতে গিয়ে অটলবাবু চোখ নামালেন। তিনি যখন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন তখন শিক্ষয়িত্রীদের এভাবে বাইরে আসার রেওয়াজ ছিল না। অন্য মেয়েরাও বড় একটা আসত কি।

একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লেন অটলবাবু।

ডাক্তার উৎসুক চোখে চেয়ে আছে এইজন্যে যে, যে টেবিলে ওরা দু'জন এসে বসল সেই টেবিলের এক পাশে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী ও সাব-রেজিষ্টার মুরারি হাজরা বসে চা খাচ্ছিল। যোগীন ডাক্তার উৎসুক হয়েছে এবং বেশ উস্‌খুস্ করছে, অটলবাবু তা লক্ষ্য করলেন। তার সঙ্গে না বসলে ডাক্তার এতক্ষণে ছুটে যেত সেই দলে। অটলবাবু জানেন। কেবল তিনি ছাড়া, শহরের প্রায় সবাই, ছোট বড় সব প্রগতির আলোয় নতুন করে স্নান করে উঠছে। অটলবাবু বেশ ভাল করেই এটা উপলব্ধি করছেন।

কেবল তিনিই অন্ধকারে রয়ে গেছেন, তাঁর দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা নিয়ে। বাকি সবাই প্রগ্রেসিভ।

কোনো রকমে খাওয়াটা সেরে অটলবাবু ডাক্তারকে মুক্ত করে দিলেন।

'আমি এবার উঠি ডাক্তার।' বলে অটলবাবু উঠলেন।

হেসে ডাক্তার মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আপত্তি নেই।

ডাক্তার বলল, 'আমাকে একটু ক্লাবে যেতে হবে। গিন্নীর বই না নিয়ে গেলে আজ আমায় ঘরে ঢুকতে দেবে না।'

মৃদু হেসে অটলবাবু বললেন, 'না দেয়াই তো উচিত,—আচ্ছা চললুম।' বলে তিনি ধীরে ধীরে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার অনেকটা স্বস্তিবোধ করে। যেন মনে মনে বলে কি ভয়ঙ্কর 'বোরি' এই লোকটি। এবং কালবিলম্ব না করে বোগীন টেবিল পরিবর্তন করে। সহাস্যে ও সশব্দে ছুটে গিয়ে চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিষ্টারের সঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে আর একটা চেয়ার আনিয়ে ব'সে পড়ে।

সুশীলা ও অরুণা খুব আস্তে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে একটা দুটো কথা বলছিল। তা-ও প্রবীণদের প্রশ্নের উত্তরে। অনেকটা যেন ভয়ে ভয়ে। কেননা তিনজনেই স্কুল-কমিটির সদস্য। দু'জন ভাবতেই পারেনি এ সময় এই রেস্তোঁরায় ছেলেরা ছাড়াও বুড়োরা আসে।

অবশ্য আড়ষ্ট ভাবটা দু'জনেরই কেটে গিছল রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢোকায় সঙ্গে সঙ্গে। চেয়ারম্যানের সহাস্য সম্বর্ধনা এবং সাব-রেজিষ্টারের আনন্দোল্লাসিত দন্তহীন কৃশ মুখমণ্ডল ও নিষ্প্রভ চোখে যুগপৎ স্নেহ ও অভিনন্দনের অভিব্যক্তি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। বুড়ো সাব-রেজিষ্টার নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কেবল শিক্ষয়িত্রী ব'লে নয়, মহিলা ব'লে। পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশের মতো এই ছোট শহরেও নারীর প্রতি সম্মানবোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। মিস অরুণা সেন তা উপলব্ধি করল। বয় দু'টো অতিরিক্ত চেয়ার বাবুদের টেবিলের পাশে রাখতে দু'জন বাধ্য হ'য়ে বসল সেখানে। কর্তব্যবোধে সম্ভ্রমবোধে।

কিন্তু তারপরও দু'জন আস্তে, বড় বেশি সমীহের সুরে কথা বলছিল। চব্বিশ ও উনিশ বছরের দু'টি মেয়ে।

ডাক্তারের স্বভাবসুলভ কলহাস্যে আবহাওয়া হঠাৎ তরল হয়ে গেল।

'আলুর দর বাড়ছে, চপের সাইজ ছোট হচ্ছে, এতে আমাদের লাভ ক্ষতি যাই হোক আপনার পক্ষে কিন্তু ভালই হ'ল, মোহিনী বাবু।'

চেয়ারম্যান ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন।

'সাব-রেজিষ্টারের দাঁত নেই কিনা তাই চিংড়ি মাছ ও মাংস ফেলে প্রথমেই ভেজিটেবল চপ হেঁকে বসল, আমি বললাম, যোগীনবাবু এখানে রয়েছেন আমায় আলু খেতে দেখলে এখুনি তেড়ে আসবেন।'

'একটা চপ্ খেয়ে তোমার সুগারের মাত্রা যদি বেড়ে যায় আর তাতে তুমি শয্যাশায়ী হও তবে তা-ই হোক। ফিফ্‌টির ঘরে পা দিতে না দিতেই যে তুমি এমন অকর্মণ্য সেজে বসে আছ ধরখানা দেখলে কি কেউ বিশ্বাস করবে,—কি বল ডাক্তার।' সাব-রেজিষ্টার ডাক্তারের দিকে মুখ ঘোরান।

সাব-রেজিষ্টারের চেয়ে চেয়ারম্যানের শরীর আকারে অনেক বড়। সাব-রেজিষ্টার মুরারি হাজরা অত্যন্ত বেঁটে, ছোটখাট, গায়ের রং মেটে তাই দেখতে নাকি একটা ইঁদুরের মত মনে হয় মুরারিকে, মোহিনীবাবু মাঝে মাঝে বলেন। অথচ দু'জন ছোটবেলা থেকে, খুব শৈশব থেকে বন্ধু। এবং দু'জনেরই দেহাকৃতির এই আকাশপাতাল পার্থক্যও নাকি তখন থেকে।

তখনকার দিনে ছেলেরা যেমন মোহিনী নন্দী ও মুরারি হাজরাকে এক সঙ্গে পাশাপাশি পথ চলতে দেখলে ঠাট্টা করত এখনকার ছেলেরাও চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিষ্টারকে আড়ালে আবডালে প্রচুর ঠাট্টা করে। ছেলেরা বলে 'লরেল হার্ডি।'

দু'জনের অন্তরঙ্গতার মত মুহুর্মুহু কলহও স্বতঃসিদ্ধ।

তাই চপ-প্রসঙ্গে মোহিনীবাবু যেই সাব-রেজিষ্টারের দাঁত নিয়ে খোঁচা দেন অমনি সাব-রেজিষ্টার তোলেন মোহিনীর শর্করাবহুল অকর্মণ্য বিপুল দেহের কথা।

হেসে ডাক্তার সমস্যার মীমাংসা করে দেয়।

'বেশ তো এর সঙ্গে দু'জনেই একটু বেশি করে স্যালাড্ খান। তাতে দু'জনেরই উপকার হবে।—বো-য়।'

'বয়' এসে সামনে দাঁড়াতে ডাক্তার অতিরিক্ত দু' প্লেট স্যালাডের অর্ডার দিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকে।

ডাক্তারের এই রসিকতায় চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিষ্টার না হেসে পারেন না। ডাক্তার অরুণার দিকে তাকায়।

'আপনার শরীর এখানে এসে সত্যি বেশ ভাল হয়েছে মিস সেন, definite improvement.'

অরুণা উৎফুল্ল চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। 'জায়গাটা আমারও খুব ভাল লাগছে ডাক্তারবাবু, এখানে এসে ক'দিনের মধ্যেই বেশ—' অরুণা থামল। সুশীলা লক্ষ্য করছিল এই দেড় মাসে অরুণা একটু মোটা ও ফর্সা হয়েছে। শুকনো চেহারা ছিল ব'লে ওর নাকটাকে আগে খাঁড়ার মত দেখাত, এখন ভরভরতি চেহারায় ভারি সুন্দর লাগে অরুণার মুখখানা।

'আমার গলার দোষটা এখনও ভাল ক'রে সারল না, কাকাবাবু।' সুশীলা বলল, 'আমার স্বাস্থ্য এখানে মোটেই টিকছে না।'

'তুমি এখানকার জলহাওয়ার মানুষ কিনা।' ডাক্তার একটু হাসল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। 'গার্গল্ করার-জন্যে ওষুধটা দিয়েছিলাম, ফুরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' ঈষৎ ঘাড় নেড়ে সুশীলা ডাক্তারের চোখে চোখে তাকাল। অরুণা চুপ ক'রে থাকে।

'আচ্ছা,—কালত যাচ্ছি আমি।' ডাক্তার সোজা হয়ে বসল। 'ইলেক্‌শনের ব্যাপারে ক'দিন আর যাওয়াই হয়নি তোমাদের ওখানে 'হ্যাঁ কাল যাব, কাল আবার ওষুধ দেব।'

চুপ ক'রে সুশীলা খেতে আরম্ভ করল। চুপ ক'রে ছিলেন ওঁরাও এতক্ষণ,—চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিষ্টার। কমিটির অনুমোদনক্রমে যোগীনবাবু এ বছর গার্লস স্কুলের ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। সপ্তাহে একদিন তাঁকে স্কুলে ও টিচার্স কোয়ার্টারে গিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অর্থাৎ স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়েছে যখন বোঝা গেল তখন চেয়ারম্যান অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি হেড মিসট্রেস-এর সঙ্গে স্কুল কমিটির আগামী মিটিং-এর বিষয় আলোচনা করলেন। প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে অরুণা ব'লে গেল। আগামী মিটিং-এ উপস্থাপনীয় জরুরী কতকগুলি নতুন প্রস্তাব পর্যন্ত তুলল অরুণা নিজে থেকে। সাব-রেজিষ্টার, চেয়ারম্যান, ডাক্তার মুগ্ধ হয়ে গেলেন মেয়েটির ব্যবহারে, কথাবার্তায়, বুদ্ধি বিবেচনা এবং সর্বোপরি স্কুল সম্পর্কে ওর অপরিমিত উৎসাহ দেখে। হ্যাঁ, এমন একজন হেড মিস্‌ট্রেসই তাঁরা চেয়েছিলেন।

'তালে আমার কথা হ'ল এই যে' সাব-রেজিষ্টার এবার আলাপের উপসংহার টানলেন, 'সকল কাজের আগে উচিত এখন হস্‌পিট্যাল রোড ও টিচার্স কোয়ার্টারের মাঝামাঝি রাস্তাটার নিচে আর একটা বড় কালভার্ট বসানো এবং অই রাস্তার পুরোনো বাতিটা বাতিল করে দিয়ে নতুন একটা আলো বসানো। কি বল ডাক্তার ?'

হেসে যোগীন ডাক্তার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটির নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বন্ধু মোহিনীর ওপর সাব-রেজিষ্টার আবার এক হাত নেবার চেষ্টা করছেন উপস্থিত কারোর বুঝতে বাকি রইল না।

মোহিনী নন্দীর মুখেও উত্তর তৈরী ছিল। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কেন বড় একটা কালভার্ট না বসিয়ে ছোট দু'খানা বসালে তোমার যাতায়াতের অসুবিধা কি। বরং আমি ত জানি ওরা সরু সুড়ঙ্গপথই বেশী—'

'চুপ!' সাব-রেজিষ্টার চিৎকার ক'রে ওঠেন। 'তোমরা কবে সভ্য হবে আমি জানতে চাই,—এখানে লেডিজ রয়েছেন আর যা খুশি মুখে আসছে বলে যাচ্ছ। তুমি এর প্রতিকার কর যোগীন।'

মুসিক শব্দটা উহ্য রেখেও চেয়ারম্যান সাব-রেজিষ্টারকে কেমন চট পট করে কতটা উত্তেজিত করতে পারেন পরীক্ষা শেষ ক'রে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। চাপা হাসির ধমকে, মোহিনীর বিপুল দেহ কাঁপছে। আর অসহ্য ক্রোধে ছোট ছোট হাত দু'টি শূন্যে আন্দোলিত ক'রে সাব-রেজিষ্টার বিড়্ বিড়্ করতে করতে উঠে দাঁড়াল। 'ভাল্‌গার, কালচারের ছিঁটেফোঁটা তোমার মধ্যে দানা বাঁধেনি। আর নয়,—আমারই দোষ। অনেকদিন আগেই তোমার সংস্রব আমার বর্জন করা উচিত ছিল, মোহিনী।' ব'লে সব চেয়ে বিস্ময়ের জিনিস, মোহিনীবাবু সকলের কাছ থেকে যখন বিদায় নেন তখন সাব-রেজিষ্টারও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে পড়েন। এক মিনিট আর অপেক্ষা করেন না। যেন মোহিনী সঙ্গে না থাকলে মুরারি হাজরা রাস্তা চিনে বাড়ি যেতে পারেন না।

'আশ্চর্য দুটি বন্ধু।' অরুণা বলল।

'হ্যাঁ, এম্নি ঝগড়া করতে করতে এক সঙ্গে দু'জন বকুলবাগান গিয়ে পৌঁছবে।' ডাক্তার তখনও হাসছে। 'সত্যিকারের বন্ধু দু'টি।

'দু'জনেই এক পাড়াতে থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, এঁরা দু'জন, আর আমাদের অটলবাবুও থাকেন ওপাড়ায়। একটু আগে আমার সঙ্গে বসে যিনি চা খাচ্ছিলেন। সবাই পুরোনো অঞ্চলের বাসিন্দা।'

'অটলবাবু মানে নিরঞ্জন রায়ের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিশানাথের বাবা?'

'হ্যাঁ।' ডাক্তার অরুণার চোখে চোখে তাকাল। 'নিশানাথকে আপনি দেখেছেন?'

'না-দেখবার আছে কি। হস্‌পিট্যাল রোড ধ'রে তো রোজ অফিসে যান।'

'তা-ও বটে।' বয় বিল্ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে ডাক্তার তা মিটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ছোট্ট শহরের সুবিধা এই চট্ ক'রে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতে পারে।'

সুশীলা দরজার বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত কি ভাবছিল। অরুণা তা লক্ষ্য ক'রে চুপ ক'রে রইল। যোগীন ডাক্তারের নজরে তা পড়ল না বা পড়লেও এ নিয়ে ভাববার মত মন বা মনের অবস্থা তার কোন দিনই নেই। আমুদে লোক। ভাবে কম। হাসে বেশি। বাইরে এসে ডাক্তার বলল, 'চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

'কষ্ট ক'রে ততটা পথ আপনি হাঁটবেন কাকাবাবু? সুশীলা সঙ্কুচিত হ'ল। 'বা-রে আমাকে যে ক্লাবে যেতে হবে,—এক রাস্তা।' অরুণা কিছু বলল না। সুশী অরুণার পিছনে। সকলের আগে

ডাক্তার। মুখে বর্মা চুরুট। পায়ে নতুন ক্রেপ্-সোলের জুতো ব'লে অত ভারি মানুষ ডাক্তারের রাস্তা চলতে শব্দ হয় না। অরুণার পায়ে উঁচু হিলের জুতো ও সুশীর পায়ে স্যাণ্ডেল। ওদের চলা'র খুট্‌খুট্ ছপ্‌ছপ্ শব্দ হয় কেবল। একটু বেশি রাত হ'ত হস্‌পিট্যাল রোড বেশ নির্জন হ'য়ে যায়। কেমন ফাঁকা।

একটু বেশি রাত ক'রে অটলবাবুর খাওয়া অভ্যাস। খাওয়ার অব্যবহিত পরেই শুয়ে পড়া তিনি অপছন্দ করেন। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। এবং রাত জেগে তিনি যে এখন আইন বই পড়েন তা-ও না। কোনো বইই পড়েন না। বারান্দায় পিঠতোলা চেয়ার বিছিয়ে চুপচাপ বসে থেকে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকেন। বাড়িতে কেউ ঢুকলে প্রথম টেরই পায় না অটলবাবু জেগে বসে আছেন। গৃহস্বামী জাগ্রত। বাড়ির সামনে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পিলার ঘেঁসে প্রকাণ্ড এক নিমগাছ। কতকালের এই গাছ। যখন এই শহর ছোট ছিল। যখন শহর বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। তখনকার আমলের। যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অটলবাবু নিমগাছটার তলায় এসে রোজই ভাবতেন ও থমকে দাঁড়াতেন,—পেন্সিলটা কি তিনি ভুলে স্কুলে ফেলে এসেছেন, না স্কুলের ডেস্কে রাখা হয়েছে, না রাস্তায় পড়ে গেল। ঠিক করতে পারতেন না হঠাৎ।

নিমগাছটার দিকে তাকালে অটলবাবুর এখনও সেসব কথা মনে পড়ে। সেই দিন।

আগে রাত আটটার পর এ রাস্তায় আর লোক চলত না। এখন রাত বারোটা একটার পরও লোকজন যাওয়া আসা করে, গাড়িঘোড়া

চলে। রাত সাড়ে এগারোটায় তো সিনেমা ভাঙে। দলে দলে সিনেমা ফেরৎ ছেলেমেয়ে অটলবাবুর বৈঠকখানার সামনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরে, ছেলে-বুড়ো হ্যাঁ শহরের বুড়োরাও সিনেমা দেখতে অভ্যাস করেছে বৈকি। সবাই তো আর অটলবাবুর মত সব দিক থেকে নিস্পৃহ নিরাসক্ত সেজে বসে থাকেনি। কেনই বা থাকবে। অটলবাবু রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে ভাবেন! রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি দু'টো একটা মোটর গাড়ি পর্যন্ত এতরাত্রে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে হর্ণের তুর্য-নিনাদ তুলে সার্চলাইট ফেলে এগিয়ে যায়। তারপর ভিড় পাতলা হতে হতে আর একটি প্রাণী শেষে রাস্তায় থাকে না। বকুলবাগানের এ রাস্তা অবধি ইলেকট্রিক আসেনি। নিমগাছের ওধারে মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন বাতিটা দপ দপ করতে করতে হঠাৎ একসময়ে যখন নিভে যায় অটলবাবু অপার শান্তি পান। অন্ধকার ভাল। ভাবেন তিনি তাঁর জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে আছে অন্ধকার। বলতে কি রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হোক তা তিনি চান না। যোগীন ডাক্তার গায়ে পড়ে কথা বলে, জোর করে ধরে নিয়ে যায় চায়ের দোকানে। তাঁর ধূসর বিবর্ণ জীবনে একটা উজ্জ্বল আশার আলো দীর্ঘ বিলম্বিত রেখা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাকি তিনি দেখতে পান না। হ্যাঁ নিশি, তাঁর ছেলে নিশানাথ। শহরের সব ক'টি ছেলের চেয়ে উজ্জ্বল দীপ্ত একটি রত্ন। এ সত্য অটলবাবু অস্বীকার করছেন কেন। বাইশ বছর বয়সে অটলবাবু ঘরের একখানা বাঁশ পাল্টে সেখানে দু'খানা ইঁট বসানোর সঙ্কল্প দূরে থাক স্বপ্নও কি কোনদিন দেখতে পেয়েছিলেন? কাল বিকেলে নিশানাথ প্ল্যান করছিল। বিল্ডিং হবে। এখানে। এই জমিতে। অটল রায়ের কাঁচা ভিটে পাকা হবে। 'ওকি, তুমি বিশ্বাস করছ না,

বাবা? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না এখনো, এমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কি?' চোখ নামিয়ে অটলবাবু কাগজের ওপর নীল পেন্সিলের দাগ-কাটা দালান দেখছিলেন। 'বৈঠকখানা, লাইব্রেরী, তোমার শোবার ঘর, আমার শোবার ঘর। এটা পূবদিকের বারান্দা,—হ্যাঁ ওধারে কিচেন্ শেড। এধারে বাথরুম।' যুবকের সুপুষ্ট সুদৃঢ় দীর্ঘ তর্জনী বার বার এসে নক্সার ওপর ঠেকছিল। আশ্চর্য, তখনও ঠিক সেসময়েও অটলবাবু ভাবছিলেন উচ্ছৃঙ্খল অবুঝ বারো বছরের এক কিশোরের কথা। অবাধ্য, অশিষ্ট। 'আদর দিয়ে তুমি ওর মাথা নষ্ট করে দিয়েছ, এবার শাসন করো।' মৃত্যুশয্যায় শুয়ে হেমনলিনী শেষে একদিন বলেছিল। স্ত্রীর কথামত ছেলেকে অটলবাবু শাসন করতে গেছেন পরে, নিশানাথ দাঁত বসিয়ে দিয়েছে তাঁর হাতে আঁচড়ে দিয়েছে মুখ গলা। তথাপি অটলবাবু ছেলেকে শাসন করতেন, শাসন করে শোধরাতে পারতেন সবে বিগড়ে যাওয়া বালকচরিত্র। কোথা থেকে একদিন ছুটে এসেছিল ছেলের মাতুল অবিনাশ। 'মারধর করে তুমি ছেলেকে শোধরাতে পারবে কি', বড়লোক মাতুল ভগ্নিপতির সংসারের চেহারা দেখে অনেকদিন পর আবার বিদ্রূপ করে উঠেছিল, 'যথেষ্ট খেতে দাও পরতে দাও, প্রাচুর্যের মধ্যে বাড়তে দাও, তবে তো ছেলে বড় হবে মানুষ হবে। তা না করে ছেলেকে আদর করো, বুক ভরে স্নেহ দাও—মারধর করলেই সন্তান বিগড়ে যায় বেশি।' ভগিনী তথা ভাগ্নের প্রতি মমত্ব বোধই অবশ্য এই বিদ্রূপের কারণ। অটলবাবু বুঝতেন। তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি কটাক্ষ এবং বিদ্রূপের মধ্যেও একটা সত্য তিনি আবার খুঁজতে চেষ্টা করতেন। হ্যাঁ, তারপর তিনি ছেলের গায়ে আর একদিনও হাত তোলেননি। কিন্তু তারপর হ'ল কি? আদর

কয়ে অবিনাশ, অবিনাশ ঠিক নয় তার স্ত্রীর, নিশির মামী, পাটনার কেনা বড় চামড়ার স্যুটকেইস থেকে সুন্দর স্যুট্ বার করে দিয়েছিল নিশানাথকে পরতে। অবিনাশের ছেলে রাতদিন ওইরকম সুন্দর পোষাক পরে থাকে। পরিচ্ছন্ন সুন্দর সেই ছেলের হাত, পা, নোখ। সুশৃঙ্খল পরিপাটি মুখ, চুল। নিশির সমবয়সী। সারাদিন বিলোলকুমারের সঙ্গে নিশি স্যুট্ পরে হাঁটল, কথা বলল, নিমগাছের তলায় গিয়ে দু'জন খেল্‌না ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলল মোহিনী নন্দীর কোন্ একটি ফ্রক-পরা মেয়ের। স্থির স্তব্ধ চোখে অটলবাবু সবই দেখলেন। না, চৌদ্দ বছর যখন ছেলের বয়স তখন ওর বালিশের নিচে সিগারেটের বাক্স দেখে অটলবাবু বিস্মিত হননি, কি স্কুল পালিয়ে ওর ম্যাটিনী শো দেখার কাহিনী শুনে। সবে নতুন আমদানী হয়েছে সিনেমা এই শহরে তখন। ওর ড্রয়ার হাতড়ে অটলবাবু একদিন এক বাণ্ডিল মেয়েদের চিঠি, মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া, ডজন দুই রুমাল, ছবি ও চুলের রিবন্ দেখেও তিনি পরমাশ্চর্য বোধ করেন নি।

অটলবাবুর পরিষ্কার মনে আছে কোন্ বয়স থেকে ছেলে চীৎকার করে পড়া তৈরী করা ছেড়ে দিয়ে বইয়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে পড়া প্রস্তুত করত। ওর জানালা দিয়ে মোহিনীবাবুর বাড়ির সামনেটা দেখা যেত।

তথাপি একদিন অটলবাবু, যতটা সম্ভব নম্র সংযত গলায় মন্তব্য করেছিলেন। অপ্রিয় কটুভাষণ শুনে, ছেলে সেদিন রাগ করেনি, দাঁত বসিয়ে দেয়নি অটলবাবুর হাতে পিঠে, খামচে দিতে ছুটে আসেনি। শান্ত মসৃণ গলায় হেসে উত্তর করেছিল, 'চরিত্র চরিত্র করে তুমি লাফালাফি করছ বাবা! জানো বিলোল বলেছে তার বাবা ড্রিঙ্ক করেন এবং আরো অনেককিছু করেন। অতিরিক্ত ভাল ছেলে

হয়ে তুমি নাকি জীবনে কিছুই করতে পারলে না। মামাবাবুর দু'খানা গাড়ি আছে। ওদের মত এমন সুন্দর প্যাটার্নের বিল্ডিং পাটনা শহরে আর একটিও নেই।' অইটুকুন ছেলে বিলোলকুমার কিশোর নিশানাথের কানে কানে বলে গেছে। শুনে অটলবাবু বিস্মিত হননি। তিনি জানতেন এই হবে।

প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে,—ছেলের ষোল বছর বয়স পূর্ণ হয়েছিল। তাই অটলবাবু আরো বেশি চুপ করে রইলেন সেদিন।

নিঃশব্দ অধঃপতনের পরিণাম অটলবাবু জানতেন। তিনি জানতেন টেক্সট বই ও মোহিনীবাবুর জানালার মধ্যে জানালার জয় অবশ্যম্ভাবী। দু' দুবার পরীক্ষায় ফেল করার পরও নিশানাথ তাই বাঁকা হেসে বাবাকে বুঝিয়েছিল, 'এগ্‌জামিনে ফেল করলেই কি আর জীবন নষ্ট হয় বাবা। তুমিও তো গোল্ডমেডেলিষ্ট। কিন্তু তাতে হয়েছে কি। সতেরো বছরের গাসট্রিক আল্‌সারটা সারাবার মত ক'টা টাকা একত্র করতে পারলে না, পাচ্ছ না। এমন ভাল ছেলে না হওয়াই তো আমি ভাল মনে করি।'

পুত্রের মুখনিঃসৃত বচন শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন পিতা!

কিন্তু অটলবাবু জানতেন, তিনি জানতেন না কি তাঁর লজ্জার মাত্র শৈশব ছিল সেটা? নিজের মত ক'রে ছেলে গড়ে উঠছে, গড়ছিল নিজেকে। অটলবাবু আশা করছিলেন লজ্জার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ এসে একদিন তাঁকে ঢেকে দেবে, তিনি চিরতরে ডুবে যাবেন পুত্রের কৃত-কর্মের গুণে। যেন প্রস্তুত হয়ে ছিলেন অটলবাবু। এখানে এই বৈঠকখানায় একদিন সন্ধ্যার পর ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন মোহিনীবাবু। অটলবাবু হাত ধ'রে অসহায় শিশুর মত কাঁদছিলেন।

রাত্রে, একটু বেশি রাত্রে ছেলেকে প্রশ্ন করতে নিশানাথ সুন্দর জবাব দিয়েছিল। 'তোমরা এখনো নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীতে আছ বাবা। তুমি, মোহিনীবাবু। ভুলে যাচ্ছ এটা বিংশ শতাব্দী, বিজ্ঞানের যুগ। এক ড্রপ মেডিসিনই যথেষ্ট। লিলি রাজী আছে। কিন্তু তাই বলে, তাই বলে তো এখুনি আমি একটা বিয়ে করতে পারিনে। অর্থ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা। জীবনে আমার অনেক কিছু করবার আছে, বুঝলে।' শান্ত ভদ্র ছেলে অল্প অল্প হাসছিল বাপের মুখের দিকে চেয়ে। 'তুমি ভাবছ আমি শেষ হয়ে গেছি, কিছুই হ'ল না আমাকে দিয়ে। তাই ত? সত্যি আমি শেষ পর্যন্ত কিছু করি কিনা,—করতে পারলাম কি না সেদিন বুঝবে। দেখবে সেদিন।'

অটলবাবু কি কাল বিকেলে 'সেদিনের' মুখোমুখি হয়ে খুব বেশি চমকে উঠেছিলেন?

ব্লু-প্রিণ্ট গুটাতে গুটাতে নিশানাথ অল্প অল্প হাসছিল, বলছিল তখন, 'রায় আমাকে পার্টনার করবে তার কারবারে। বলে, তোমার মত এমন সুন্দর স্পেকুলেটার আর আমি দেখিনি। তোমাকে হাতছাড়া করলে আমার ক্ষতি হবে।'

অটলবাবু ছেলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তেমনি শান্ত ভদ্র সুবেশ! তেমনি বুদ্ধি-মার্জিত ঈষৎ বাঁকা হাসি ঠোঁটে। পাঁচ বছরে একটু মোটা হয়েছে, রংটা কালো হয়েছে বেশি। আর পরিবর্তনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন নিশি গম্ভীর হয়েছে বেশ। না, আরও একটা পরিবর্তন হয়েছিল এবং সেটা অটলবাবুর নিজের। তিনি আর প্রশ্ন করেননি, এই কাগজের বাড়ি কবে উঠবে এখানে; তুমি তো এখন মাত্র তিনশ টাকা মাইনে পাচ্ছ শুনলাম রায়ের ব্যাঙ্কের এই ব্রাঞ্চের ম্যানেজারি করে।

হবে, হচ্ছে। যেন নিশানাথ বলছিল। আমায় দিয়ে তো তুমি কোনকালেই কিছু আশা করতে না, কিন্তু তোমার সেই ভুল আমি ভাঙ্গব।

অটলবাবু কি দেখতে পাচ্ছেন না নিশানাথ বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একুশ বছরের ভাঙ্গা চশমার ফ্রেম নতুন হয়ে গেছে। এতকাল পর তাঁর দৈনিক একসের দুধ জুটল গ্যাসট্রীক আলসারের যথোচিত পথ্যস্বরূপ। একটা চাকর রাখা হয়েছে। সেই স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে অটলবাবু নিজহাতে রেঁধে খাচ্ছিলেন। ভাত আর কচু বা আলুসিদ্ধ। দু'বেলা।

এতটাই যে হবে অটলবাবু কোনদিন আশা করেছিলেন কি।

উত্তর ছিল না বলেই অটলবাবু আরো বেশি নিস্তেজ ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন।

রাত বারোটায় সাব-রেজিস্ট্রার বাবুর কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ জেগে থাকে না। একটু আগে নিরঞ্জন রায়ের আর্দালী এসে খবর দিয়ে গেছে ম্যানেজারবাবু রাত্রে ওখানে খাবেন আর রাত বেশি হয়ে গেলে তিনি ফিরবেন না। সাহেবের বাংলোয় থেকে যাবেন।

জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। অটলবাবু একটু চমকে উঠে আবার স্থির হয়ে চেয়ারে বসে রইলেন। অন্ধকারের আকাশে জলন্ত নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তাঁর বিনিদ্র চক্ষু দুটি ঘুরে বেড়ায়।

চেরীর জন্যেই চেরীর বাপ মাকে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসতে হয়েছে।

চেরীর জন্মের পর থেকে নীহারনলিনী, মানে যোগীন ডাক্তারের স্ত্রীর হার্টের ব্যারাম।

হার্টের দোষ নিয়ে টিলার ওপর থাকা বিপজ্জনক।

চেরী নাম চা-বাগানের বুড়ো ম্যানেজার কার্টার সাহেবের দেওয়া। বাঙালী শিশুর অত্যধিক ফর্সা রং দেখে খুশি হয়ে সাহেব এই নামকরণ করেছিল কি কার্টারকে খুশি করবার জন্যে ডাক্তার বলে কয়ে মেয়ের জন্যে সাহেবের স্বদেশী নামটা আদায় করেছিল ঠিক জানা যায় না। তবে দুষ্টলোকে বলে এই মেয়ে বুড়ো কার্টারের। ডাক্তারের নয়। অবশ্য যোগীন ডাক্তার এত ভালমানুষ যে তার মুখের ওপর পরম শত্রুও একথা বলতে গররাজী হবে, হয়েছে। নীহারনলিনীর কানে এই অপবাদ তুলবার সাহস বাগানের কারোর ছিল না। কেননা তা হলে ফল অন্যরকম দাঁড়াতো। নীহারনলিনী অপবাদ-কারীকে তেড়ে মারতে যেতো ঠিক, নীহারনলিনী তেজস্বিনী। কিন্তু তার আগে আরম্ভ হয়ে যেতো ওর হার্টের ব্যারাম। একটা হৈ চৈ কাণ্ড বেধে যেতো এবং কুৎসা-রটনাকারীকেই হয়ত তখন তাড়াতাড়ি জলের ঘটি ও পাখা নিয়ে বসে পড়তে হত রোগিনীর শুশ্রূষা করতে। এই ধরণের ঘটনা বাগানে হয়ে গেছে। ক্লার্কবাবুর স্ত্রী নীপবালা, অবশ্য এসব অপবাদ নয়, নীহারনলিনীকে একবার মুখের ওপর মিথ্যাভাষিণী বলে ফেলেছিল। কারণ নীহার তার সুরাট শাড়ির দাম ক্লার্কের স্ত্রীর কাছে যা বলেছিল ডাক্তার নাকি ক্লার্ককে তার আগেই আসল মূল্যটা বলে ফেলেছিল, অর্থাৎ নীহারনলিনীর দামের অর্ধেকেরও কম। কিন্তু নীহারকে মিথ্যুক বলার ফল দাঁড়িয়েছিল কি! বেচারা এখন যায় তখন যায় নীপবালা প্রায় খুনের দায়ে পড়ে আর কি! হাতপাখা এবং জল নিয়ে তখনি তাকে বসতে হয়েছেল রোগিণীর শুশ্রূষায়।

যাক সে সব কথা।

এখন চেরীর জন্মের পর থেকেই নীহারের হার্টের দোষ হল কি করে? একটানা সতেরো ঘণ্টা নাকি থাকতে হয়েছিল ওকে লেবারের ওপর। আর সে কি অসহ্য পেইন। তিনদিন তিনরাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যোগীন ডাক্তারকে প্রসূতির সেবা করতে হয়েছিল। সতেরো বোতল পোর্ট খেয়েছে নীহার চেরীকে প্রসব করার পর। এবং তাতে নাকি নীহার প্রায় সেরে উঠেছিল, একেবারে সেরে যেতো ওর বুকের সব রকম দুর্বলতা। কিন্তু কথায় বলে, কপালে ভোগ থাকলে তুমি তা খণ্ডন করবে কি করে। নীহার এক এক সময় দুঃখ করে নিজেই নিজের কথা বলে। জঠরের ঘুমন্ত চেরী যে ব্যথা দিয়েছিল ঘুম থেকে জেগে উঠে ও চতুর্গুণ ব্যথা দিতে সুরু করল। একটু বড় হতে না হতে এক বছর কি, দু'বছর বয়সেও বোঝা যায় নি মেয়েকে। তিন বছরেও না। তিন থেকে যখন চার বছরে পা দেয় তখন থেকেই বোঝা গেছে।

আশ্চর্য এমন সুন্দর ফিট্‌ফাট্ ফর্সা চেহারা কার্টারের কাছে নিয়ে গেলেই চেরী চীৎকার করে উঠত, যেমন জল দেখে জলাতঙ্ক রোগী চীৎকার করে ওঠে। এবং সাহেবের বাংলোয় একদিন মেয়েকে কোলে করে নিয়ে যাবার সময় বিপদ ঘটল। চেরী ডাক্তারের গলায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল রেগে। হ্যাঁ, অতটুকুন মেয়ে।

তারপর অবশ্য ডাক্তার আর চেষ্টা করেনি মেয়েকে সাহেবের বাংলোয় নিয়ে যেতে।

কুলি দেখলে কুলিকামিন কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখলে মেয়ে ছুটে গেছে ওদের কোলে। সেই গভীর কৃষ্ণ রঙের অসভ্য-নোংরা

এক একটা মানুষ দেখে ও কেবল ছটফট করে কতক্ষণে কাছে যাবে।

সাত বছর বয়স তখন চেরীর। আবিষ্কার করলেন একদিন ক্লার্কবাবু। দুপুরবেলা, বাবুদের কোয়ার্টার থেকে বেশ দূরে, একটা ঝোপের পাশে কুলি নাথুরামের দশ-বারো বছরের ছেলে মোংরার কোলেব ওপর চুপচাপ বসে আছে ফ্রক্ পরা ফুটফুটে মেয়ে। ক্লার্কবাবু দেখেই অবশ্য চিনতে পারেন ডাক্তার-তনয়া! মোংরার পরনে কাপড় চোপর ছিল না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ওর দুই হাঁটুর মাঝখানে বসে চেরী খুব হাসছে আর মোংরা কালো কালো আঙ্গুল দিয়ে চেরীর লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে খোসা-ছাড়ানো আঁশফল তুলে দিচ্ছে চেরীর মুখে। না ক্লার্কবাবুর চোখে দৃশ্যটা তত খারাপ ঠেকত না যদি কুলির বাচ্চাটা এমন অকাট উলঙ্গ না থাকত আর ডাক্তারের মেয়ের পরনে না থাকত লেস্-তোলা সুন্দর ফ্রক। দুটো মিলে দৃশ্যটা কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল।

কথাটা যোগীন ডাক্তারের কানে গেল। নীহারনলিনীও শুনল। মেয়েকে চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা হল। ডাক্তার তো আর কাজকর্ম ফেলে ঘরে বসে মেয়ে আগলাতে পারে না,—নীহারকেই সেই ভার নিতে হয়।

খুব কাছেও সে মেয়েকে বাইরে যেতে দিত না একলা।

আট বছর বয়সে চেরী চীৎকার, রাগারাগি, দাঁত বসানো কি নোখ দিয়ে আঁচড়ানো এসব বন্ধ করল। গুম্ মেরে বসে থাকতে শিখল। আট থেকে ন'বছর বয়স অবধি এই করেছে আর মা যখনই একটু গালমন্দ করেছে সাবধানে সতর্ক চোখে বার বার তাকিয়েছে সদরের দিকে। বাবা তালাবন্ধ করে বাইরে যায় দেখতো রোজ এবং তখন আরও যেন বেশী গুম্ মেরে থাকত চেরী।

যোগীন ডাক্তার বলত, গম্ভীর হওয়া ভাল। 'মেয়ে সন্তানের একটু গম্ভীর হওয়া মন্দ কি?'

'একটু বেশি আগে গম্ভীর হয়ে গেছে নাকি?' নীহার বিড় বিড় করত। ডাক্তার বলত সব ঠিক হয়ে যাবে। 'ঠিক হবে না। জন্মকালে যে মেয়ে এত ব্যথা দেয়, চিরটাকালই ও জ্বালায়।' নীহার বলত। কেননা মেয়ের ধরনধারণ ওর মোটেই ভাল লাগছে না। নিজে ফিটফাট ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মেজাজের মানুষ। আর দিন থেকে দিন মেয়েটার অদ্ভুত স্বভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও লক্ষ্য করছিল। ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে দিলে ফিতে খুলে ফেলে। স্নান করাতে পারে না বলে কয়ে। মুখ কালো করে একলা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে মাটির ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে। তা-ও ভাল ছিল। একদিনের একটা দৃশ্য দেখে নীহারনলিনীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভেবেছিল ও চেরী বুঝি সেদিনও সারাটা সকাল গুম মেরে বসে থাকার পর দুপুরবেলা পিছনের বারান্দায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। উল দিয়ে একটা মাফলার বুনছিল নীহার ক'দিন ধরে ডাক্তারের জন্যে। সেদিন দুপুরে হঠাৎ কি খেয়াল হতে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও। পিছনের দরজার পর্দা একটু ফাঁক করে দেখল মেয়ের কাণ্ড। একটা বড় বেতের মোড়া বরাবরই বারান্দায় পাতা থাকে। আর, অনেকদিন চোখে পড়েছে নীহারের প্রকাণ্ড একটা হুলো, কাদের বেড়াল কেউ জানে না, এ বাড়িতেও এসে মাঝে মাঝে ঢোকে। বেশিরভাগ দুপুরবেলা। হয়ত এসেই প্রথম মাছের ঘরে ঢুকল কি দুধের কড়াইয়ের কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করতে সুরু করল। টের পেলেই নীহার তৎক্ষণাৎ হুলোটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু নীহারের রুচি আর মেয়ের রুচি তো এক

নয়। রুদ্ধশ্বাস নীহার পর্দার ফাঁক দিয়ে সেদিন দেখল চেরীর কীর্তি ; বেড়ালটাকে কৌশল করে ঢুকিয়েছে মোড়ার তলায়। আর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এক মনে মেয়ে বেতের জালির ফাঁক দিয়ে একটা কাঠি গলিয়ে হুলোর শরীরের একটা বিশেষ অংশ নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে। আহ্লাদে হুলো লেজ ফুলিয়ে চোখ বড় করে চেরীর মুখের সামনে মুখ এনে গর্‌র্ শব্দ করছে। ছুটে গিয়ে নীহার তখনি অবশ্য মেয়ের পিঠে ক'ঘা বসিয়ে দিয়েছে এবং বেড়ালটাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে পাঁচীলের বাইরে। চেরীকে আর একলা দুপুরবেলা কোনদিন বারান্দায় বসে থাকতে দেয় নি নীহার! কিন্তু সেই অদ্ভুত দৃশ্য তার মন থেকে মুছল না।

রাত্রে ডাক্তারকে বলতে ডাক্তার ড্যাব-ড্যাব করে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কতক্ষণ পর বলল,—'এ সবের অর্থ কি ?'

'অর্থ আর কি ?' অস্ফুট শব্দ করল নীহারনলিনী, 'অর্থ যা ই থাক মেয়েকে সামলাতে হবে আমাকেই, তুমি তো আর সময় পাও না। মেয়ে চোখে চোখে রাখবার দায় আমার।'

আরো একটা বছর পর চেরীর দুরন্ত টাইফয়েড হয়।

টাইফয়েডের পর সেরে উঠে মেয়ের যা চেহারা হ'ল দেখে নীহারনলিনীর মাথা ঘুরে গেল। রোগা কুৎসিতের কথা নয়। রোগা শরীর হ'লে নীহার বেঁচে যেতো। নিজে সে দীর্ঘাঙ্গী, পাতলা,

ছিপছিপে মানুষ। অসুখের পর একটা মাস পার না হতে চেরী বেলুনের মত, ঢাকাই বেগুনের মত ফুলে উঠেছে। ওর কটা চোখ বা লাল চুল নীহারের মন খারাপ করেনি। মেয়েকে স্কুল থেকে স্কুলতর হ'তে দেখেই নীহার সব আশা ছাড়ল। তার ওপর মেয়ের এই বুদ্ধি এই রুচি। অসুখের পর থেকে যেন আরো বেশি বোকা মনে হ'তে লাগল।

ডাক্তার বলল 'তেমন আর মোটা হয়েছে কি। পুরুষের চোখে মেয়েদের এমন মোটা শরীর মন্দ লাগে না।'

নীহার দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। 'সবচেয়ে বড় কথা ছোটবেলায় ওর যেমন রাগ ছিল, বদমেজাজ ছিল এখন তা নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে' ডাক্তার বলছিল। নীহার উত্তর করেছিল, মেয়েরা ঠাণ্ডা কি গরম চেহারা দেখে তুমি টের পাবে নাকি। কাজ কি অত কথায়, তুমি বাইরে বাইরে আছ বাইরে থাক। দেখতে যখন আমাকেই হবে।'

দুশ্চিন্তায় নীহারের হার্টের দোষ তখন বাড়ছেই কেবল।

এমন সময়ে যোগীন ডাক্তারের শ্বশুর নীহারনলিনীর বাবা বাগানে বেড়াতে যায়। ডাক্তার-জামাইকে শ্বশুর বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। এ দিনে এই বিদ্যা নিয়ে কেউ পাহাড় জঙ্গলে পড়ে থাকে নাকি। বাঁধা-মাইনের চাকরীতে আছে কি এখন? নীচে এমন সব উঠতি শহর পড়ে আছে। লোক গিস্‌গিস করছে, রোগ বাড়ছে, পলিটিকস্‌ হচ্ছে। পসার প্রতিপত্তি পয়সা জমানোর সুবিধা কত সে সব জায়গায়। চাকরী করে কেরাণী। ডাক্তারী মানে ব্যবসা। ঝোপ বুঝে কোপ না বসালে ব্যবসা ফাঁপবে কেন।

এত সব বলেও শ্বশুর ক্ষান্ত হয়নি। তা ছাড়া মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে না? পাহাড়ে পাত্র জোটাবে কি করে? আছে তো কেবল কুলি আর চা-চারা।'

এবং তার পরও শ্বশুর যুক্তি দেখাল। নীহারের হার্টের দোষ। জায়গা পরিবর্তনের বিশেষ দরকার। টিলার ওপরে আর দু'মাস থাকলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

ডাক্তার ভাবনায় পড়ল। নীচে নামবার যুক্তিগুলি একটাও ফেলনা নয়। তবুতো, কথায় বলে, চা বাগানের ডাক্তার। রোগীর রোগ হয়েছে বললে তোমার চাকরী যাবে। স্রেফ্ পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে হবে ডিস্পেন্সারীতে। ওষুধ না দিয়ে জল দিতে হবে, কুইনাইনের বদলে এরারোট পিল্। আর বিনি পয়সায় জঙ্গলের এন্তার জ্বালানী কাঠ, মুর্গী, ধান, কলা ও কচু।

'কলা কচু খেতে তুমি এখানে থাক। আমি চললাম।' সেন বাপের সঙ্গে নীহার নীচে নামতে চলছিল, এক গাড়িতে। 'আমার শরীর বড় কি তোমার জিহ্বা বড়, মেয়ের চেয়ে জঙ্গলের জ্বালানী কাঠ ও মুর্গী বেশি কিনা যে-কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করো। আর জিজ্ঞেস করবেই বা কাকে। তোমার মত পেটবিলাসী ক্লার্কবাবু ছাড়া আর কুলি ছাড়া এখানে কোন লোক আছে নাকি কিছু জিজ্ঞেস করার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল নীহার অনেক দুঃখে।

তথাপি ডাক্তার থেকে যেতো জঙ্গলে, পাহাড়ের গা-ঢাকা অন্ধকারে, ঢিলে-ঢালা জীবন, স্বল্প আয় ও প্রচুর শান্তি নিয়ে। নীচের শহর তাকে টেনে নামাতে পারত না যদি না চেরী আবার হঠাৎ ওই কাণ্ড করে বসত। তাও যাকে তাকে নিয়ে নয়, মূল মানুষ নিয়ে।

বিকেলবেলা কার্তিকের হিম পড়তে নীহারের একটু জ্বর হয়েছে। ডাক্তার গেছে বাইরে। নীহার শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমোচ্ছে।

রান্নাঘরে রুটি সেঁকছিল চেরী যার জন্মে!

এমন সময়, হঠাৎ ও শুনল যেন কুকুরের গলায় ঘুঙুর বাজছে বাইরে, সদরের কাছে। কাল চেরী শব্দটা শুনছিল নিশ্চয়। কিন্তু মা জেগে ছিল। তাই শোবার ঘর ডিঙিয়ে সামনের বারান্দায় যেতে সাহস পায়নি।

তপ্ত তাওয়া উনুন থেকে নামিয়ে তখনি চেরী উঠে দাঁড়ায়। ফর্সা লাল মুখ কাপড়ের আঁচলে মুছে আস্তে আস্তে শোবার ঘর পার হয়ে ও ওদিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন নীহারনলিনীর ঘুম ভেঙে যায়। তার আগেই ঘুম ভেঙে গেছল। চেরী যখন রুটি সেঁকার পাত্রটা উনুন থেকে মাটিতে নামিয়ে রাখে, খুট করে একটা শব্দ হয়েছিল।

চেরী বারান্দায় দাঁড়াতেও নীহার কিছু বলেনি। জেগে চুপ ক'রে চেয়ে দেখছিল মেয়ে কি করে শেষ পর্যন্ত। চেরী বড় হয়েছে আর অসুখের পর থেকে বেজায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অজুহাতে ডাক্তার ইদানীং সদরে তালা লাগিয়ে যেত না। তাই দেখছিল নীহার সদর খোলা থাকলে মেয়ে কি করে। বড় হয়েছে পর থেকে দরজা খোলা আছে ও আর দেখেনি। নীহারের বেশ কৌতূহলই হয়েছিল প্রথমটায় তারপর তো দেখল যা দেখবার।

রাত্রে ডাক্তারের কানে ফিস্‌ফিস্ করে নীহার যখন কথাগুলি বলছিল তখন রীতিমত কাঁপছিল ও।

ডাক্তার বলছিল, 'বুড়ো কার্টার তো বরাবরই এমন সময় বাগান থেকে ফেরে। এই রাস্তা দিয়ে বাংলোয় যায়।'

'ফেরে তো আমিও দেখি, এখানে এসে অবধি দেখছি। সদরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কি কোনদিন?' নীহার তার পরের দৃশ্যটা বর্ণনা করল কাঁপতে.কাঁপতে। 'বরং সাহেব বেশ একটু এগিয়ে চলে গেছল। বারান্দার সিঁড়ি পার হয়ে ও গিয়ে গেটের কাছে দাঁড়াতেই তো সাহেব ঘুরে দাঁড়াল।'

'তারপর?'

'ও দিব্যি গেট খুলে বাইরে গিয়ে জলপাই গাছের গুঁড়ি ঘেঁসে দাঁড়ায়।'

'তারপর?' ডাক্তার সিগারেট ধরাল। তখন সিগারেট খেত, এখানে এসেছে পর থেকে বর্মা চুরুটের অভ্যাস।

'তারপর আর কি। প্রথমে ও সাহেবের কুকুরটাকে আদর করতে গেছল। হুলো বিড়ালের পর কুকুরকেই তো ও আদর করবে। যেমন হতচ্ছাড়ি মেয়ের স্বভাব।' বলে চুপ করল স্ত্রী।

হাসতে গেছল ডাক্তার। নীহারনলিনীর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল অন্ধকারে। 'আমি জানতাম, আমি জানি, যে মেয়ে সাত বছর বয়সে লুকিয়ে কুলির কোলে গিয়ে বসে থাকে সে এমন করবে না তো করবে কে।' বলে নীহার আবার থামল।

'সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বুঝি?' ডাক্তার হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। এমন অবস্থায় ওরা দাঁড়িয়ে থাকে নাকি। আর, কেমন নির্জন হয়ে যায় চারিদিকটা তখন তুমি তো জানো?'

ডাক্তার 'হুঁ' করে একটা শব্দ করেছিল।

অন্ধকারে নীহার কেমন অদ্ভুত করে যেন হাসল। 'সাহেব প্রশ্ন

গায়ে হাত দিতে গেছল কেবল, যেন বাঘ দেখেছে, চীৎকার ক'রে মেয়ে এক লাফে ছুটে এসে ঢুকেছে ঘরে, ছি ছি—'

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে গেছল।

তারপরও সারারাত নীহার থেকে থেকে বলেছে, 'আমি জানতাম। যেদিনই ও সুযোগ পাবে দরজার বাইরে যাবে। গেল ত? গেট্ খোলা পেয়েছে কি কুকুরের ঘুঙুর শুনে বাইরে ছুটে গেল না কি,—ছি ছি।'

ডাক্তার ভেবে পায়নি নীহার দুবারই কেন ছি ছি করছিল। কুকুরের ঘুঙুর শুনে মেয়ের বাইরে যাওয়া ওর ভাল লাগেনি। না কি সাহেব চেরীর গায়ে হাত দিতে গেছে আর ও চীৎকার করে ছুটে ঘরে এসেছে বলে রাগে দুঃখে নীহার নিজের মৃত্যু কামনা করছিল। কিন্তু সে কথা তো আর ডাক্তারের জিজ্ঞেস করা হয়নি। তার সময় ছিল না। সারারাত্রির উত্তেজনার পরিণামস্বরূপ পরদিন সকাল হতে নীহারের অবস্থা এখন যায় কি তখন।

সেইদিন বাগানের চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে যোগীন ডাক্তার নেমে আসে নীচে।

নতুন হস্‌পিটাল রোড ও শহরের পুরোনো অঞ্চল অর্থাৎ সাব-রেজিস্ট্রার, উকিল অটলবাবু এবং চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দীরা যেখানে থাকেন সেই বকুল বাগানের সন্ধিস্থলে সামনে বাদাম গাছ মেহেদীর বেড়া-ঘেরা পরিচ্ছন্ন একতলা বাড়িটা নীহার ও ডাক্তার দুজনেরই বেশ পছন্দ হয়েছিল।

তখন থেকে ডাক্তার এ বাড়িতে। আর বাড়ি বদলানো হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা গরুর গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো হয়েছিল এবং ঝরঝরে ঘোড়ার গাড়ি থেকে স্ত্রী কন্যার হাত ধরে ডাক্তার যেদিন নামল,

সাব-রেজিস্ট্রার বাদাম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গলায় কম্ফার্টার জড়ানো পায়ে মোজা, বেতের ছড়ি হাতে। শহরের প্রাচীন ভদ্রলোক হেসে ডাক্তারকে বলছিলেন, 'চা-বাগান থেকে আসছে কিনা। তাই ভাবলাম চারিদিকের এই মেহেদীর চারাগুলো থাক—হঠাৎ ফাঁকা জায়গায় এসে মন খারাপ লাগবে।' ভদ্রলোকের এই রসিকতায় হেসে ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'না তাতে কি। এখন বাড়ি পাওয়াই মুশকিল। বেশ আছে।'

অর্থাৎ ডাক্তারের শ্বশুর আর সাব-রেজিস্ট্রারের কবে নাকি কোন্ জায়গায় একত্র চাকুরি করতে করতে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

সেই সূত্রে শ্বশুর মহাশয় সাব-রেজিস্ট্রারবাবুকে এই শহরে ডাক্তার জামাইয়ের জন্যে বাড়ি খুঁজে দিতে অনুরোধ পত্র দিয়েছেন আর সাব-রেজিস্ট্রার সযত্নে ডাক্তার-জামাইয়ের বাড়ি খুঁজে রাখেন। কেবল খুঁজে রাখেননি। অগ্রিম ভাড়া ক'রে রেখেছেন। চুণকাম করিয়েছেন, আগাছা সরিয়েছেন এবং মেহেদীর বেড়া সুন্দর করে ছাঁটিয়ে দিয়েছেন। কেবল বন্ধুর অনুরোধপত্রের জন্যে না। আধুনিক শহরের দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে শহরে নূতন একজন ডাক্তারকে গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা প্রয়োজনীয় কর্তব্য বিবেচনা করে মুরারী হাজরা কাজটি করেছেন।

আগে এখানে কুমুদবাবু থাকতেন। আদালতের নাজীর। ভদ্রলোক উঠে গেছেন—কিছুদিন আগে, তাঁর এক মেয়ে মারা যাবার পর—সাব-রেজিস্ট্রার বাড়ির ইতিহাস শোনাচ্ছিলেন, আর ডাক্তার দেখছিল নতুন জায়গা। ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল। অর্ধেক পীচ ও অর্ধেক সুরকি ঢালা লাল কালো রাস্তা দুটো সামনের ছোট্ট মাঠের ওপারে। মাঠে কার একটা ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে

এদিকে। নীহারনলিনী বাড়ির চারদিকের গলা-উঁচু মেহেদীর বেড়া দেখা শেষ ক'রে আড় চোখে দেখছিল চৌদ্দ বছরের চেরীকে।

'ওই মাঠ কি আর মাঠ থাকছে,' সাব-রেজিস্ট্রার আঙুল বাড়িয়ে বলছিলেন, ডেভলপমেণ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখছেন না। হস্‌পিট্যাল রোডের ওখান থেকে সিনেমা হাউস উঠেছে। আপনার এই বাদামতলা অবধি স্টল আসবে, রেস্টুরেণ্ট হবে সেলুন হবে। এ জায়গাটা হল হার্ট অব দি টাউন। বুঝলেন না। আপনাকে আমরা হার্টের মধ্যে এনে বসালেম। শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন ক্ষীণকায় সাব-রেজিস্ট্রার। জঙ্গল থেকে এক লাফে একেবারে শহরের মাঝখানে এসে গেলে কার না ভাল লাগে। নীহারের ভাল লেগেছিল, ডাক্তারের ভাল লাগছিল। আধুনিকতার মোলায়েম গন্ধ প্রথম দিনই নাকে লেগেছিল দুজনের। চেরী হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল. কোন দিক থেকে উড়ে এসে এক ঝাঁক পাখি বাদাম গাছে এসে ভিড় জমিয়েছে। তারপর পাঁচ বছর কাটল। পাঁচ বছরের পর্দা তুলতে একদিন দেখা যায় নীহারনলিনী একটা ইজি চেয়ারে চুপচাপ শুয়ে আছে। কোলের ওপর একটা বই। শিয়রে টেবিলের ওপর শেড পরানো ল্যাম্প জ্বলছে। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা সাতটা পঁয়ত্রিশে। পূবদিকের জানালা খোলা। বাদাম গাছের কালো কালো পাতা দেখা যাচ্ছে। পাখির কিচিরমিচির শব্দটা থেমেছে এই কিছুক্ষণ হল। ইজি চেয়ারের ওপর আধখানা হয়ে শুয়ে নীহার ভাবছে। ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাসির রেখা। পাঁচ বছরে ওর শরীরের এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে, দেখলে হঠাৎ চেনা যায় না। ছিপ্‌ছিপে শরীরে মাংস লেগেছে, গাল ভরে গেছে, গলার দুদিক মসৃণ নিটোল হয়েছে। যেন বয়স কমে গেছে নীহারের।

তার চেয়েও বড় পরিবর্তন চোখে মুখে সন্তোষ ও পরিতৃপ্তির ঘন গাঢ় প্রলেপ। চিন্তাকুল ছায়াটা কবে কোন্ দিক দিয়ে যেন সরে যাচ্ছে।

এখানকার নদীর মাছ, গোরুর দুধ, পালং শাক ও খেজুর গুড় খেয়ে শরীরের চেহারা ভল না হয়ে যায় কখনও। নীহার বলে পাহাড়ী হরিণ খেয়ে কি রকম শুকিয়ে গেছলাম।

কিন্তু এ ছাড়াও একটি কারণ আছে নীহারনলিনীর শরীর ও মন ভাল হওয়ার। ডাক্তার মাঝে মাঝে চিন্তা করে।

চেরী সম্পর্কে নীহারের দুশ্চিন্তাটা কেটে গেছে। নতুন জায়গায়। বেশি লোকজন। তা ছাড়াও নানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা। প্রত্যেক দিন পাড়ার মেয়েরা আসছে নীহারের কাছে।

আজ বিকেলেও এসে গেছে।

এবং শ্বশুর মশায়ের আশানুযায়ী ডাক্তার অল্প দিনেই ভাল পসার প্রতিপত্তি ও পয়সা জমিয়েছে। চেহারা ফিরে গেছে সংসারের।

বাগানের কুলী দিয়ে রান্না করানো নীহারের নানা কারণে আপত্তি ছিল বলে খারাপ শরীর নিয়ে নিজের হাতেই সব করত।

এখানে কুলির পরিবর্তে নিশ্চিন্ত মনে বামুন ঠাকুর রাখছে সে; নতুন সব ফার্ণিচার করিয়েছে নীহার নিজে দেখে শুনে।

রেডিও আসছে। শহরের আর দশটি স্বচ্ছল পরিবারের মত নীহারও রেডিওর ফরমাস দিয়েছে। চিরদিনই অবশ্য নীহারনলিনী ছিমছাম রুচিসম্পন্না। কিন্তু বাগানে থাকতে যদিও ওর পরনে দেখা গেছে মোটা জমীর সবুজ মারাঠী শাড়ি এখানে পড়ছে পাতলা চিকণ পাড় ধূপছায়া সুরাটি। আগে দু'কানে ছিল বল্, এখন হাস্নুহানা

ফুলের ছাঁদের সরু লেভীজ দুল। রুলির পরিবর্তে চুড়ি হয়েছে, আর, প্রথমটায় অবশ্য নীহারের লজ্জা করত—কিন্তু কথায় বলে চোখের অভ্যাস, ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড় সাব-রেজিস্ট্রার-স্ত্রীর মোহিনীবাবুর গৃহিণী ও আরও পাঁচজনকে দেখে দেখে অনায়াসে অক্লেশে সে এখন পাফ্‌হাতা ব্লাউজ পরছে।' যেন এটাই স্বাভাবিক। এ না হলে অসামাজিক হবে।

নীহার হবে অসামাজিক!

চুপচাপ অন্ধকার জানালায় চোখ রেখে সেদিন সন্ধ্যা থেকে ও ভাবছিল। ঠোঁটের কিনারে হাসির মৃদু রেখা। চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দীর মেয়ে লিলি নন্দী, সাব-রেজিস্ট্রারের মেয়ে অপরাজিতা, পুলিশ ইন্সপেক্টারের মেয়ে ডলি এবং জুনিয়ার উকিল রাধানাথ ও শ্যাম নাহার স্ত্রী এঁরা সব এসেছিলেন নীহারনলিনীকে অনুরোধ করতে সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য হতে সে রাজী আছে কিনা। 'কাকাবাবু আমাদের ভয়ঙ্কর উৎসাহ দিচ্ছেন এ শহরে মহিলা সমিতি গড়া দরকার,' সবচেয়ে অগ্রণী ও উৎসাহিনী হয়ে বড় বড় চোখ তুলে লিলি বলছিল, 'আপনার অমত হবার কোনো কারণ নেই মিসেস সেন।'

যোগীনবাবুকে কাকাবাবু এবং যোগীনবাবুর স্ত্রীকে কাকিমা না বলে মেয়েটি যে মিসেস সেন বলল, তাতে নীহার ভারি সন্তুষ্ট হয়েছিল। সুন্দর ঝকঝকে মেয়ে লিলি। রবারের হাতলের মতন গোল, বেঁটে, পাকানো বেণী কানের দুদিকে। তেঁতুল বীচির মত ছোট্ট কালো ফিতে পরানো ঘড়ি কব্জিতে। 'আপনাকে একজিকিউটিভ কমিটিতে থাকতেই হবে।' বেণী দুলিয়ে লিলি সাদা ধবধবে দাঁতে হাসছিল।

অনিচ্ছা প্রকাশ করবে নীহার! তবে আর ডাক্তারকে, ডাক্তারের মাথায় এই আইডিয়া তুলে দিয়েছে কে। কে যোগাচ্ছে উৎসাহ উদ্যম অফুরন্ত প্রেরণা। 'এই সময় এই সুযোগ,' রাতদিন স্বামীর কানের কাছে চীৎকার করছে নীহার। 'প্রচার করো নিজেকে,—প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে সোজা উপায় জনপ্রিয়তার রাজপথে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়া।'

'আচ্ছা, আজ, এখুনি তো আমি মত দিতে পারছি না'—হ্যাঁ, আমার সহানুভূতি আছে, পূর্ণ সমর্থন করচি, তোমাদের এই প্রচেষ্টা' বলে নীহার-নলিনী অল্প হেসেছিল। খুশি মনে মেয়েরা চলে গেছে।

সেই হাসির রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি নীহারের ঠোঁট থেকে—থেকে থেকে ও সারা সন্ধ্যা ভাবছিল সমিতির কথা।

কোথায় ছিল নীহার এতকাল, কোথায় পড়ে থাকত যোগীন ডাক্তার। না, পাহাড়ের যুগটা তাদের কলঙ্কের যুগ ব্যর্থতার দিন। সেই দিনের কথা নীহার ভুলে থাকতে চায়, স্রেফ মুছে ফেলতে চায়, মন থেকে!

অবিচার তারা শুধু নিজের ওপর করেনি, সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে মেয়ের ওপর। কেন ওকে আটকে রাখা হত?

এই লিপি ডলির মত চেরীও কি এমন সুন্দর সহজ ফুরফুরে একটি মেয়ে হতে পারত না? টুকটুক করে ঘুরে ওদের সঙ্গে চাঁদা তুলতে পারত না। কোথায় ছিল সেই জঙ্গলে এই আবহাওয়া।

নীহার এখানে এসেই মেয়েকে মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। বিলম্বে পড়া আরম্ভ। এখানকার আধা সরকারী মেয়ে-স্কুলের ছোট মেয়েদের সঙ্গে বেমানান ঠেকাবে তাই মেম সাহেবের ওখানে মেয়ের পড়ার ব্যবস্থা।

নীহার চেরীকে বলে, তোমার যেখানে খুসি বেড়াতে যেও, একলা বা চাকর ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে। রাত হবার আগে ঘরে ফিরলেই যথেষ্ট।

চেরী স্কুলে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও বেরোয় না, একেবারেই না! এজন্যে নীহারের বেশ দুঃখ হয় মাঝে মাঝে।

রাস্তার ধারের মেহেদীর বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়ে। যেন বাইরে যেতে ওর ভয়।

ডাক্তার বলে, 'ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়ে কিনা তাই অত ঘোরাঘুরি পছন্দ করে না।'

'ঠাণ্ডা কি গরম তুমি বুঝবে কি।' উষ্ণ হয়ে উত্তর করে নীহার। 'কুকুর বেড়াল আর কুলির দেশে থেকে স্বভাব হয়েছে মেয়ের বুনো, এখানে ভাল ভাল মানুষ দেখে দূরে সরে থাকে।'

কেন মেয়ে বাইরে যাচ্ছে না। দুঃখে এখন আবার নীহারের হার্টের দোষ হবে, বাগানে থাকতে অসুখ বাড়ছিল, মেয়ে বাইরে যাবে আশঙ্কায়। ডাক্তারের এই ভয়। তাই মেয়ের হয়ে ওর কর্তব্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ, নিজেই যতটা পারছে, ডাক্তার সোশ্যাল হবার চেষ্টা করছে। নীহার কতকটা শান্তি পাবে ভেবে। ওর শরীর ভাল থাকবে। তাই কি?

অবশ্য ডাক্তারের বাড়ীর সামনেটাও খারাপ না। রাস্তার ওপরে "মেনকা-মিনারে"র গায়ে বেগ্নী ইলেকট্রিক আলোর ফুল ঝল্‌সে উঠে সন্ধ্যা থেকে। সে যে কত সুন্দর দেখতে! বড় শহরের প্যাটার্ণে তৈরী ছোট শহরের এই সিনেমা হল। সকলের মুখে শুনছে নীহার। হলের ফ্ল্যাস লাইট্ এখানে অবধি ধুয়ে দেয়, ডাক্তারের বারান্দা, সি ড়ি। মেহেদী বেড়ার গায়েও এসে ছিটকে পড়ে, আঁজলা আঁজলা আলো। আর বেড়ার গা ঘেঁসে তুমি দাঁড়াও, দেখতে পাবে মেনকা-মিনার-এর দু'ধারে

সুন্দর সাজানো সব মণিহারী দোকান, চা-এর ষ্টল, চুল কাটার সেলুন। ডাইং-ক্লিনিং-এর নাম হয়েছে 'মলিন-মুক্তি'—কাপড়-ধোয়া দোকানের এমন সুন্দর নাম হতে পারে নীহার জানত না। সেলুনের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রসাধন'; চা-এর স্টলগুলির নাম প্যারাডাইস, অবসর, বিশ্রামকক্ষ এইসব।

ক'দিন আর লাগল, দেখতে দেখতে এসব হয়ে গেল, নীহারের চোখের ওপর। নীহার দেখছে আর ভাল লাগছে ওর। কোথায় ছিল সে, কি ক'রে কাটিয়ে এসেছে এ্যাদ্দিন সেই তিমিরে ভেবে অবাক হয়।

চেরী বলে, 'কাজ কি বাইরে গিয়ে। এখানে আমাদের এই বেড়ার ধারে দাঁড়ালে সব কিছু তো দেখা যায়।'

'হ্যাঁ, সব দেখা যায়, বোঝা যায় নতুন, আধুনিক এক শহরে আমরা এখন বাস করছি।'

নীহার স্বীকার করে। মেয়েকে বলে, 'দেখা তো যাবেই। আমরা আছি যেখানটায়, সেটাই হার্ট অব দি টাউন। শহরের বুকের মাঝখানে রয়েছি।' তাই মেয়েকেও সময় সময় উপদেশ দেয়, 'বেশ তো, বাইরে না যাও, ওখানটায়, গেটের কাছে গিয়ে বিকেলে একটু দাঁড়িয়ে থাকলেও তো পার। ঘরে বসে থাকলে চোখ-মুখ ফোটে কখনও। এমনিতে তোমার দেরীতে লেখা-পড়া আরম্ভ। কত লোক, কত ছেলেমেয়ে আসছে ওখানটায়।'

ক'দিন ধরে চেরী তা-ই করছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বেড়ার ধারে। রাত হলেও নীহার মেয়েকে ঘরে ডাকে না। এ সময়েই সিনেমায় গানগুলো দেয়। গানগুলো পরিষ্কার শোনা যায়। কদিন ধরেই শুনছে নীহার। বলে মেয়েকে, 'বরং ওখানে দাঁড়িয়ে গান ক'খানা যদি শিখে নিতে পারিস মা।

আহা কি সুন্দর সুর কথা—'বলে মা নিজেই-গুণ গুণ করে উঠে। নীহার চুপ করে জানালার দিকে চেয়ে থেকে এতক্ষণ একটা গান শুনছিল। চেরী বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছে। কতকটা এই কারণে এবং লিলিরা দল বেঁধে আজ এসেছিল, তাই বিকেল থেকে নীহারের মনটা বড় বেশি ভাল লাগছিল।

না, আরো একটা কারণ।

গোলাপের কলির মত একটা আশা জেগে উঠেছে নীহারের বুকে।

রিক্সা করে ছেলেটি যখন অফিসে যায়, চেরী কি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল না? চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে নীহার লক্ষ্য করেছে।

অটলবাবুর ছেলে। নাম নিশানাথ। খুব ভাল চাকরি করছে। কেবল তাই নয়। ভারি চালাক-চতুর। জীবনে উন্নতি করবে এই ছেলে, সবাই তো বলছে।

ডাক্তারকে বলে দিয়েছে নীহার যদি আজ অটলবাবুর কাছে কথাটা তুলতে পারে। 'ছেলে হিসেবে এর চেয়ে ভাল ছেলে তুমি আশা করতে পার নাকি। তোমার মেয়ের নাক মোটা, বুদ্ধি মোটা। গায়ের রং ফর্সা বলেই তো আর নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতে পার না।' ডাক্তার হেসে ঘাড় নেড়েছে। বলেছে, 'চেষ্টা করব।' কেননা, চেরী-সংক্রান্ত ব্যাপারেই নীহারের সকল অসুখের উৎপত্তি, সব ভুললেও ডাক্তার এ তথ্যটি ভুলত না এবং এ তথ্য উল্টাতে গিয়ে কতবার বিপদ ঘটেছে তা-ও ডাক্তারের মনে আছে। তাই সেবারের বড় অসুখের পর থেকে আর কিছু না হোক, অন্তত চেরী সম্পর্কে নীহার করণীয় ও অকরণীয় যখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে ডাক্তার তাই মেনে নিচ্ছে। তবু স্ত্রী ভাল থাক। ডাক্তার-গিন্নী বারো মাস অসুস্থ লোকে শুনলে বলবে কি।

নীহার এখন তা-ই ভাবছিল।

হয়ত আজ ভদ্রলোকের একটা মতামত নিয়েও আসতে পারে ডাক্তার।

ঘড়ির কাঁটা যখন আটটা-নটা এবং দশটার কাঁটা পার হয়ে সাড়ে দশটার কাছাকাছি এসে ঝুলতে লাগল, বই বুকে নিয়ে তেমনি স্থির নির্বিকার হয়ে নীহার ইজিচেয়ারে শুয়ে রইল।

সিনেমার গান থামল। এখনও সব আলো নেভেনি। এখন পর্যন্ত চেরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধৈর্যভরে রাস্তা দেখছে ভেবে নীহার পুলকিত হয়ে উঠছিল।···মেয়ের সুবুদ্ধি হোক, মেয়েকে সুবুদ্ধি দাও, ভগবান। বলছিল মা মনে মনে।

ফ্যালনার ঘরে কিন্তু এত রাত অবধি আলো জ্বলে না। সন্ধ্যাটি হতে রান্নাটি শেষ করে ফেলে ফ্যালনা।

রাত জেগে করবে কি। চাটাইয়ের ওপর শুয়ে চিন্তা করে সে। শহুরে অঞ্চলে জায়গা। রাস্তায় বেরোনো মানে পয়সা খরচ। গাঁয়ের ছেলে শহরের বিস্কুটের কারখানায় খেটে খেতে এসেছে। ঘরে বুড়ো বাপ আছে, বোন আছে বিয়ের বাকি। এসব চিন্তা ক'রে মুখ বুজে খাটে আর মাইনের টাকার অর্ধেকটা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেয়। ফ্যালনা জানে আমোদ ফূর্তি। কিন্তু তার রসদ যোগাতে কড়ি জুটবে কোত্থেকে। তাই চুপ করে থাকে সে।

রাম্বু হাসে। 'কড়ি জুগাইব ভূতে, কড়ি জোটায় শয়তান, বুঝলি ফুর্তি করবার মেজাজ অইলে আপনা থেহে জোটে।'

ফ্যাল্‌না ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। রাম্বুর মুখ দেখে না। অন্ধকার ঘর। রাম্বুর গলা শোনে। আর দেখে ফটাস্ করে দেশলাইর

কাঠিটা জলে উঠে একটা বিড়ির মুখ লাল করে দিয়ে আবার নিভে গেছে। বোঝা গেল, রাসু চাটাই বিছিয়ে শোবার উদ্যোগ করছে।

'কডা বাজে রাসু ভাই?'

'বারোটা বাজাইছে ঘড়ি শুনছস না।'

ফ্যালনা কান পেতে শোনে। জেলখানার পেটা-ঘড়ির শব্দ এখান অবধি ভেসে আসে। চাটাইয়ের ওপর গা মেলে দিয়ে রাসু ফের ফিক্ ফিকিয়ে হাসে। যেন বাইরে সারাদিন যত আমোদ ফূর্তি করে এসেছে. সেগুলি এখন পেটের ভিতর গুণ গুণ করছে। হাসির ধমকে রাসুর হাতের বিড়ি কাঁপে। দেখে অন্ধকারে ফ্যালনা একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে।

'বুঝলি বেড়াল আইজ আবাব বেড়ার ধারে আইছিল।' রাসু বলল। ফ্যালনা চুপ করে রইল।

'আইজ আমি যতবার তাকাইছি আমারে দেখছে।' রাসু আবার বলল। ফ্যালনা চুপ।

'চলা ফিরা দেখলে বোঝা যায় কেমনতর মাইয়্যা।' যেন নিজের মনে রাসু এবার হাসল একটু।

'তোমার কি পাপের ডর নাই রাসু ভাই।'

'পাপটা কোন্‌হানে দেখলি তুই, পাপ কেম্‌নে জিগাই।' রাসু মুখের একটা শব্দ করে।

খারাপ রোগে শরীল তোমার পচা ধরছিল্। ডাক্তারের ইঞ্জেশনে ভাল অইলা। অখন ওর মাইয়্যার সর্বনাশ ভাবছ বুঝি।

রাসু চুপ করে থাকে।

ফ্যালনা বলে, 'ভাল না এডা। এমুন কাজ করবা না।'

'আমার দোষ কি। মাইয়্যা যদি আমারে দেইখ্যা বেড়ার কাছে আইরে আমি করমু কি।'

ফ্যালনা আবার তখন চুপ করে থাকে। কা'র দোষ ভাবে। রেলের মালগুদামে কাজ করার সময় রাসুর এক পা কাটা গেছে। তখন থেকে খোঁড়া। একটা চোখ গেছে খারাপ রোগে। চিরকালইতো ও কুচরিত্র। দু'জন, মানে ফ্যালনা আর রাসু যখন গাঁ ছেড়ে শহরে এল রোজগারের ধান্দায় সেদিন থেকে রাসুর বদ্ দিশা। ফ্যালনা দেখছে। কিন্তু সাহস পায় না সে কিছু বলতে। কারণ ফ্যালনার চেয়ে রাসু রোজগার করে বেশি, অনেক বেশি। তাই রাসুর প্রতাপ অধিক হাঁক বড়।

ফ্যালনা বিয়ে করবে কি। বিস্কুটের কারখানায় কুড়ি টাকার চাকুরি। ঘরে বুড়ো বাপ আছে, বোন আছে বিয়ের বাকি। ক্ষেত খামার নেই। এই কুড়ি টাকা এখন সম্বল। অবশ্য রাসুর কথা অন্যরকম। শহরে পা না দিতে ও হুট করে মালগাড়ির চাকুরি জোটায়। তারপর 'অটো-দিল-বাহার' বিড়ির কারখানায় কাজ জোটে। চুক্তির কাজে পয়সা বেশি। ফ্যালনা মাথা কুটে পারল না এমন একটা কাজ বাগাতে। ফ্যালনার চেয়ে রাসুর বুদ্ধি বেশি, চতুর বেশি। অবশ্য বিয়ের কথা তুললে রাসু বলে, 'কাজ কি মরা গলায় বাঁইধ্যা। বিয়া করা মাইয়্যার ঝকট বেশি লটখড়ি, বুঝলি এর নাম শহর। এহানে পয়স্যা দিলে অই দব্য জোটে।' ফ্যালনা আর কিছু বলে না। কেননা রাসুর যে রোজগার বেশি বড় গলা করে ও যখন এ টা জাহির করে তখন আর ফ্যালনার কিছু বলার থাকে না। তবু, ফ্যালনা মনে মনে জানে, রাসুর শহুরে মেয়ে ছাড়া এখন অন্য মেয়ে পছন্দ হবে না। ওর চোখের দিশা ঘুরে গেছে গাঁ ছাড়বার পর থেকে। কোনখানে কাজল, মাথায় সুগন্ধতেল, পায়ে আলতা খুঁজছে কেবল এইসব। বলে, তোর বোন কুসুম তো ওই মেয়েডার সমান।

ফ্যালনা আর কিছু বলত না। কেননা, বোন নিয়ে রাসু ঠাট্টা আরম্ভ করলে ফ্যালনা চুপ করে যেত। রাসুর বোন ছিল না বলে ও

অন্তের ওপর এই সুবিধা নিত। তাই কি? কিন্তু রাসুর পরিবর্তনটা তো সে চোখের ওপর দেখছে। ক'দিন হ'লো আর গাঁ ছেড়েছে। আসলে রাসু বাবুঘেসা হয়ে গেছে—ভয়ানক বাবুঘেসা। সেলুনে ঘাড় চাঁছে; চা খায় দিনে আটবার। বিড়ির কারখানায় পোষায় না তাই এখন সিনেমার টিকিট কিনে রাস্তায় ঘুরে চড়া দামে বিক্রী করছে। কিছু বললে বলে, 'আইচি শহরে পয়স্যা রোজগার করতে, সোজা লাইনে বেশি পয়স্যা যেহানে ঢু মারমু সেহানে। তোর মত সরকার শালার কারখানার পচা গোবর খাইয়্যা বিস্কুট বানামু নাহি ভাবছিস।'

পাপের কথায় রাসু আজ আবার রেগে ফ্যাল্‌নাকে যা-তা বলছে। অনেক রাত পর্যন্ত বকবে ও। টের পেয়ে চুপ ক'রে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন ভান ক'রে রইল ফ্যাল্‌না অনেকক্ষণ।

অন্ধকারে রাসুর মুখে খৈ ফুটছিল। 'হানিফের হোটেলে মুর্গি খাইছি তো পাপ অইল, চপলের বাড়ি গিছি তো পাপ করলাম, ছিনেমার টিকিট বেচায় পাপ,—তোর শালা দুনিয়ার বেবাক কামই পাপ। পয়সা খরচের ক্ষেমতা নাই যার তার মনে পাপের ডর ছাড়া আর কিছু আছে নাহি।'

ফ্যাল্‌না আর শব্দ করে না। রাসু ঘুমন্ত ফ্যাল্‌নাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রসের কথা বলে, 'কাইল আইছিল বেড়ালনী সিঁড়ির মাথায়, আইজ আইছিল্ একবারে বেড়ার গা ঘেঁইস্যা।'

যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে ফ্যাল্‌নার। উঠে দরজার ঝাপ তুলে বাইরে যায়। কদম গাছের মগডালে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ঝুলছে। বাদুড় ঝট্‌পট্ শব্দ করছে থেকে থেকে মাথার ওপর। রাত নিশুতি। চারদিক নিঝুম। সিনেমাঘরের উঁচু গম্বুজটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল ফ্যাল্‌না। রাসুর বকর্ বকর্ থামলে ও ঘরে গিয়ে ঘুমোবে এই মতলব।

পোদ্দারের রাইস মিলের চালার দিকে চোখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ফ্যাল্না। হঠাৎ চম্‌কে উঠল। চম্‌কে উঠবার কথা বটে। ফট্‌ফট্‌ করছে জ্যোছনা। সাদা ধব্‌ধবে কি একটা মিলের গুদামঘরের চালা থেকে লাফিয়ে নিচে কানাস্তারার গাদায় এসে পড়ল। অথচ শব্দ হ'ল না এক ফোঁটা। চোখ বড় ক'রে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফ্যাল্না বুঝল, কি এটা। ইটের গাদার পাশে মোটা ল্যাজটা ওপরের দিকে তুলে দিয়ে লাল বাদামি চোখ মেলে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে আছে ফ্যালনার দিকে। যেন ফ্যাল্‌নার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। কেন, রাগ, কিসের রাগ বেড়ালনীর, ফ্যাল্না বুঝল না, বুঝতে চেষ্টাও করল না, কেননা, অবাক হয়ে সে কেবল ভাবছিল তখন এমন শব্দ না করে ওরা চলাফিরা করে কি ক'রে। রাসুর বেড়াল বেড়ার ধারে যখন এসে দাঁড়ায় পায়ের শব্দ হয় না কি একটু।

ফ্যাল্না ফের যখন ঘরে গিয়ে ঢোকে, রাসু কিত্‌কিত ক'রে হাসে। বোঝা গেল রাসু তখনো জেগে। কি এক কুমতলব এসেছে মাথায়।

'একটা বুদ্ধি আইছে মগজে শোন।' অন্ধকারে রাসু ফ্যাল্‌নাকে ডাকে। 'বুঝলি, রুজিরোজগারের জায়গা ইডা, শহর। তুই এক কাম করবার পারিস।'

'কি কাম?' ফ্যাল্‌নার তেমন কৌতূহল নেই, কেননা, রাসুর একটা প্রস্তাবও তার ভাল লাগে না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাসু ফের বিড়ি ধরায়। তারপর আস্তে আস্তে কথা তোলে।

ফ্যাল্‌নার পা থেকে মাথা অবধি গরম হয়ে যায় রাসুর প্রস্তাব শুনে।

অরুণা স্থির হয়ে শুনল। অরুণা শুনছে এখানে এসেছে পর থেকে। টেবিলের দুই ছোট্ট একটা নিঃ সুশী বলল, 'তারপর শোন অরুণাদি—'

বয়সে সমান দু'জন, কি হেডমিস্ট্রেস সুশীলার চেয়ে দু' এক বছরের ছোটও হ'তে পারে, তথাপি পদমর্যাদা বজায় রাখবার জন্যেই যেন অরুণাকে সুশী 'অরুণাদি' ডাকে। বলল, 'আমাদের প্রেমের কৈশোর তখন, আমায় ও প্রেজেণ্ট করেছিল এত বড় একটা আরশী, বলেছিল, যতবার এই আরশীতে মুখ দেখবে আমার কথা মনে পড়বে তোমার, কেননা তোমার মুখ আমার মনের আয়নায় রাতদিন ভেসে আছে, ভেসে থাকবে, সুশী।'

একটুক্ষণ চুপ থেকে আজ অরুণা প্রথম প্রশ্ন করল, 'কিন্তু বিয়ে করতে গেছলে কেন, বিয়েতে রাজী হওয়া তোমার উচিত হয়েছিল কি?'

'ও বিয়ে করবে না যেদিন শুনল আমার মা' সুশী ক্ষীণ হাসল, অরুণার চোখে চোখে চেয়ে অল্প মাথা নেড়ে বলল, 'জানই তো, বাংলাদেশ, মেয়ে বড় হয়েছে মা কি আর চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে। বিধিমত বিয়ের চেষ্টা চলল পাত্র ঠিক হ'ল—'

'আর ওমনি তুমিও রাজী হয়ে গেলে?'

'আমার মতামতের দাম কি। সতেরো বছরের মেয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য কে দেয় এই সমাজে?'

অরুণা চুপ।

সুশী বলল, 'লাভের মধ্যে হ'ল এই বেচারাদের কাউকে আমি ভালবাসতে পারলাম না।'

'কে আছে স্বামীর সংসারে?

'সব, সবাই। বাঙলাদেশের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার বলতে যা বোঝায়, দেওর, ভাশুর, জা, ওদের ছেলেমেয়ে,—শ্বশুর নেই, স্বামী মারা যাবার ঠিক এক বছর আগে উনি মারা যান। শাশুড়ী আছেন।'

'তাঁদের মত আছে এই চাকরিতে?'

'কেন মত থাকবে।' সুশী সিলিং-এর দিকে তাকাল। 'তুমি তখনও আসনি অরুণাদি, শাশুড়ী একদিন এসেছিলেন এখানে ছোট দেওরকে সঙ্গে নিয়ে।'

'তোমায় দেখতে?'

'আমায় ফিরিয়ে নিতে।' অরুণার মুখের ওপর চোখ রাখল সুশী। 'আমার কথা শুনে তুমি অবাক হচ্ছ, আমায় ওরা আদর করত, আমায় রাখত ওদের আপনজন ক'রে তবু কেন চলে এলাম! কেন মন বসল না একান্নবর্তী বিশাল গৃহস্থপরিবারের শুদ্ধাচারিণী পতিব্রতা বিধবা সেজে থাকতে। আমার মনেও এ প্রশ্ন জেগেছিল, কেন এলাম।' সুশী চুপ করল। অরুণা নীরব।

'ভালবাসা?' সুশী হঠাৎ প্রশ্ন করল যেন, তারপর আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে নিজের মনে হাসল। 'বিয়ের আগে শহরের একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল এদিনে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই, তুমি জান অরুণাদি।'

অরুণা ঘরের দেয়ালের ওপর চোখ রাখল।

'তা নয়। এখন বুঝছি সেজন্য আমি সবাইকে ছেড়ে চলে আসিনি। সত্যি আমার উচিত ছিল, অরুণাদি, ওদের ভালবাসা; এমন স্বামী হয় না, ওঁর ভাই, বাপ, মা,—অতুলনীয়, এমন মানুষ এ জন্মে আর পাব না ঠিক। তা নয়।' আবেশাচ্ছন্ন গলায় সুশীলা বলল, 'এক এক সময় মনে হয়, আমার শিক্ষায় ত্রুটি ছিল, আমার বড় হওয়ার, সতেরো বছর অবধি বেড়ে

ওঠার মধ্যে গলদ ছিল নিশ্চয়। বড় ভাস্তর বলেছিলেন ঘরে পড়াশোনা কর। দরকার হয় টিউটর রেখে দিই। অর্থাৎ—' স্বচ্ছতর হয়ে এল সুশীলার গলা, 'আর দশটি রুচিবান অভিভাবকের মত তিনি প্রথম শুনে বিশ্বাসই করতে পারেননি আমি বাড়ী ছেড়ে এসে একটা মেয়ে-স্কুলে মাস্টারী করব। যখন কিছুতেই আমায় রাজী করানো গেল না,—ঘরের বাইরে পা বাড়াবই, রাগ করে এক ননদ বলেছিল, শিক্ষয়িত্রীর মেয়ে, শেষ পর্যন্ত অই হবে আমরা কি জানতাম না।'

সুশীলার মুখের করুণ হাসি অরুণাকে আঘাত করল। 'না, হাসির কথা নয়, ঠিকই বলেছিল ননদ মনোরমা। আ, স্বামী সন্তান নিয়ে কী সুখে আছে মনোদি, দেখলে ঈর্ষা হয়।' কথা শেষ করে সুশীলা চোখ বুজলো একবার। পরে আস্তে আস্তে চোখ মেলে বলল, 'কোথায় যেন ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল কৃত্রিম এই শহুরে-জীবনে, শৈশব আর সবটা কৈশোর যদি আমার এখানে না কাটত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণা কি বলতে যাচ্ছিল, সুশীলা বলল, 'আমি কি জানতাম না, অর্ধেক আলো অর্ধেক অন্ধকার নিয়ে গড়ে উঠছিল আমার প্রথম যৌবন। আধখানা গাঁয়ের মন আর আধখানা নতুন জেগে-ওঠা শহরের দৃষ্টি নিয়ে মা আমাকে মানুষ করছিল। নিশীথ যখনই এবাড়ি এসেছে মা আমাকে অবাধে মিশতে দিয়েছে।'

'তারপর?' অরুণা উৎকর্ণ হয়ে আছে।

'তখন সবে আমি 'দেবদাস' পড়ে শেষ করেছি, ও দেখছিল টার্জন-এণ্ড হিজ মেট। এ শহরে তখন সিনেমা এসে গেছে কিনা।' অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করল সুশীলা। 'নতুন সভা-সমিতি হচ্ছে। মহিলাদেরও ডাক পড়ত। মহিলাদের মধ্যে সভায় যোগ দিতে দেখতাম কেবল আমার মা আর লিলির মা মানে মোহিনীবাবুর স্ত্রীকে, আর কাউকে তখন পর্যন্ত দেখিনি।

'তারপর ?' সুন্দর কাহিনী শুনবার জন্যে অরুণা সোজা হয়ে বসল।

'মা বসে বসে ঘামত, গলা কাঁপত, গা কাঁপত দেখতাম পুরুষদের সভায় উঠে দাঁড়িয়ে যখন কথা কইত। তবু সারারাত জেগে লেখা 'নারী-প্রগতি' প্রবন্ধ শেষ পর্যন্ত মা পড়ে শেষ করত। অনেকবার করেছিল।'

অরুণা চুপ।

সুশীলা বলল, 'শেষ পর্যন্ত সেই সাহস রাখতে পারেনি, তোমায় আগেই বলেছি, বিয়ের বয়েস হ'তে আমায় পাত্রস্থ করতে মা প্রায় মাথা গরম করে ফেলেছিল।'

'ততটা অগ্রসর হননি তাঁরা তখনও', অস্ফুটে অরুণা বলল।

'আর আমরা রাতারাতি তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি।' উত্তেজিত শোনাল সুশীলার গলা। 'না, অরুণাদি মিথ্যা বলেছি। আমার মতামতের মূল্য দেয়নি মা, তাই বিয়ে হয়েছিল মেয়ের,—বিয়ের ষোল-আনা কারণ বুঝি তা ছিল না। মতামতগুলো নিজের মধ্যে গোল পাকিয়ে তুলেছিল। না-এর চেয়ে হ্যাঁ-এর শব্দই বেশি শুনলাম শরীরের মধ্যে রাত্রে শুতে গিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। শরীর সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন করে তুলেছিল আমাদের ভালবাসা। এ যুগের ভালবাসার ধর্মই এই,—জানি না, কাউকে তুমি ভালবেসেছ কি না, অরুণাদি।' উত্তেজনার মধ্যেও সুশীলা ঠোঁট বাঁকা করে ঈষৎ হাসল। শরীর সর্বস্ব হয়ে গেছি আমি তখন, সেই সতেরো বছর বয়সে। তাই বিয়ে ও ভালবাসার মধ্যে বিয়ের জয় হ'ল।

'তবু দ্বিধা সংশয় দুঃখ বা বিচ্ছেদ-বেদনা, যা-ই তোমরা আখ্যা দাও, মনের আনাচে-কানাচে যেটুকু লেগেছিল, সন্ধ্যার পর নিশীথের কথা শুনে তা একেবারে দূর হ'ল।—'আমি ত আছিই তার ওপর একটা স্বামী জুটল,' কানে কানে বলল ও 'তোমারই লাভ হল বেশি, সুশী। তুমি সুখী।'

সুশী চুপ করল।

অরুণা তেমনি নীরব।

সুশী বলল, 'তাই স্বামীর কাছে যেতে দুঃখ তো হ'লই না এবং শ্বশুর-বাড়ী থেকেও যতবার এখানে এসেছি আমার সুখের তার সমানভাবে বাঁধা আছে দেখলাম। বুঝলে অরুণাদি, শ্বশুরবাড়ি যাওয়াতে মা যেমন খুশি হয়েছিল, এখানে ফিরে এসেও সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা যখন নিশীথের সঙ্গে কাটত মাকে একদিন অখুশি হতে দেখিনি, এমন।'

সুশীর চোখে চোখে তাকাল অরুণা।

সুশী চোখ না নামিয়ে বলল, 'শরীরধর্মী ভালবাসা অবসরের অপেক্ষা রাখে কম। একবার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল বেশ কিছু-দিন। এসে দেখলাম, অবশ্য এমন আশঙ্কা বুকের মধ্যে জেগেছিল আমার বিয়ের রাত থেকেই, নিশির পাশে আর একটি মেয়ে লিলি।'

'লিলি নন্দী, যে আজ বিকেলে দলবল নিয়ে মহিলা-সমিতির চাঁদা তুলতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, চেয়ারম্যান মোহিনীবাবুর মেয়ে।' একটু থেমে সুশীলা বলল, 'না, লিলি ভুলে গেছে, জীর্ণ পত্রের মত উড়িয়ে দিয়েছে সব স্মৃতি, ওঁর শক্তি আছে তাই। আমি পারি না, আমি পারিনি, দুর্বল, তাই কি। শরীরের স্বাদ—'

অরুণা চোখ নামাল।

'হ্যাঁ, লিলি একটি সন্তান পর্যন্ত ধারণ করেছিল। আমি জানি। আমার কাছেই এসে কেঁদেছিল। প্রেমিক তখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে।'

'তারপর?'

ঠিক চমকায় না অরুণা। বড় বড় চোখে তাকায়।

'এত কথা তোমায় আজ বলতাম না অরুণাদি।' সুশীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'লিলি নন্দী ফুরফুরে প্রজাপতি সেজে চাঁদা তুলছে, বা ফিরে এসে নিশীথ দিব্যি গাড়ি চড়ে নিরঞ্জন রায়ের স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, সে সব আমার বক্তব্য নয়, আমার কথা আমাকে নিয়ে. আমি কেন নিঃশেষ হয়ে গেলাম।' করুণ চোখে তাকায় সুশীলা। 'অগ্রসর হতে এক জায়গায় এসে কি আমি থেমে যাইনি ?'

'কি রকম ?'

'থাক আজ আর নয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সুশীলা।

'অই দেখ রাত বারোটা বাজে।' আঙুল দিয়ে অরুণার টেবিলের টাইমপীস দেখিয়ে সুশীলা বলল, 'তোমায় ডিস্টার্ব করলাম। খামোক সময় নষ্ট আর কি। আসল কথা কি, আমার কোল্ড-ক্রীম ফুরিয়েছে তোমার একটু ক্রীম নিতে এলাম, ভাই। ঠাণ্ডায় ঘুরে এসে বড্ড মুখ চর্চর করছে।'

'হ্যাঁ, তা নাও, নেবেই তো।' হাত বাড়িয়ে অরুণা ক্রীমের কৌটো এগিয়ে দেয়।

'সতেরো বছর বয়স থেকেই এই শরীরের দিকে ঝোঁক পড়েছিল কিনা, তাই শরীরে কোথাও একটু ফাটল ধরলেও চিন্তা হয়।'

সুশীলার কথায় অরুণা হাসল।

'চিঠি লিখছিলে নাকি ?' টেবিলে ঝুঁকে পড়ে সুশীলা।

'হ্যাঁ, বোনঝিকে।' অপাঙ্গে অরুণা টেবিলের ওপর নিজের লেখা অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা একবার দেখল।

সুশী সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'একটা প্রশ্ন কিন্তু তোমায় আজও করা হয়নি, অরুণাদি।'

'কি, প্রেম, কাউকে ভালবেসেছি কি না ?'

আঙুলের ডগায় ক্রীম তুলে গালে ঘসতে ঘসতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সুশীলা।

'ভালবাসতে কি না।' সুশীলা হাসল।

'ভাল যে বাসছে সে কোন্ দুঃখে শিক্ষয়িত্রীগিরী করতে আসবে?'

'অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রীর শূন্য ধূসর জীবনে প্রেমের অবকাশ নেই এই তুমি বলতে চাও?'

'এদেশের শিক্ষয়িত্রীদের দেখলে কি তাই মনে হয় না, অরুণা?'

'হবে, হতে পারে।' অরুণা দেয়ালের দিকে চোখ রাখল। সুশীলা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণা আরো কতক্ষণ তেমনি চুপ করে বসে রইল। সুশীর কথাগুলো ঘুরে ফিরে তার মনে হচ্ছিল। সুশীর সঙ্গে একসঙ্গে এতগুলো কথা অরুণার আর হয়নি এখানে এসে অবধি। কথায় কথায় শনিবারের বিকেলে ওরা দুজন আজ বেড়াতে বেরিয়েছিল। রেস্টুরেণ্টে স্কুল-কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বসে খাওয়া, গল্প করা এবং ডাক্তারবাবু দুজনকে একেবারে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার প্রত্যেকটি দৃশ্য অরুণার মনে পড়ল। মনে পড়ল মহিলা-সমিতির অগ্রণী লিলি নন্দীকে, স্টুডি-বেকারের স্টীয়ারিং হুইল ধরে রাখা নিশীনাথকে, নিশানাথের ঘারের কাছে মুখ এনে ধরা পশ্চাদ্বর্তিনী রূপসীকে, আর স্থানুর মত স্থির,—গাড়ির পিছনের সীটে উপবিষ্ট নির্জীব ধনাঢ্য এক নিরঞ্জন রায়কে। তিনটা আধুনিক শহর ঘুরে অরুণা এখানে এসেছে, এই ছোট শহরে। আধুনিকতার ছোটখাটো সুন্দর কাঠামোটি এখানে গড়ে উঠেছে অরুণা চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে। অসংলগ্নতা বা আশ্চর্যের কিছুই নেই, যা স্বাভাবিক,—অন্য শহরে যেমন আছে; হ্যাঁ, থার্ড ক্লাশে জিওগ্রাফী পড়ায় যে মেয়েটি, সারাদিন এমনি প্রায় চুপ করে থাকে, সাদাসিধে, সেই সুশীর প্রেম, বিবাহ, ব্যর্থতা আর

তারপর ব্যর্থ দিনাতিবাহনের রংহীন কাহিনী কিছুই নতুন ঠেকল না অরুণার কাছে—বা শোবার আগে সুশীর একটু ক্রীম গালে ঘসার লোভ, কি ডাক্তারবাবুর এতরাত্রে টিচার্স-কোয়ার্টারের চৌকাঠ পর্যন্ত আসা বা শিশুর মত অবিমিশ্র হাসি। স্বাভাবিক, সবই স্বাভাবিক। সাড়ে বারোটায় ঘরে এসে যখন ঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করছে অরুণা কলম তুলে চিঠি শেষ করতে বসল। শোবার আগে তার মনে পড়ল সুশীলার সুন্দর কথাটি, 'অগ্রসর হতে হতে একজায়গায় এসে যেন থেমে গেছি। আমি কি দুর্বল?'

প্রতিপদের চাঁদের মত পরিচ্ছন্ন মার্জিত এক চিলতে হাসি অরুণার ঠোঁটে উঁকি দেয়। চিঠি লেখা শেষ ক'রে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ে। সুশীর ঘরের আলো নিভেছে অনেকক্ষণ।

কিন্তু ঘরের আলো নিভলেই তো আর চোখে ঘুম নামে না। সুশী ঘুমোয়নি, শুয়ে শুয়ে ভাবছে, অরুণা অনুমান করল।

সবচেয়ে বেশী রাত অবধি আলো জ্বলে পপি-লজে, নিরঞ্জন রায়ের বাংলোয়।

দিনের বেলায় বাংলোটি দেখতে ছবির মত সুন্দর। লাল সুড়কি ঢালা সবুজ দুর্বা ছোপানো, জিনিয়া ডালিয়া, ম্যাগ্‌নোলিয়া ছড়ানো পরিচ্ছন্ন লন, সিমেণ্ট ও অ্যাসবেস্টাসে তৈরী কাগজের মত শাদা ঘর। সবুজ জানালা। জানালার পর্দা আকাশের মত নীল।

শহরের এটা শেষ প্রান্ত। তার পরে মাঠ, তারপর নদী। নদীর যেখানে শুরু সেখান থেকে গ্রাম। ধান ক্ষেত, শর্ষে ক্ষেত, বাঁধ, ইটের পাঁজা চোখে পড়ে।

শহরের এই শেষ সীমানায় মাটির রাস্তা দিয়ে ইতিপূর্বে যারা আসা-যাওয়া করতো, আজও তারা যাওয়া আসা করে। গাঁয়ের চাষারা চাল নিয়ে আসে এই পথে শহরের বাজারে, আনাজ, দুধ, ডিম। মোকদ্দমা করতে আসে কেউ, কারুর দরকার রেভিনিউ ষ্টাম্প কেনার। এই রাস্তা ধরে হলধর হরকরা, ডাকের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হর্‌হর্‌ ক'রে চলে যায় গাঁয়ের দিকে। পিতম মুচি যায় সস্তায় গরুর চামড়া কিনতে চেনা গাঁয়ে।

চিরদিন তারা ভাবছিল এখানে আর যা-ই হোক, কেউ ঘর বাধতে আসবে না। কিন্তু বাবুরা এখানে অবধি শহরকে এগিয়ে নিয়ে এল। এখানে আছে পাদ্রী। সকলের আগে মিশন হাউস হয়েছিল এই অঞ্চলে।

হ্যাঁ, তারপর তৈরী হয় সরকারী কৃষিশালা। হাসপাতাল, লাসকাটা ঘর।

তারপর আসে পুলিশ সাহেবের বাংলো। তারপর আসে মহকুমা হাকিম। তার থেকে একটু দূরে ঘর বেধেছে নিরঞ্জন রায়। দালান উঠতে দেরি বলে লাসকাটা ঘর থেকে একশ গজ দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছ কালো ক'রে যেখানে বাদুর ঝুলে থাকে সেই অদ্ভুত থমথমে জায়গা রাতারাতি ভরাট হ'য়ে কেমন সুন্দর ঝকঝকে বাংলো তৈরী হল।

না, পিতম মুচির গা ছম্‌ছম করত রাত্রে লাসকাটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতে, গরুর ছাল মাথায় ক'রে যখন ও গাঁ থেকে ফিরত।

আর আজ সেই লাসকাটা ঘরের পাশে বাবুর বাংলোয় রাত বারোটার পরও জোর আলো জ্বলছে। বাবুদের সখ আলাদা। পর্দা-গুটানো জানলার কাঁচ বেয়ে চাঁদের আলোর মত আলো ঝরে পড়ছে অঝোরে।

গাঁ থেকে ফিরবার সময় হলধর হরকরার চোখে পড়ল। পিতম দেখল।

সিনেমার টিকিট বিক্রী করা শেষ ক'রে একদিন বাবুর বাংলোর আলো দেখবে ব'লে ফ্যালনা ও রাস্থ এসে দেখে যায়। দেখবার মত ছবি। ফ্যালনাকে ধরে নিয়ে আসে কীর্তিমান রাস্থ। তারপর চোখে পড়ে শহরের দুটি প্রবীণের, চেয়ারম্যান ও সাব-রেজিস্ট্রারের। মুরারী বাবুর ও মোহিনী বাবুর। খাওয়া দাওয়ার পর একদিন পান চিবোতে চিবোতে দুজন বেড়াতে আসেন একটা রিক্সা নিয়ে এদিকে।

দুই বন্ধু এই ভেবে গর্ব অনুভব করেন শহরটা কত দ্রুত বাড়ল। কত রাত অবধি এর আলো জলছে আজকাল। গির্জা অবধি এর সম্প্রসারণ।

এঁরা কারা। কার বাংলো ওটা?

বনগাঁর নিরঞ্জন রায়। তাঁর স্ত্রী।

ব্যাঙ্ক, ব্যবসা নিয়ে অনেক টাকা ভদ্রলোকের। হ্যাঁ এই শহরে নতুন এসেছে। ব্যবসা করবে, বসবাস করবে। ওটি কে? গাড়ি থেকে নামল স্বামী স্ত্রী দুজনকে দুদিকে রেখে? উকিল অটল বাবুর ছেলে।

তাই বলো। আমাদের নিশানাথ। এই শহরের একটি ছেলে ধনীর সুন্দরী স্ত্রীকে হাতে ধরে গাড়ি থেকে নামায়। সাবরেজিস্ট্রার ও চেয়ারম্যান বলাবলি করেন, নিশ্চয়। খাঁটি ব্রিটিশ আমলে এরা মানুষ,—আমাদের ছেলেমেয়েরা। সংসারের বাস্তব দিকটাকে উপেক্ষা করবার মত মন ও মেজাজ এদের থাকতেই পারে না। এই স্বাভাবিক। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত, বি এ ফেল্ করা ছেলে যদি এভাবেও অগ্রসর হয় তাতে অভিভাবক হিসাবে আমাদেরও উল্লসিত হবার কারণ আছে বৈকি।

'Efficiency যুগটাই হ'ল এগিয়ে যাবার।' মোহিনীবাবু বলেন, 'এই শহরের প্রসন্ন ন্যায়রত্নের একটি ভাল ছেলে, যাকে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

"সোনার চাঁদ" পচাত্তর টাকা মাইনে সন্দীপ না হাতিয়ার কোন চরে স্কুলের মাষ্টারি করছে। কি হ'ল তাতে,—ছেলেটির অত ভালত্ব শেষ পর্যন্ত কি কাজে লাগল।' সাবরেজিস্ট্রার হাসলেন।

এ ছেলে ওস্তাদ, করিতকর্মা। মিথ্যা বলেছি? চেয়ারম্যান মাথা নাড়েন। বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন, 'নীতি নীতি করে আমরা নিজেরা যেমন চাপা পড়ে গেছি, তেমনি চেপে রেখেছি সন্তানদের। আরে বাবা, হোক ছোট ছেলেটা বকাটে, ডানপিটে। শেষ অবধি ও কি হয়ে ওঠে তাই দিয়ে সব বিচার করবি—আজকের ছেলের কৃতিত্ব তো পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্যে নয়, কি ধূমপাননিবারণী সভার সভ্য হওয়ায়। ছেলে কি করছে ক'টা টাকা ঘরে আনলো শেষ অবধি তাই তো আমরা দেখি—আমরা সাধারণ মানুষ, যাদের খেটে খেতে হয়, দু'পয়সা আয় বাড়লে রাত্রে সুনিদ্রা হয়।' সাবরেজিস্ট্রার মাথা নাড়লেন। 'আর নীতিটা কোথায় আছে এদিনে, কোনখানে তুমি দেখছো?' চেয়ারম্যান চোখ টিপলেন। 'গান্ধী রামকৃষ্ণ দিয়ে তো তোমার আমার বিচার হবে না। পয়সা, অর্থ। Bare fact কেউ আমরা অস্বীকার করতে পারছি? অমুকবাবু দেশের একজন কেউ কেটা হয়ে গেছে, খোঁজ নিয়ে দেখলাম সারাজীবন ব্ল্যাক-মার্কেট চালিয়ে এসেছেন বেমালুম। দুর্নীতি? কই একথা তো কেউ বলছে না। বরং রোজ কাগজে তার প্রশস্তি বেরোচ্ছে, কেন না তিনি অমুক বন্যায়, অত হাজার টাকা দান করেছেন, অমুক জায়গায় ইস্কুল খুলেছেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়ে, তার ক্ষমতা ও কর্মের বিচার করি আমরা।' সাবরেজিস্ট্রার চুপ।

'ডলারের যুগ। টাকা কড়ি দিয়ে তোমার নামধাম, প্রতিপত্তি, যশ।' মোহিনীবাবু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন। 'টু-পাইস যার নেই তার কিছুই নেই।'

'টু-পাইস আছে বলেই তো আমাদের মোহিনী নন্দী মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছে।'

'টু-পাইস আছে বলেই তো টিমটিমে উকিল শশধর আজ মন্ত্রী হয়েছে।

টিপ্পনির পর মোহিনীবাবু হাসলেন।

'পয়সা এবং মেধা, দুইটি থাকা চাই—শুধু পয়সা তো এখানকার নিধু শীলেরও আছে।'

'একটাই আরেকটাকে টেনে আনছে ব্রাদার।' সাব-রেজিস্ট্রার মন্তব্য করলেন, 'নিধু শীলের পয়সা হয়েছে, তাই ওর মাথায় এসেছে স্বগ্রামে নিজের নামে মেয়েদের ইস্কুল করা। তুমি খবর রাখ না। কেন টাকাটা তো ও রিলিফ ফণ্ডে দিতে পারত।'

সাব-রেজিস্ট্রার হঠাৎ হাসলেন। 'প্রগতির নেশা থেকে শীল-নন্দনও অব্যাহতি পায়নি।

'এটা কি খারাপ?' চেয়ারম্যান উত্তেজিত হন। 'বলছি তো হেল্‌দি সাইন।' সাবরেজিস্ট্রার বললেন, 'বলে প্রগতি। ওর ছেলে যে মাইনিং শিখে এলো ধানবাদ থেকে। ওর মেয়ে নাচ শিখছে। ষ্টেটসম্যানে তো সেদিন ফটো বেরোলো। তুমি কি আজকাল ষ্টেটসম্যান রাখ না নন্দী।' হাজরা পাকা ভুরু বাঁকা করে সুপিরিয়রিটির ভাব নিয়ে হরিতকী গাছের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে আলো জলা বাংলোর ছবি দেখেন।

যেন এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য চেয়ারম্যান সাবরেজিস্ট্রারের কানে ফিসফিসিয়ে ওঠেন। 'কাপ্তান ছেলে জানে সে যুগের সেনাপতিরা রাজাদের তুষ্ট রাখবার জন্যে রাণীদের তোষামোদ করত বেশি।'

কফাশ্রিত গলা গম্ভীর ক'রে বুড়ো মুরারী হাজরা মন্তব্য করলেন, 'অটলের বৈঠকখানার ওপাশটায় নতুন ইট সিমেণ্ট দেখলাম।'

'ছেলে পাঠাচ্ছে। বাজারের ওদিকটায় ব্যাঙ্কের দালান উঠছে নতুন।' বলে চেয়ারম্যান হাসেন। অন্যায় অথচ ভাল এই রকম একটা জিজ্ঞাসা সাবরেজিস্ট্রারের ভুরুতে উকি দিতে দিতে আবার মিলিয়ে গেল।

'দেবীকে তোষামোদ করা হচ্ছে, কিন্তু দেবতা যে ভিতরে ভিতরে গোমরাচ্ছে না তাই বা কে জানে?'

ফেরার পথে সাবরেজিস্ট্রার মন্তব্য করেন।

'আমার মনে কি আর তা স্ট্রাইক করেনি। রিকসার গদীর ওপর স্থুল দেহ এলিয়ে দিয়ে মোহিনী হাসেন। 'টেবিলের একধারে কেমন মুখ ভার করে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানছে দেখলে তো।'

'খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হচ্ছে মনে হল।'

'কাপ্তান ছেলে পাখী শিকার করে এনেছে. শুনলাম।' চেয়ারম্যান প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করলেন।

'আমার মনে হয়।' গলাটাকে সম্ভব সূক্ষ্ম করলেন সাবরেজিষ্ট্রার, 'নিরঞ্জন রায় ড্রিঙ্ক করে,—তোমার কি মনে হয়? কেমন অ্যাসকোহ-লিক ফ্যাট আছে শরীরে, দেখে যেন তাই অনুমান হয়।'

'আরে রাম। বলে কি না ড্রিঙ্ক করে। ডুবে থাকে হে ডুবে থাকে।' চাপা গলায় নয়, উঁচু গলায় চেয়ারম্যান কথা বলেন। 'ইমামবক্সকে বাবুর বাংলোর মালী ঠিক করা হয়েছে, হ্যাঁ আমাদের ইমামবক্স, মাংস ফেরি করতো যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। বলল সেদিন, বাক্স ভরতি হুইস্কি আর বীয়ারের বোতল আছে রায়ের ঘরে। নিজের চোখে ও দেখেছে।'

সাবরেজিস্ট্রার চুপ ক'রে গেলেন।

'অঢেল পয়সা থাকলে—বুঝলে না?' যেন নিজের মনে মোহিনীবাবু পরে বিড়বিড় করেন। বস্তুত পয়সা এ শহরে অনেকেরই আছে। কিন্তু ড্রিঙ্ক করার প্রচলন বা এ নিয়ে আলোচনা আগে এ শহরে বিশেষ ছিল

না। সম্প্রতি কে এক নীহার বাগচি কন্‌ট্রাক্টারি করে হঠাৎ অনেক পয়সার মালিক হয়ে এই শহরে এসে দিনকতক বসবাস করেছিলেন। উদ্দেশ্য এখান থেকে,—এখানকার নদী ছেঁকে সব মাছ ধরে অন্য বড় বড় শহরে চালান দেওয়া এবং এই উদ্দেশ্যে এখানকার রেলওয়ে ও পুলিশ সার্কেল থেকে আরম্ভ করে ডাকসাইটে ব্যবসায়ীদের হাত করার জন্যে বাড়িতে তিনি প্রায়ই বড় রকমের নৈশভোজের আয়োজন করতেন। আর টেবিলের উপর জড় করতেন নানা সাইজের নানা রঙের বোতল। সেই থেকে বাবুরা তো নিশ্চয়ই, বাসার চাকরবাকর পর্যন্ত ফ্যালনা, রাস্থ, ইমামবক্স জেনে ফেলেছে, শিখে রেখেছে কোনটা বীয়ার, কোনটার নাম হুইস্কি, কোন্ বোতলে ব্রাণ্ডি থাকে। ফ্যাল্‌নাকে কুলি খাটিয়ে ফ্যাল্‌নার মনিবের দোকান থেকে রাস্থ দিনকতক নৈশভোজের কেক্ পাউরুটি যোগান দিয়েছিল আর ইমামবক্স সরবরাহ করত মুর্গি পাঁঠা।

'আগে নিশানাথের খুব আনাগোনা ছিল না তোমার বাড়িতে?' সাবরেজিস্ট্রার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

'আনাগোনা মানে?' চেয়ারম্যান সোজা হয়ে বসলেন। 'সারাদিন তো থাকত আমার ওখানে। লিলি মিলিদের সঙ্গে—' বলতে বলতে চেয়ারম্যান মাঝপথে থেমে যান।

হসপিট্যাল রোডের বাঁক ঘুরে বাদাম গাছের সার। ঠুন্‌ঠুন্ এগিয়ে চলে রিক্সা।

'বৈশাখ শেষ হতে চলল, শহরে কিন্তু এবার এখনো পটল আমদানী হল না, সাবরেজিস্ট্রার।'

'হুঁ' একটু চুপ থেকে সাবরেজিস্ট্রার বললেন, 'যা-ই বল, তোমার বড় মেয়ে লিলিকে আমার বেশ লাগে। ভারি bold। কথায় চলায় এমন একটা তেজ রেখে চলে যা শহরের আর দশটি মেয়ের—'

'হিস্।' মোহিনীবাবু হঠাৎ মুরারীবাবুর হাতে চাপ দেন। সাব-রেজিস্ট্রার থেমে যান। যেন স্যাবরেজিস্ট্রারকে থামাবার জন্যে মোহিনী এমন করেন। সাঁ করে একটা মোটরগাড়ি রিক্সার পাশ কেটে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

'পুলিশ সাহেব রাউণ্ডে বেরিয়েছে।' আস্তে আস্তে বললেন চেয়ারম্যান। যেন সাবরেজিস্ট্রারের হাতে চাপ দেবার এই কারণ। কোনো মন্তব্য না করে সাবরেজিস্ট্রার তাড়া দেন রিক্সাওয়াকে। 'একটু টেনে চল বাবা, অনেক রাত হয়ে গেল যে।'

'খুব bold।' গর্বের স্বরে চেয়ারম্যান হঠাৎ আবার আরম্ভ করেন, 'মহিলা-সমিতির পাণ্ডা হয়েছে মেয়ে, রাতদিন এখন অই নিয়ে আছে।'

'ভাল ভাল।' সাবরেজিস্ট্রার মেরুদাঁড়া টান করে বসেন। 'শহরে যে এমন একটা জিনিস গড়ে উঠছে সেটাই সব চেয়ে বড় আশার কথা। আমি ভয়ঙ্কর support করি এসব। তুমি ?'

মোহিনী নিঃশব্দে মাথা নাড়েন।

একটা থ্রিল। গভীর রাত্রে পায়ে হেঁটে শহরে বেড়ানো নেশার মত হয়ে গেছে ডাক্তারের। আধুনিক জীবন।

না, পাইন দেবদারুর জঙ্গলে এ সুযোগ ছিল না। সঙ্গে থাকতো গুলিভরা রিভলভার, কিন্তু সন্ধ্যার পর কোনোদিন ডাক্তার সাহস পেয়েছে বাইরে বেরোবার ? কি বিশ্রী উপদ্রব বাঘের !

এখানে পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের মত ডাক্তার মনের আনন্দে ঘুরছে পথে পথে।

এই মাত্র পৌছে দিয়ে এসেছে শিক্ষয়িত্রী দুজনকে তাঁদের কোয়ার্টারে। নির্বিকার।

ফুরফুরে রাতের হাওয়ায় বেড়াতে বেড়াতে এসেছে লাসকাটা ঘর অবধি। শহরের শেষ প্রান্তে।

দূরে কাঁচের জানালা অগুনের ফুল হয়ে জ্বলছে। ডাক্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল। এই সেই নিরঞ্জন রায়ের বাংলো।

অনেক রাত অবধি ওখানে খানাপিনা চলে।

গার্ডেনের কথা মনে পড়ল ডাক্তারের।

সেখানে এক কার্টারের বাংলো ছাড়া অধিক রাত্রে আলো জ্বেলে খানাপিনার রেওয়াজ ছিল না।

একটা থ্রিল। বাংলাদেশে বাঙালী সমাজে উত্তেজনা এসেছে, জীবন-জোয়ার। এই উত্তেজনা ভাল কি মন্দ তা দেখলে না ডাক্তার, দেখল এর স্পোর্টস।

বেশ অগ্রসর হচ্ছে শহর।

এখানেও স্বামী, স্ত্রী এবং স্বামীর নবীন কর্মচারী কি স্ত্রীর নবীন কোনো বন্ধুকে নিয়ে গভীর রাত করে এক টেবিলে বসে শিকার করা পাখীর রান্না-মাংস খাওয়ার সাহেবী কায়দাকানুন ঢুকেছে।

অর্থাৎ বাঙালী পরিচ্ছন্ন হয়েছে, সামাজিক মার্জিত।

এক ঘরকুনো অটলবাবু ছাড়া এ শহরে আর কেউ মুখ গুমরা করে বসে নাই।

যোগীন ডাক্তার দেহে-মনে জীবনের স্পন্দন অনুভব করল।

হ্যাঁ, মেলা-মেশা, জনপ্রিয়তা, পপুলারিটি। আধুনিকতার সবচেয়ে বড় গুণ।

ডাক্তার জনপ্রিয় হতে চায়।

দেহে-মনে সুস্থ থাকার এর চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক কোনো পন্থাও যে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি।

মানুষের সংসর্গই মানুষকে এগিয়ে দেয়। বিকাশের পথে, বিস্তৃতির দিকে। মানুষ মানুষকে বড় করে।

ডাক্তারের বেশ লাগল গৃহস্বামীর এই উদারতা। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার অর্থ নিরঞ্জনের বেতনভোগী কর্মচারী। কিন্তু নিরঞ্জন তো নিশানাথকে আর কর্মচারীর মতো দেখল না, বা রাখল না ওকে দূরে সরিয়ে, বা দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে।

সুযোগ-সুবিধা ও প্রশ্রয় পেয়েছে বলেই অটলবাবুর ছেলে দেখতে দেখতে এতটা কর্মঠ, যোগ্য ও কৃতী হতে পেরেছে সন্দেহ কি।

বাপের মত এই ছেলে যদি অসামাজিক, মুখচোরা, লাজুক হত তো এমনটি হত না।

বাংলোর জানালায় শেষবার চোখ বুলিয়ে ডাক্তার যখন ফের হসপিট্যাল রোডে উঠে এল ঢং করে একটা বাজে ট্রেজারির পেটা-ঘড়িতে।

একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ফূর্তি। Be master merry, while you may.

শিস দিতে দিতে, হেলে-দুলে বাড়ির দিকে হাঁটে ডাক্তার, ভাবতে ভাবতে।

কার্টার সাহেবের বাংলোয় আসতো ছোকরা হিগিন্স। পাহাড়ী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দূরের আর এক বাগান থেকে। তখনো কার্টার পত্নী জীবিত। সন্ধ্যার পর চলতো খানাপিনা। রোজ।

কার্টার বলত 'আমি সর্বদা জুডির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতাম, ডাক্তার, তাই ছোকরাকে ডাকতাম বাংলোয়। মানুষের সংসর্গ ছাড়া মানুষ সুখী হতে পারে না। এই জঙ্গলে আর এসোসিয়েশন কই, তাই বুঝলে না,—

কয়েকটা ঘণ্টা জুডির ফূর্তিতে কাটতো। যেন এই ক'ঘণ্টা ও বেশী বাঁচতো। হ্যাঁ, Cupid নাক ঢুকিয়েছিল, ঢোকাতে আরম্ভ করেছিল বৈকি, আমি বেশ দেখতে পেতাম। কিন্তু জান কি, ডাক্তার, Love মার খাচ্ছে Moneyর কাছে, অনেক দেখলাম, অনেক দেখেছি, বিশেষ করে আমাদের এই ইউরোপীয় সমাজে। জুডি সম্পর্কে আমি অতিমাত্রায় নিশ্চিন্ত ছিলাম, কেননা হিগিন্স আদ্ধেক টাকা রোজগার করত আমার রোজগারের অনুপাতে—সেই জন্যেই হাঁ—হাঁ'—কার্টার জোরে জোরে হাসতো। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলত জুডিকে মনে পড়ে।

এখানে অবশ্য সে রকম প্রশ্ন নয়। ওখানে ছিল বন্ধু, এখানে কর্মচারী।

তবু, মাংস ভক্ষণরত গৃহস্বামী, হাস্যচপল গৃহিণী এবং টেবিলে উপস্থিত সুঠাম উন্নত দেহ অভ্যাগত যুবককে দেখে সাহেবের কুঠির সেই নৈশ উৎসবের কথাই মনে পড়ল ডাক্তারের।

আর বুড়ো কার্টারের উক্তি। Love মার খাচ্ছে Money-র কাছে। আমাদের ইউরোপীয় সমাজের এই রীতি।

শুধু তোমাদের সমাজের জন্যে আজ একথা নয়, সবার, সর্বত্র এই সত্য। মনে মনে বলল ডাক্তার। মোহিনীবাবুর কথাটা মনে পড়েছে তার তখন। কাল সকালে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে কথা হচ্ছিল। 'আমি প্রশংসা করি, প্রশংসা করছি অটলবাবুর ছেলের। Ambition রাখে।'

'না লিলিকে ও তখন বিয়ে করেনি বলে আমার একটুও দুঃখ হয়নি।' ডাক্তারের কাঁধে হাত রেখে, স্বীয় কন্যা ও নিশানাথের মধ্যে এককালে হৃদ্যতা ছিল তা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে করতে মোহিনী বলছিলেন, 'আগে আমায় এস্টাব্লিশড্ হতে দিন, তারপর বিয়ে, তারপর

সব।—কোলকাতা যাবার আগের দিন যখন ও আমায় বলল, সত্যি, বলতে কি আমার চোখে জল এসেছিল আশায়, আনন্দে। ফুটো চালার নীচে বসে শুধু ডালভাত খেয়ে সংসার জমবে না, প্রেম শুকিয়ে যাবে, কাকাবাবু। সারারাত শুয়ে শুয়ে নিশীথের কথাগুলো মনে হয়েছিল, ডাক্তার, তাই লিলির কান্নাকে সেদিন আমি আর কান্নার মধ্যেই গণ্য করিনি।'

'আজকালকার ছেলে।' মন্তব্য করছিলেন সঙ্গী পোস্ট মাস্টার।

এবং মেয়ে। 'আমার মেয়েও শেষটায় শক্ত হল। পরদিন যেতে চেয়েছিল স্টেশনে নিশীথকে তুলে দিতে। একটু সর্দিজ্বর হওয়ার দরুণ আমি বারণ করি।'

'এখন, এখন তা হলে—' প্রস্তাবটা তুলেছিলেন সঙ্গী সারদাবাবু। নাজীর সারদা রাহা।

'এখন অন্য রকম সমস্যা।' রাহার মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনী হাসছিলেন। "প্রজাপতি কানমলা খাচ্ছে ওর কাজের কাছে। যত বলছি এইবার বিয়ে টিয়ে করে ফেল, মেয়ে তার উত্তরে বলে বিয়ে, বিয়ের কথা আপাতত আমি ভাবতেই পারছি না বাবা, সমিতি নিয়ে এখন এমন ব্যস্ত। এত কাজ—'

'তাই নাকি? ওর মহিলা সমিতি।' সপ্রশংসচোখে নাজীরবাবু পোস্টমাস্টার বাবু চেয়ারম্যানের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। 'আজকাল-কার মেয়ে।'

'তাই।' উর্ধ্বে দৃষ্টি রেখে মোহিনীবাবু মন্তব্য করছিলেন, 'আমিও বিশেষ জোর দিচ্ছি না। মেয়ে বড় হয়েছে, ওর Freedom হল এখন সবচেয়ে বড় কথা,—এ যুগে—'

পার্কে বেড়াতে বেড়াতে মোহিনীবাবুর মুখে শোনা সব উক্তি। •

এই শহরের একটি মেয়ে।

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল ডাক্তার চেরীর মার কথা ভেবে। আধখানা শহর ও আধখানা পাহাড়ের মন নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছটফট করছে নীহার। আমি সভা-সমিতিতেও নাম লেখাব, আবার উনিশে পা দিয়েছে মেয়ে বিয়ের চিন্তায় চোখে ঘুম আসবে না, সত্যি এ বড় অদ্ভুত, ডাক্তার মনে মনে হাসল।

লিলির চেয়ে চেরী কত ছোট।

এবং শহরে এত সব মেয়ে সভা-সমিতি নানা কাজকর্ম স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে আছে দেখে অটলবাবুর কাছে হুট করে আজ নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তুলতেও ডাক্তারের কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল।

অথচ নীহার জিজ্ঞেস করবে, রাত জেগে থাকবে, ডাক্তার আজ কোনো কথা নিয়ে এল কি।

'কে ?'

অটলবাবুর বৈঠকখানার দরজা পার হবার পর ডাক্তার টের পায় কে একজন পিছনে আসছে।

যোগীন ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ায়।

'কি বলছিস ?'

কালো কুচকুচে গায়ের রং, ইলেকট্রিক আলোতেও বোঝা গেল ছেলেটার রং বেজায় কালো। চোখ দুটো শেয়ালের মতন শুকনো, কদাকার। বিশ্রী নোংরা একফালি দাঁত বার করে হাসল।

'কি চাইছিস ?' শুধুই হাসি দেখে ডাক্তার ধমক দিল।

'চা খামু।' বলল ছেলেটা।

'তার মানে পয়সা।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে সুরু করল ডাক্তার। 'রাস্তাঘাটে আমি ভিক্ষে দিই না।'

একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল, তারপর উত্তর। 'আপনি খয়রাত করবেন বইল্যা এহানে আর আমি আপীস পামু কোথায়।'

ভিক্ষুক ছেলের হিউমার-বোধ। এ শহরের সাধারণ ভিক্ষুকটি পর্যন্ত চতুর হয়ে গেছে।

ডাক্তার হাসি সম্বরণ করতে পারল না। ফের ঘুরে দাঁড়াল। 'তোর নাম কি?'

'রাসু। রাসমোহন কর্মকার।'

'কাজকর্ম কিছু করিস? মজার কথা বলতে শিখেছিস যে।'

রাসু মুখ নামাল।

'ফুরণে কাজকাম করি।'

'কেন চাকুরিতে দোষ কি?' ডাক্তর একটু অবাক।

'আড়াই শ খাস্তা বিস্কুট ভাইজ্যা ফ্যাল্‌না কামায় ছ' আনা। আড়াইটা টিকিট বেইচ্যা আমার আহে সাড়ে বারো আনা, চাকরি করমু ক্যান্।'

'ভাল। কিসের টিকিট?'

'ছিনেমার।'

ডাক্তার শব্দ করে হাসল।

'চমৎকার ব্যবসা বেছে নিয়েছিস, ভিক্ষে কেন।'

'না, এই, এমনি।' রাসু কান চুলকায়। 'বাবুর যদি দয়া অয়, চার'ছ পয়স্যা, চা খামু।'

অর্থাৎ এটা উপরি রোজগার বুঝল ডাক্তার। একটা আনি পকেট থেকে তুলে ছেলেটার হাতে ফেলে দিল।

ডাক্তার হাঁটে।

ছেলেটা আবার পিছনে পিছনে আসে।

'ডাক্তারবাবু—'

'আবার কি চাস্?' ডাক্তার ধমক দেয়।

'আপনার মেহেদীর জঙ্গল।' রাসু নোংরা দাঁতে হাসে।

বাড়ির সামনে বেড়ার ধারে এসে ডাক্তার থমকে দাঁড়ায়।

'কি হ'ল মেহেদীর বেড়ার?' হ্যাঁ, একটু জঙ্গল হয়েছে বৈকি। হেসে ডাক্তার বলল, 'ছেটে দিবি মেহেদীর গাছগুলো? ফুরণে কাজ করিস তো।'

মেহেদীর বাড়তি মাথাগুলোর দিকে চোখ রেখে, রাসু, মিটি মিটি হাসে।

'সেই কথাই বাবুকে জিগাইছি। কাইল দেহি অতবড় শিয়াল ঢুকছে বেড়ার মদ্যে।'

আশ্চর্যের কিছুই নেই। ভাবল ডাক্তার।

হার্ট-অব-দি টাউন। হ'লে হবে কি। জঙ্গল থাকলে সাপ শিয়াল বাসা করবেই।

শেয়ালের মতন জলজলে চোখে রাসু মেহেদীর বেড়া দেখছে।

– 'পারমু, পারমু না ক্যান্। তিন রোজে বেবাক সাফ কইর‍্যা ফেলমু।'

'তাই করিস।' ঘাড় নেড়ে যোগীন ডাক্তার গেট্ পার হ'য়ে ভিতরে ঢোকে। খুশি হয়ে রাসু চলে যায়।

উৎসবান্তের অবসাদ।

বাইরে যেমন ঝিঁঝি পোকার ডাক, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে রাতকে আরো বেশি গভীর মনে হয়।

টেবিলের উপর বসানো সুন্দর ল্যাম্প। মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পপি নিজে কিনে ছিল। নিশানাথ সঙ্গে ছিল।

এঘরের টুকিটাকি সব আসবাব, যেমন সুন্দর একটা আখরোট কাঠের টেবিল, হাল্কা দু'খানা চেয়ার, দু'টো ফোল্ডিং খাট, ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল যাবতীয় পপির নিজের হাতে কেনা। কেবল তাই ?

পাহাড় থেকে নেমে ওরা কোলকাতা হয়ে এখানে এলো। আর আসবার প্রস্তুতিস্বরূপ, এই সহরে বাসা বাঁধবার সরঞ্জাম হিসেবে হেন বস্তু নেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সারা কোলকাতা ঘুরে পপি না কিনেছে। অফুরন্ত উৎসাহ এখানে আসবার।

এলো।

শেষ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়াও হ'ল। এক সঙ্গে ব'সে। রাত একটা অবধি।

এই নিয়ে তিনদিন।

পাখি শিকার ক'রে আনা, নিশানাথের যত না, পপির উৎসাহ শতগুণ বেশী।

অবিশ্যি পাকে-প্রকারে শেষ পর্যন্ত সমস্ত দোষটাই নিরঞ্জনের ঘাড়ে এসে পড়ে, আর সেজন্যে তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হয় খুব।

মানে শিকারের মাংসের বেশির ভাগটাই উদরসাৎ করতে হয় নিরঞ্জনকে চুপ থেকে।

আর ওরা টেবিলে ব'সে শুধু গল্প করে।

'লোভী তুমি।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ যখন পপি থেমে যায়, তখন ওর সুগোল, সুশ্রী বিশাল চোখ থেকে এই ঠাট্টাই ঝরে পড়ে, এই হাসি। নিরঞ্জনের পাতের ওপর, পপির নিজের হাতে কেনা পোরসেলিন ডিসের ওপর, মাংসের রসে অভিসিক্ত পাঁচটি রোমশ,

পুরু মোটা আঙুলের ওপর। আঙুলের ডায়মণ্ড-বসানো আংটিটি পর্যন্ত ঝোলে রসে স্নান ক'রে উঠেছে। পপি এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখে।

হ্যাঁ খুব বেশি লোভ বলেই তো নিরঞ্জন চর্বণ ও চোষণের কাজ বন্ধ রেখে একটিবারও কথা বলতে পারে না। মুখ তুলতে।

এর জন্যে দায়ী, সে নিজে পপি নয়।

দুই চোখে একটিবার ভোজনরত স্বামীকে দেখে পপি পুনরায় গল্পে মেতে ওঠে।

আহারান্তে দীর্ঘ ইজিচেয়ারে শরীর ঢেলে নিরঞ্জন সিগারেট ধরায়।

অধিক ভোজনের পর অবসাদ তো আসবেই।

সিগারেট টানতে টানতে নিরঞ্জন চুপ ক'রে ভাবে। আর ভুক্ত বস্তুর চাপে ক্ষণে ক্ষণে চোখ বোজে।

অদূরে টেবিলে আলো জ্বলছে।

খাওয়ার শেষে দু'জনে উঠে যায়, বাইরে, বারান্দায়।

গ্রীষ্মের রাত্রে নদীর জলো-হাওয়া কত স্বাস্থ্যপ্রদ আরামদায়ক; পপিকে বোঝাচ্ছিল নিশানাথ।

'জলো-হাওয়া মানুষকে মোটা ক'রে দেয়।' পপির গলা।

'আপনার বেলায় সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে'। নিশানাথ।

'বা-রে! এক মাস তো এলাম মোটে।' উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত পপি। 'দেখুন না আমি মোটা হই কি না।'

ক্যানভাসের পিঠে চুপচাপ মাথাটা এলিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন সিগারেটে টান দিল।

'আমার তো মনে হয় মোটা হওয়া না হওয়াটা মনের ওপর নির্ভর করে বেশি।' পপি।

'কি রকম ?' মৃদু গম্ভীর হাসি শোনা গেল যুবকের। 'আমি তো জানি খাদ্য ও জল-বায়ুটার প্রাধান্যই বেশি ঘটে শরীরের ওপর।'

'সে কতক্ষণের, ক'জনের জন্যে ?'

চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল ঘরের ভিতর।

'কেন ?'

'পৃথিবীতে এমন ক'জন আছে, এতটা সুখী, যে, মোটা হ'ব ইচ্ছা করেছে ব'লেই এক আবহাওয়া থেকে আর এক জায়গার হাওয়ায় এসে সেখানকার ভাল ভাল জিনিসগুলি খাওয়ামাত্র মোটা হয়ে গেছে ? এ-দিনে এমন সুখী ক'জন ?'

নিশানাথ চুপ ক'রে রইল।

'এক যার সব আছে সে অথবা সন্ন্যাসী।' পপি বলল। 'মনের চাপেই যে আমরা সব মানুষ মরে যাচ্ছি, মরে গেলাম।'

একটুক্ষণ দু'জন চুপ।

আবার পপির গলা: 'আমরা অতিরিক্ত সভ্য হ'তে হ'তে অতিরিক্তরকম দাস বনে গেছি মনের কাছে। আর মনের ধর্ম জীবনে অশান্তি ডেকে আনা সে তো জানেনই, অসন্তোষ।'

'কি রকম ?' নিশানাথ হাসে।

'অই রকম।' পরিচ্ছন্ন পপির গলা: 'একটা পাবেন তো আর একটা পাবেন না, সব পাবেন একটির অভাব থেকে যাবে। চিত্তের এক জায়গায় না আর এক জায়গা ছিদ্র ক'রে বেড়াবে। আপনাকে কোনো অবস্থাতেই 'শান্তি পেয়েছি' বলতে দেবে না'

'সত্যি, মানসিক অশান্তি বড়ো খারাপ।' যুবক মন্তব্য করল।

'থাক্ ওসব মনটন নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, তাতে মন

আরো বেশি খারাপ হয়। বলুন তো কাল বৃষ্টি হবে কিনা।' যেন পপি বারান্দার ওধারে গিয়ে হঠাৎ আকাশ দেখে।

আলনার পাশে নতুন কেনা ঝকঝকে কাবার্ডের ওপর চোখ রেখে নিরঞ্জন লম্বা টান দিল সিগারেটে।

দু'জন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। টের পেল নিরঞ্জন। নিরঞ্জন উঠে কাবার্ড থেকে বার ক'রে নিয়ে এল, হ্যাঁ ইমামবক্স বর্ণিত বোতল ডিকেণ্টার।

হ্যাঁ, এ-ব্যাপারেও নিশানাথ নিরঞ্জনের সাহায্যকারী, বন্ধু। বস্তুত, যে সব বিষয়ে সকল দিক থেকে সাহায্য করে সেই-তো বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু। একজন কর্মচারীও তোমার জীবনে বন্ধু হ'তে পারে, আশ্চর্য কি।

নিশ্চয়, নিরঞ্জন নিশানাথের কাছে কৃতজ্ঞ। নিশানাথ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সতেরোটা স্কচ হুইস্কি আর চব্বিশ বোতল ল্যাগার বীয়র জোগাড় করেছিল কি ক'রে নিরঞ্জন ভেবে পায় না।

তুখোড় ছেলে।

Smart বললে বিশেষণ সম্পূর্ণ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাহসীও। আর বেশ ধূর্ত।

বুদ্ধিমান তো বটেই। কর্মঠ।

তার ওপর বিশেষ গুণ, গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখে। বয়সে নবীন।

অতীতের কোনো হিরো, মধ্যযুগের এক নাইট এসেছে নিরঞ্জনের ঘরে, তার সংসারে। ঠোঁট থেকে ডিকেণ্টার আল্‌গা করে টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল নিরঞ্জন।

ওরা আবার সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেছে। নিরঞ্জন চুপচাপ ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

'আমি ভাবতেই পারি না লাশকাটা ঘরে এত ভয় কেন আপনার।' যুবকের হাসির শব্দ। 'কি ভয় ওখানটায় ?'

'বা-রে! ঐ ঘরে লাশ কাটা হয় ভাবলে কার না ভয় করে, বেশ বোঝাচ্ছেন যা হোক।' অনুযোগের সুর পপির।

'বেশ তো, এখন তো আর কাটা চেরা হচ্ছে না কারোর লাশ, এখন ঐ ঘর ঘরই।' গম্ভীর গলায় নিশানাথ বলল। 'আমায় বলুন, ও-ঘরে একলা শুয়ে রাত কাটিয়ে আসি।'

'যতদিন রক্ত গরম থাকে ততদিন মানুষ ভয় কম করে। আপনার রক্ত গরম কিনা তাই এই দুঃসাহস।'

'কি রকম ?' যুবক আবার হাসল।

'অই রকম।' চাপা গভীর দীর্ঘশ্বাস পপির। কিছুক্ষণ দু'জনই চুপ।

ক্যানভাসের ওপর নিরঞ্জন মাথাটা নামিয়ে আনল।

'আপনার কথায় মনে হয় যেন আপনি কত বুড়ো হয়ে গেছেন।' নিশানাথ বলছে একটু পরে।

'বললাম তো মন। অশান্তি। মানুষকে অসহায়, কাপুরুষ ক'রে দেয়, ভীরু দুর্বল। নিজের তারুণ্যে আস্থা হারাতে পারে মনের এ-অবস্থা হওয়াও বিচিত্র নয়। হ্যাঁ, এক এক সময়, সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয় আমি বুড়িয়ে গেছি।'

'আশ্চর্য আপনার একখানা মন।' যেন প্রসঙ্গ হাল্কা করবার জন্যে নিশানাথ সুন্দর করে হাসল। 'চলুন ঘরে, রাত হয়েছে, মিঃ রায় বুঝি ঘুমিয়ে পড়লেন।'

'সংসারে নিশ্চিন্ত যারা তাদের চট্ করে ঘুম আসে।' কথার শেষে বেশ শব্দ করে পপি এবার হাসল।

নিশানাথকে তার উত্তরে কিছু বলতে শুনল না নিরঞ্জন।

কাল খুব ভোরে নিশানাথকে বেরোতে হচ্ছে ব্যাঙ্কের কাজে। যেতে হবে দূরের একটা গাঁয়ে।

বেশ বড় রকমের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। কে এক মহিম নন্দী অনেক টাকা এনে জড়ো করছে নিরঞ্জন রায়ের ব্যাঙ্কে এবং স্থির হয়েছে, এত দূরের রাস্তা, রায়ের গাড়ি নিয়ে বেরোবে নিশানাথ। নিরঞ্জন নিজে এ প্রস্তাব দিয়েছে।

কিন্তু তা-ই তো যথেষ্ট নয়।

মনিবের কাজে কর্মচারীর সুখ-সুবিধা সম্পর্কে মনিব যতটা চিন্তা করেন মনিব-পত্নীর দৃষ্টি তার চেয়েও বেশি যায়। চিরদিনই গেছে।

পপি প্রস্তাব দিয়েছে রাতটা নিশানাথ বাংলোয় থেকে যাবে। এত রাত্রে ঘরে ফেরা আবার রাত থাকতে এখানে ছুটে আসা সে অনেক হাঙ্গামা। 'নিশ্চয়।' নিরঞ্জন খুশি হয়ে প্রস্তাব সমর্থন করেছে।

না, নিরঞ্জন খুশি। রাত একটায় পরও পপির চোখে ঘুমের জড়িমা নেই, বা এত রাত অবধি বাগানে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে ঠাণ্ডায় গলা ব'সে যাওয়ার লক্ষণ। বরং যত রাত হচ্ছে নিটোল, স্বচ্ছ, আলোর রেখার মতন, তীব্র ও পরিচ্ছন্ন শোনাচ্ছিল পপির এক এক ঝলক হাসি, প্রত্যেকটি কথা।

যেন আজ আর নিরঞ্জন মনে করতে পারছে না, বিয়ের পর থেকে সন্ধ্যাবাতির সঙ্গে সঙ্গে কতকাল পপির গলায় সেই সবুজ মাফলারটা জড়ানো ছিল।

একটু পর পপি এসে এ ঘরে ঢুকল ড্রয়িংরুমের চাবি নিতে।

নিরঞ্জন ঘুমিয়ে আছে কি ঘুমের ভাণ ক'রে আছে। পপি ডাকল না। পপিও যদি এভাবে ঘুমিয়ে পড়ত কি ঘুমের ভাণ ক'রে শুয়ে থাকত নিরঞ্জন ডাকত কি ?

এই হচ্ছে আজকাল।

এটা আরম্ভ হয়েছে শিলং-এ থাকতে। একজন যদি চুপ ক'রে থাকে আর একজন কথা বলে না।

চাবি নিয়ে পপি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

* * * *

'এরকম বেণী কবে থেকে শুরু করলেন?'

'কেন, এই বেণী আর কোনদিন চোখে পড়েনি আপনার?' পপি বেণীর ওপর বাঁ-হাতের পিঠ রাখল, তারপর প্রশ্নকর্তার দিকে নয়, তাকাল নেপালী চাকরটার দিকে।

চাকর নিশানাথের শয্যা তৈরী করছিল গৃহিনীর নির্দেশমত। ক্যাম্প-খাটের ওপর সুজনি ধব্‌ধবে ধোয়া শাদা চাদর, মনোরম ঢাকনি দেওয়া বালিশ।

'বাহাদুর টুমকো কাম হো গিয়া?'

'হুঁ মাঈজী!'

ইঁদুরের মত ছোট ছোট চোখ। নাকে-লেশহীন ডিমের মত পালিশ মুখ। এক রত্তি একটা ছেলে পাহাড় থেকে ধরে নিয়ে আসা।

'আভি টুম্ বাহার যাও।' অল্প হেসে পপি ঘাড় কাৎ করল। 'আভি টোমারা ছুটি।'

খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বাচ্চা বাহাদুর মাঈজী ও মেন্‌জারবাবুকে কুর্নিশ ক'রে তিড়িং করে লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই চাকরটাকেও গৃহস্থের আর অত্যাবশ্যাক জিনিসের মত নিশানাথ রায় পরিবারকে জুটিয়ে দিয়েছিল।

বস্তুত শিলং-এ শেষের দিকে মিঃ রায় যেন কেমন হয়ে গেছলেন।

সামান্য একটা কাজ, চাকরবাকর জোগাড় করা তো দূরের কথা,

একটা খাম টাইপ করতেও রায় নিশানাথকে ডাকতো। অথচ এই নিরঞ্জন রায়কেই নিশানাথ দেখেছে, ক'দিনের কথা আর, কদ্দিন সে এ-পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অসুরের মত রাত দিন খাটতে। মফঃস্বলে বেরিয়েও জরুরী সব চিঠি ড্রাফ্‌ট রাত দেড়টা ছু'টো পর্যন্ত নিজের হাতে টাইপ করতে।

দেখতে দেখতে সেই অসুর লোহার মত শক্ত, কঠিন কর্মবীর পুরুষ হঠাৎ এই একটা বছরেই এমন এলোমেলো ঢিলেঢালা ছত্রখান হয়ে পড়ল কি করে নিশানাথ ভাবছে।

এবং সর্বকাজে তার ডাক। ঘরে বাইরে। দিবা রাত্র। নিশানাথ ওটা বাকী রইল করে দিও, ওটা করছো তো।

হেসে নিশানাথ মাথা নাড়ছে।

কেননা, সে জানে মনিবকে যত বেশী তুষ্ট রাখা যায় এদিনে তত বেশি উন্নতি।

এবং প্রভুর কাজের চেয়েও প্রভুপত্নীর আব্দার বেশি।

নিশীথ বাবু এটা করবেন ওটা করবেন।

হেসে নিশানাথ মাথা নাড়ছে।

এবং এখনও, ঘর থেকে চাকর বেরিয়ে যেতে, ঈষৎ হেসে প্রভুপত্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশীথই আগে প্রশ্ন করল। 'হ্যাঁ কি যেন বলছিলেন বেণীর কথা?'

'বলছিলাম এরকম বেণী করতে আমায় আর দেখেন নি?'

একটু চুপ থেকে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে নিশীথ বলল, 'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কি করে আর পড়বে মনে, রাতদিন তো হিজ মাষ্টারের পিছন পিছন আছেন।'

'এই অভিযোগ আপনার মিথ্যা মিসেস রায়।' নিশানাথ বলল, 'আপনার সঙ্গেও আমাকে কম ক্ষণ কাটাতে হয় না, মানে অবসর সময়টা কাজ সেরেও যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকি।'

'তবেই বুঝুন কাজ করতেই শুধু এবাড়ি আসেন কি থাকেন, কেবলই কাজ, কথাটা যে রোজ বলছি মিথ্যা কি।'

'খানিকটা সত্য।' হাসতে গিয়ে নিশীথ কিছুক্ষণ পপির চোখে চোখ রাখল।

'এ ধরণের বেণীতে আপনাকে সত্যি ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'

'কেমন অদ্ভুত, কি আবার অদ্ভুত হল।' পপি হালকা হেসে উঠল। 'মেয়েদের বেণীর দিকে তাকাবার সময় হয় কি আপনার?'

'ইচ্ছা করে সময় সময় তাকাবার, কাজের চাপে—'

'কাজ আর কাজ, টাকা আর কড়ি।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পপি দেওয়ালের উপর চোখ রাখল। 'সব পুরুষই আজ একরকম। কাজের চরকায় তেল দিতে দিতে শেষটায় কি লাভ হয় জানেন?'

'কি হয় শুনি?' হাসতে গিয়ে গলার মৃদু শব্দ করল নিশানাথ।

'কি আর হবে, চোখের ওপর তো দেখতে পাচ্ছেন।' দেওয়াল থেকে চোখ না সরিয়ে যেন নিজের মনে বলল পপি, 'সেই চোখ সেই দেখার দৃষ্টি আপনা থেকে মরে যায়, তারপর চেষ্টা করেও চুলের বেণী চোখের কাজলের মধ্যে দৃষ্টি রেখে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পুরুষটি আত্মসমাহিত হতে পারে না। রূপচর্চা করবার আগে সে মনে মনে স্বাস্থ্যচর্চা করে, নয়তো রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে তাড়াতাড়ি ক্যাটালগ্ খুলে বসে। মেয়েদের কম্প্লেক্শনের জন্যে, চুলের জন্যে আর কোনো ভাল স্নো পাউডার ক্রিম শ্যাম্পু বেরোলো কিনা বাজারে, বা শরীরে রক্তের লালিমা ফুটিয়ে তুলতে আরো আধুনিক বা অভিনব কোনো ওষুধ—কথাটা

মিথ্যে বলছি ?' তেরছা চোখে পপি নিশানাথকে দেখল, 'কথা বলছেন না যে ?'

'মানে অর্কিডের দিকে তাকাতে গিয়ে গাছের প্রয়োজনীয় সারের কথা চিন্তা করা।' সোনার তার পেঁচানো দাঁতের ঝিলিক তুলে নিশানাথ ঠিক হাসল না, হাসির একটু আভাস এনে বলল, 'গাছের শুড়িতে কতটা জল মাটির দরকার ফুল দেখতে দেখতে তাই শুধু চিন্তা করা, কেমন ?'

একটুক্ষণ কথা বলল না পপি।

'টায়ার্ড, সত্যি আমি টায়ার্ড।' কেমন অস্থির হয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণা চেপে ধরে পপি ভুরু কুচকোলো। তারপরই অবশ্য দেখতে দেখতে ফের ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। ভুরু টান করে হেসে অল্প একটু শিস দিতে নিতে ডান হাঁটুটা ঈষৎ আন্দোলিত করে বলল, 'বলতে কি ও আমার স্বাস্থ্য ও শরীর নিয়ে যত কম আলোচনা করে যত কম তাকায় আমার দিকে আমি যেন তত বেশি ভাল বোধ করি আজকাল।'

নিশানাথ কতক্ষণ চুপ থেকে পরে হাত-ঘড়ি দেখল। 'ডুটো বাজে, আপনি শুতে যান মিসেস রায়, বিছানা করা হয়ে গেছে, জল রাখা হয়েছে টেবিলে। টর্চটাও শয্যার পাশে সুন্দর করে শুইয়ে রেখে গেছে আমার দিল্-বাহাদুর। আর কিছু দরকার পড়বে না।'

'কিছুরই না ?' অপাঙ্গে যুবকের চোখে চোখে তাকাল পপি।

'আপাতত দেখছি না।' নিশানাথ কি ভেবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে হাসল, আর দাঁতে দাঁত চাপল।

'ভাল।' দীর্ঘশ্বাসের ঢেউ তুলে ক্ষুদ্রকায়া মনিবপত্নী চৌকাঠ পার হয়ে টুপ করে অন্ধকার বারান্দায় নেমে যায়।

নিশানাথ চৌকাঠ পর্যন্ত পা বাড়িয়েও পরে পা সরিয়ে নিলে। ঘুরে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়াল। তারপর জানালার পাশে গিয়ে চুপ করে

বাইরের দিকে চেয়ে রইল। বিরাট ইমারৎ তৈরী হচ্ছে নিরঞ্জন রায়ের। কংক্রীটের গাঁথুনি আর ষ্টীল ফ্রেমে কণ্টকিত আকাশের ওপারে তামাটে রঙের পুরানো এক ফালি চাঁদ ঝুলছে। হঠাৎ কি একটা ঠাট্টার সুড়্‌সুড়ির মত সমস্ত মগজে ও মনে একটা সুড়্‌সুড়ি অনুভব করে নিশানাথ অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে হাসল।

পুরানো চাঁদ, পুরানো আকাশ। এই শহরে নিশানাথ বড় হয়েছে। পাঁচ বছর পর হঠাৎ ফিরে এসে কেমন নতুন ঠেকছে এখানকার সব-কিছু চোখে। এই শহরের বাড়ী-ঘর, রাস্তা মানুষ সব, সবাই।

ভয়ঙ্কর প্র্যাকটিক্যাল লোক মোহিনী নন্দী। তিনবার ফেল করার পর চতুর্থবার মোক্তারি পরীক্ষা দিয়ে তিনি পাশ করেন। কিন্তু প্র্যাকটিস্ জমাতে তাঁর তিন বছর লাগেনি। পঞ্চাশোর্ধ্বে এসেছেন।

এখনো নিটোল গোলগাল ক্লিনশেভ্‌ড সমর্থ চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক চতুর, রুচিবান ও বিলাসী।

মোক্তার হয়েও তিনি পুরোনো অঞ্চল মানে বকুলবাগানের সব কটি বাসিন্দার চেয়ে স্বচ্ছল তো বটেই, সপ্রতিভ, চতুর এবং ফন্দিবাজ।

শহরে নতুন অফিসার কেউ এলে তিনিই সকলের আগে ছুটে যান বাড়িতে দেখা করতে, বন্ধুত্ব জমাতে। সব সময় উঁচুর দিকে দৃষ্টি।

বড় হওয়ার এই স্পৃহাই মোহিনীকে বড় করে দিয়েছে, সমসাময়িক বন্ধুরা মন্তব্য করেন কোনো কোনো সময়।

বস্তুত মাত্র কয়েক বছরেই মোহিনী নন্দীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ কানাকানি করে, বাইরে যতটা দেখা যায় ভিতরে ততটা নয়; ঠাট্‌টাই বেশি, সে তুলনায় পয়সা জমেনি।

না জমুক, মোহিনীবাবুর বাড়ির মত এমন সাজানোগুছানো ঝক্‌ঝকে

বাড়ি এ অঞ্চলে আর কার আছে। এমন সুন্দর বাগান, বাড়ির সামনে অত বড় লন্।

যখনই তিনি বাড়ি থেকে বেড়োন দেখা যায় বেশ ধোবদুরস্ত তাঁর জামাকাপড়।

হ্যাঁ, ফ্যাশানের ব্লাউজ গায়ে দিতে ও শাড়ি পরতে সকলের আগে তাঁর বাড়ির মেয়েদেরই দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি ফিটুফাট থাকে মোহিনীবাবুর মেয়েরা।

চেয়ারম্যান বিপত্নীক। চারিটি মেয়ে। লিলি, মিলি, ইরা, মীরা। প্রায় কাঁধ মেলানো বয়েস বোনেদের। সবাই ফর্সা।

লিলির বিয়ে হয়নি কাজেই বাকি তিনটিও অনূঢ়া।

রোববারের সকাল। দশটা বাজে। ইরা ও মীরা এই মাত্র গানের ক্লাস শেষ করে ঘরে ফিরেছে। এই শহরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মেয়েদের গান শেখার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পরও নতুন শেখা গানের একটা দুটো কলি থেকে থেকে ইরা মীরার গলায় বিচিত্র গমকে বিবিধ ঢংয়ে খেলে বেড়াচ্ছিল। চেয়ারম্যান বৈঠকখানায় বসে স্থানীয় দু'চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সারা সকাল লোক্যাল পলিটিক্স আলোচনা করেছেন। এইমাত্র ভদ্রলোকেরা উঠে বেরিয়ে গেলেন। মোহিনীবাবু ভিতরে যাবার জন্যে উঠি উঠি করছেন। বাড়ির ভিতরে দ্বিতীয় মেয়ে মিলি চা তৈরী করে রাখছে বাবার জন্যে। মোহিনীবাবু এসময়ে আর একবার চা খান। বস্তুত ঘরের কাজকর্ম বেশিরভাগ মিলিকেই দেখাশোনা করতে হয়। ইরা মীরা পড়াশোনা ও গানবাজনার চর্চা করে, সংসারের কাজে হাত ঠেকাবার বড় একটা সময় পায় না। বড় মেয়ে লিলি সংসারের কাজকর্ম দেখা দূরে থাক, ভাত খেতেও ওর সময় নেই। সারাদিনই থাকতে হচ্ছে বাইরে। ঘোরাঘুরি করছে সমিতির

কাজে। চাঁদা তোলা, সমিতি অর্গানাইজ করা, আসছে জেনারেল মিটিংএর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন, একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ইত্যাদি নানা ব্যাপার। ছুটোছুটি করতে হচ্ছে ওকে হরদম।

এর জন্যে মোহিনীবাবু ভিতরে ভিতরে বেশ গর্বিত। ইরা মীরাও দিদিকে এর জন্যে শ্রদ্ধা করে, দিদির ব্যক্তিত্ব, আশ্চর্য সংগঠনী-শক্তি ও পরিশ্রম করার ক্ষমতার কথা চিন্তা করে তারা এক এক সময় মুগ্ধ হয়।

লিলি সম্পর্কে মিলির মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা, ভাই দেবুর মত সেও স্বভাব-গম্ভীরা। চাপা। দিদির কাজের নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই ওর চোখে-মুখে লেখা থাকে না।

আর সব দিক থেকে নির্বিকার দেবব্রত। কলেজ এবং কলেজ সমপনান্তে সাহিত্য ছাড়া ওর চেহারার আর কিছু থাকতে পারে পরম শত্রুও ওকে এ অভিযোগ দেবে না।

মোহিনীবাবু উঠি উঠি করেও চেয়ারে বসে রইলেন। লিলি বাড়িতে ঢুকছে।

মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তিনি এখনো এখানে বসে আছেন। মেয়েকে মোহিনীবাবু একটু নিভৃতে চান।

লিলি আজ বেশি রকম শ্রান্ত।

রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে গাল টুকটুকে লাল হয়েছে। খোঁপার সামনের দুটো চুল এলোমেলো দেখাচ্ছে। মেয়ের দিকে চোখ পড়তে মোহিনীবাবু চোখ ফেরাতে পারলেন না।

চার মেয়ের মধ্যে লিলিই তাঁর চোখে সুন্দর। রূপের দিক থেকে লিলিকেই তিনি সকলের ওপরে স্থান দেন।

বস্তুত লিলি জীবনে একটা ঘোরতর অপরাধ করেছিল, মোহিনীবাবু ভুলতেন না যদি না ওর চোখ জোড়া মোহিনীবাবুকে এত বিমুগ্ধ করত।

মোহিনীবাবুর সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যায় মেয়ের চোখের দিকে তাকালে। তাই তিনি সেই পাপকে পাপ বলে আর মনে স্থান দেন না এখন। একটা ভুল হয়েছিল শুধু।

মানুষ ভুল করে।

ফুলের বুকে কীট্ বাসা বাঁধে। কীটকেই তুমি ধ্বংস করতে পার। ফুল নয়। চিন্তা করেন মোহিনীবাবু কথাটা।

অত্যন্ত বিচলিত হতে গিয়েও পরে তিনি সামলে উঠেছিলেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে লিলিও যথেষ্ট শক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিল!

সন্ধ্যাবেলা অটলবাবুর বৈঠকখানা থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসে লিলির কথা শুনে মোহিনীবাবু ভারি চমকে উঠেছিলেন।

ও-পক্ষে ছেলে যেমন বাপকে বোঝাচ্ছিল এখানেও লিলি বাবাকে বোঝাল।

মোহিনীবাবু আর শব্দ করলেন না।

'মিহিজামে মাসিমা আছেন। দিনকতক ওখানে থেকে এলেই হবে। তুমি চিঠি লিখে দাও।' বেশ জোর দিয়া কথাটা লিলি উত্থাপন করেছিল।

মোহিনীবাবু বিস্মিত হয়েছিলেন। মেয়ের মনের পরিচয় মোহিনীবাবু এর আগে পাননি। হ্যাঁ এটাই তো সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব।

তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মিসেস দত্ত মানে আপন শালী বিজনপ্রভাকে।

যুদ্ধফেরৎ ডাক্তার রণদা দত্ত। বাড়ির ধরণধারণ চালচলতি আলাদা। প্রথমে স্বাস্থ্য তারপর সব।

মাসিমা কানে কানে বলে দিয়েছিলেন খুকীকে (লিলির স্বর্গতা মার মত বিজনপ্রভাও লিলিকে খুকী বলে ডাকেন, এখনও।) যত বেশি

বাইরে বাইরে ঘোরাফেরা করবি আর রোদ হাওয়া লাগাবি শরীরের চামড়া তত বেশি সুন্দর হবে।

কতদিন বোন্‌ঝিকে সংগোপনে ডেকে আদর করে বিজনপ্রভা বিচিত্র ন্যুড্ সব ছবি দেখিয়েছিল। নীল সফেন উদ্বেলিত সমুদ্র পায়ের নীচে রেখে উত্তপ্ত বালু-বেলায় উলঙ্গ আকাশের তলায় বিবসনা সুন্দরীদের আকণ্ঠ রৌদ্র পানের দৃশ্য।

'শরীর, শরীরের জন্য ওরা না করে কি! হ্যাঁ, এটি ইটালিয়ান, ওটি কানাডার মেয়ে, এটি হাঙ্গেরিয়ান,—দেখ, কি অদ্ভুত উরু, আশ্চর্য নিটোল স্তন, সুঠাম বাহু।' ছবির ওপর আঙুল রেখে মাসিমা লিলিকে বুঝিয়েছিল, 'ওরা ত্রিশ বছর বয়সেও আঠারো বছরের মেয়ের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, ক্ষমতা, উচ্ছলতা, আবেগ শরীর ভরে, মন ভরে ধরে রাখে বেঁধে রাখে, আমরা ভাবতে পারি না—'

কথার শেষে বিজনপ্রভা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলেছিল এবং বলতে কি ছবিতে রৌদ্ররাঙা বালুর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া মেলে ধরা সুন্দর শরীর দেখে লিলি যে পরিমাণ অবাক ও আশ্চর্য হয়েছিল, চোখের সামনে ত্রিশ অতিক্রান্তা মাসিমাকে দেখেও সে কম মুগ্ধ বিস্মিত হয় নি!

নিটোল আঁটসাট গড়ন।

গোলাপের মত গায়ের রঙ, আপেলের মত মসৃণ গাল।

একটা কাঁচা টমেটো চুষতে চুষতে, লিলির মনে আছে, প্রথমদিনই বেড়াতে বেড়াতে বিজনপ্রভা বলছিল, 'বোল্ড হতে হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা একটু একটু বোল্ড হচ্ছে এটা আশার কথা সন্দেহ নেই। তুই

যে ভেঙে না পড়ে এখানে ছুটে এলি সেজন্যে আমি তোকে ব্র্যাভো দিচ্ছি।' বিজনপ্রভা হাসছিল কুন্দশুভ্র দাঁত বার ক'রে।

মিহিজামে মাসিমা যতগুলি কথা, কথা নয় উপদেশ দিয়েছিল, লিলি সব মনে রেখেছে, মেনে চলছে এখনও।

রাত্রে শোবার আগে ঠাণ্ডা জলে নেবুর রস খাওয়া, সকালে খোলা হাওয়ায় বেড়ানোর অভ্যাস তার চিরকালের হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত সজ্জা স্বল্প গহনা।

'স্মার্ট খুব স্মার্ট হতে হয় এদিনে।' বলত মাসিমা কতদিন। 'একটা ছেলের চেয়ে আমি কম কিসে, মনের এই জোর রাখবি, এতটা দৌড়।'

আশ্চর্য, এখানে যেটা পর্বতপ্রমাণ ভয় ছিল, লিলি এক এক সময় ভাবে, হাসে মনে মনে, যেটা হয়ে উঠেছিল সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নের মত, সেখানে গিয়ে সামান্য জ্বরের অসুখের মত যেন হয়ে গেল সবটা ব্যাপার।

এমন চোখে দেখেছিল মাসিমা মেসোমশায়।

আর লিলির কেন জানি মাঝে মাঝে মনে পড়ে, মিহিজামে হাওয়া-বদল করতে আসা মেসোমশায়ের বন্ধু ধূসর নীল চক্ষু লম্বা সেই আমেরিকান ডাক্তার ডিককে। কী চওড়া হাত, অসম্ভব শক্ত পুরা লম্বা আঙুল ছিল সাহেবের।

বোম্বাই-আঁখের গিঁঠের মতন আঙুলের এক একটা গিঁঠ যত শক্ত হোক, অদ্ভুত কোমল ছিল ডিকের হাতের এবং আঙুলের রঙ। সকাল-বেলার রোদে একটু লাল হয়ে আসা স্থলপদ্মের পাপড়ির মতন মসৃণ চামড়ায় মোড়া ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন হাত। মাঝের দুটো আঙুলে গাঢ় তামাটে রঙের প্রলেপ, লিলি প্রথম বুঝতে পারে নি, পরে মাসিমা বুঝিয়ে বলেছিল, অবিশ্রাম সিগারেট টেনে আঙুলের এই দশা হয়েছে।

ও হ্যাঁ ডিককে লিলির আরো বেশি মনে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ সকালবেলা মেসোমশায়ের বারান্দার চা খেতে বসে লিলিকে দেখেই মিহি হেসে প্রথম দিন ও বলে উঠেছিল, "You naughty girl" মধুর মৃদু ভৎর্সনা। অর্থাৎ একটু আগে মেসোমশায় লিলির বিষয় বন্ধুকে বলছিল, লিলি তা টের পেল। লিলিকে দেখা শেষ করে ডিক মেসোমশায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে কোন্ এক ড্রুসিলা সম্পর্কে কি বলছিল।

তড়বড়ে ইংরেজি কথাগুলো লিলি তখন ভাল বুঝতে পারে নি। পরে রাত্রে খাবার টেবিলে বসে মেসোমশায় বুঝিয়ে দেয় সাহেবের এক বোন আছে দেশে। ড্রুসিলা। ডিক যুদ্ধে যোগ দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে বোনটি এমন কাণ্ড বাধিয়েছিল এবং বোনের কেস নিজের হাতে সেরে তবে ডিক যুদ্ধে আসে। লিলির বয়সের মেয়ে ড্রুসিলা।

লিলির অপারেশনের সময় বলতে কি ডিক উপস্থিত ছিল বলে লিলির আগে তবু যে ভয়টুকু ছিল পরে তা-ও আর থাকে নি। এমন তো সাহেবের বোনেরও হয়েছিল, যেন ভাবত সে।

মিহিজামের অদ্ভুত দিনগুলো লিলি ভুলবে না।

বিশেষ করে মাসিমা ও মেসোমশায়ের যত্ন ও আদর। এখনও মাঝে মাঝে মোহিনীবাবু বলেন, 'রণধীরের সঙ্গে অনেক দেশ ঘুরে অনেক জায়গা দেখেশুনে বিজনপ্রভার মনের প্রসারতা বেড়ে গেছে। আউটলুক এমন সুন্দর বদলেছে। এগুলো হয় জায়গার গুণে, বৃহত্তর সমাজে মেলা-মেশা করার ফলে—' চার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনীবাবুর পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন। বলেন, 'না হলে ওই বিজন, তোমাদের মায়েরই তো বোন কুসুমপুরের মেয়ে,—বুঝলে না?'

লিলি চুপ করে মাথা নাড়ে। ইরা মীরা মুচকি হেসে দিদির দিকে

তাকায় এবং মিহিজামের গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলি আর দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

স্ত্রী বেঁচে থাকলে কি অবস্থা হত, একটুক্ষণের জন্যে সে কথা মনে নাড়াচাড়া করলেও মোহিনীবাবু তা আর অবশ্য ভাবেন না। বরং কৃতজ্ঞতায় তার মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে শালিকা বিজনের উপর।

বলতে কি, মিহিজাম থেকে লিলির ফিরে আসার পর সমস্ত শুনে মোহিনীবাবু মেয়ের ওপর খুশি হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষ করে আরো এই জন্যে। যেন এটা তাঁর প্রবাসী আত্মীয় রণধীর দত্ত, শালী বিজনপ্রভা ও উদারহৃদয় হাস্যোচ্ছল বিদেশী বন্ধু ডিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা তো বটেই, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশেরই একটা রূপ।

মাসিমার উপদেশ লিলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিল সভা-সমিতি সামাজিকতায় নিজেকে বিক্ষিপ্ত ব্যাপৃত রেখে। মনের প্রসারতা তো বটেই, শারীরিক সুষমার সঙ্গে চিত্তের দার্ঢ্য, কোমল লীলার ওপর কঠিন দীপ্তির প্রলেপ, এই নিয়ে আধুনিক মেয়ে। এক কথায় তোমায় হীরের মত শক্ত হ'তে হবে। হীরের মত উজ্জ্বল অপরূপ।

ইদানীং কথাগুলো আরো সুন্দরভাবে দানা বেঁধেছে লিলির মনে। আর পরিচ্ছন্ন হয়েছে বুদ্ধি, মার্জিত হয়েছে রূপ।

মোহিনীবাবু মেয়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামালেন। হলদে সুরম্য গোল্ড-ফ্লেকের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে মুখে গুঁজলেন।

'কদ্দুর গেছলে?' সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন।

'পুলিশ সাহেবের কুঠি।' লিলি হাতের ব্যাগ বাবার টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। 'মিসেস রাজী হয়েছেন।'

'হবেন-ই তো, আমি বলিনি তোমায়?' মোহিনীবাবু অর্ধমুদ্রিত

চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'এতবড় একটা কাজ করতে যাচ্ছ তোমরা, প্রত্যেক অফিসার-পত্নীর কো-অপারেশন পাবে। আর? আর কার কাছে গেছলে?'

মোহিনীবাবু মেয়ের চোখে চোখে তাকালেন।

লিলি চোখ নামাল।

মোহিনীবাবুর মুখের হাসি আস্তে আস্তে নিভে এল। দুই ভুরুর মাঝখানে সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। গম্ভীর হয়ে যায় চেহারা।

'আমার তো মনে হয়, উচিত তোমাদের, আসছে অ্যানিভার্সারীতে মিসেস রায়কেই প্রেসিডেন্ট করা?'

'মোটা চাঁদা পাওয়া যাবে?' লিলি বাবার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসল।

'নিশ্চয়।' চেয়ারম্যান উত্তেজনায় চোখ বড় করলেন। 'সমিতি সমিতি করছ তোমরা, সর্বদা মনে রেখো পেছনে অর্থের জোর না থাকলে ওসব বাঁচানো যায় না, কোনদিনই কেউ পারেনি।' হাসলেন মোহিনীবাবু। 'টাকা, টাকা, বুঝেছ মা, সংসারটাই টাকার চারধারে চড়্‌কির মত ঘুরছে। বুদ্ধি করে সকলের আগে এ্যাদ্দিনে তোমাদের পপি-লজেই তো যাওয়া উচিত ছিল।' একটু থেমে মোহিনীবাবু বললেন, 'আমি ভয়ানক প্র্যাকটিক্যাল লোক, মা। খুঁটির জোর, পায়াভারি না থাকলে সমিতি বলো এসোসিয়েশন বলো কিছুই এক রাতের বেশি টিকবে না। দেদার টাকার মালিক ওরা। হ্যাঁ, রায়-গিন্নীকে টেনে নাও, সমিতি রাতারাতি ফেঁপে উঠবে।'

মাথা নেড়ে হৃষ্ট-মনে লিলি ভিতরে চলে যাচ্ছিল, মোহিনীবাবু আবার ডাকলেন, 'শোন।'

মেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?' নিভৃত গলায় চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন।

মেঝের ওপর চোখ রেখে লিলি মাথা নাড়ল।

'অবশ্য, আমার যা আইডিয়া, এদিনে সেন্টিমেণ্ট জিনিসটাকে যত কম আমল দেওয়া যায় তত ভাল। কেন, এক আধদিন দেখা করলে দোষ ছিল কি?'

লিলি চুপ।

'যা হবার হয়েছে, ওসব আমরাও মনে রাখিনি ও-ও হয়ত ভুলে গেছে।' দেয়ালের দিকে চোখ রেখে চেয়ারম্যান যেন নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন। 'শুনছি নিশীথ নিজের জন্য গাড়ি কিনবে। প্রমিজিং ছেলে, আমার তো বেশ পছন্দ হয়।'

অনেক দিন পর লিলির দুই কান আবার লাল হয়ে গেছে।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনীবাবু মৃদু মৃদু হাসেন।

'বাবা তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

'আঃ, আমাদের কি একটু কথা বলতে দিবিনে?' রুষ্ট হয়ে লিলি মিলির দিকে তাকাল। মিলি দাঁড়িয়েছিল ভিতরের দিকের দরজায়। ক্ষীণ ঘেঁসে। লিলি যখন বাবার সঙ্গে কথা বলে তখন ভাই বা বোনদের কেউ এঘরে ঢুকলে লিলি বিরক্ত হয়, বিশেষ করে আজকাল। কতরকম কাজের কথা থাকে ওর বাবার সঙ্গে। 'যাচ্ছি, তুমি যাও। মোহিনীবাবু দরজার দিকে মুখ ফেরালেন। মিলি সরে যেতে চেয়ারম্যান বড় মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলে নিচু গলায় বললেন, 'তা ছাড়া, যত আধুনিকাই হও তোমরা, বিয়ে জিনিসটা তো আর অ্যাভয়েড করতে পারছ না? ইউরোপ বা আমেরিকার মেয়েরাও এক বয়সে বিয়ে থা করে সংসারী হয়। ওটা যে দরকার।' কথার শেষে চেয়ারম্যান টেনে টেনে হাসেন।

'এখন আমি কিছু উত্তর দিতে পারব না বাবা। রোদে ঘুরে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।'

'না না।' মোহিনীবাবু ত্রস্ত হয়ে হাত নাড়েন। 'তুমি চিন্তা কর। তোমার ইচ্ছার ওপরই আমি সব ছেড়ে দিয়েছি।'

বকুলবাগানের দক্ষিণে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা ঘেঁষে এক চিল্‌তে সবুজ জমি। মাঝখান দিয়ে লাল সুরকি-ঢালা ঝাউ ছায়ায় মোড়া সরু আঁকাবাকা পথ।

যেন শহরের সবচেয়ে মার্জিত অঞ্চল এটা।

নিশ্চয়ই, এটা কাল্‌চারের কেন্দ্র। প্রফেসার পাড়া।

লাল টালি-ছাওয়া মাধবীবিতান ঘেরা সুন্দর কয়েকখানা ঘর। সবগুলো প্রায় একরকম দেখতে। স্থানীয় কলেজের ন'জন অধ্যাপকের আস্তানা। সেদিন বেলা দশটার সময় দেখা গেল একটি ঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে এক যুবক। হাতে সেদিনের খবরকাগজ। এঁর নাম বিদ্যুৎবিকাশ। রোগা ছিপ্‌ছিপে নিরীহ চেহারা। হ্যাঁ, ইনি ইউনিভার্সিটির একজন নাম করা ছাত্র। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কিছু বেশী টাকা মাইনে পেয়ে মফঃস্বল কলেজে চলে এসেছেন্ অধ্যাপনা করতে। সস্ত্রীক আছেন এখানে।

সম্প্রতি এ শহরে এসেছেন।

স্টেটস্‌ম্যানের আদ্যোপান্ত পড়া শেষ করে বিকাশবাবু (এই নামেই তিনি এখানে বেশী পরিচিত) হাই তুললেন ঘড়ি দেখলেন।

ঘড়ির কাঁটা দশটার দাগ পার হ'তে চলল। ভুরুতে অশান্তি নিয়ে, দেখা গেল বিদ্যুৎবিকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাইচারী করলেন বারান্দাটা দু'বার। ভাবছিলেন চেয়ারম্যানের মেয়ে লিলি আজ কেন এখন পর্যন্ত এল না। হ্যাঁ, কথা ছিল ওর আসার

হয়েছিল কাল বিকেলে ওপাড়ার একটা রেস্টুরেণ্টে। মেয়েরা সেখানে জড়ো হয়েছিল আর কি করে, বিদ্যুৎবিকাশও হঠাৎ সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন।

'মেয়েদের সমিতির অ্যানিভার্সারিতে পড়া চলে এমন একটি প্রবন্ধ লিখে রাখবেন বিকাশবাবু।' বলছিল সবাই।

কাল অর্ধেক রাত জেগে বিদ্যুৎবিকাশ প্রবন্ধটি রচনা করে রেখেছেন বেশ বাছা বাছা শব্দ যুগিয়ে, অথচ এখন পর্যন্ত ওরা কেউ এলই না।

সকালের রোদ তেতে আগুন হয়ে গেছে। চায়ের পেয়ালা শুকিয়ে খটখটে, মাছি উড়ছে পাত্রের মুখের ধারে। স্টেটসম্যানের পাতাগুলো খসে খসে পড়ল টেবিল থেকে মেঝেয়, এলোমেলো এধারে ওধারে। পায়ে পায়ে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নিয়ে চললেন আর সহস্রবার তাকালেন রাস্তায়, বাইরে, সামনের মৌসুমী ফুল-ছিটানো সবুজ লনের দিকে।

হঠাৎ যদি শাদা জুতো দেখা যায়।

হলুদ বাঘ ডোরা শাড়ির চমক।

সময় সম্পর্কে বিদ্যুৎবিকাশবাবুর এত সচেতন থাকার কারণ স্ত্রী মিনতি দুই বেলা ঘরে ফিরবে।

না, মিনতিকে বিদ্যুৎবিকাশ ভয় করেন বললে ভুল হবে, মিনতির ওপর তিনি বিরক্ত এবং কোন কোন বিষয়ে খুব বেশী বিরক্ত।

আশ্চর্য দুজনের রুচি, রুচির বৈষম্য।

বিদ্যুৎবিকাশ, মাঝে মাঝে কেন, এখন, কদিন ধ'রে সমানেই ভাবছেন।

আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায় মেয়েদের চরিত্রের। বিশেষ, বিয়ের পর। বিয়ের আগে বিকাশবাবু মিনতির মধ্যে যে রূপ দেখেছিলেন, বিয়ের পর পুরো একটি বছরও তা রইল না। Love Marriage. বন্ধুরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিল। এমন কি এই এক বছর পরও দূর থেকে কেনো কোনো বন্ধু চিঠি দিয়ে খবর নিচ্ছে, জানতে চাচ্ছে কেমন কাটছে দু'জনের। কেমন কাটাচ্ছে ওরা।

বিদ্যুৎবিকাশের দূরের বন্ধুরা জানতে পারছে না, এইমাত্র আজ সকালেও ঝগড়ার ঝড়ো ঝাপ্‌টা হাওয়া বয়ে গেছে এই ঘরে।

তুলনাটা ঠিক হ'লো না।

শিক্ষিত আধুনিক নব দম্পতীর গৃহের নিঃশব্দ ক্ষুরধার-চকিত কলহ। ধার ও মসৃণতা সমপরিমাণে আছে। উচ্চবাচ্য, লম্ফ-ঝম্ফ নেই, তাই বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বিদ্যুৎবিকাশ ভাবছিলেন, কি করে রাতারাতি এলিয়টের কবিতা মিনতির এত খারাপ ঠেকতে পারে। এত ভ্রূকুটি কাব্যালোচনায়।

অবশ্য মসৃণভাবেই মিনতি বলেছে, ব্রজমাধববাবু, স্থানীয় কলেজের অঙ্কের গুরু ব্রজমাধব রক্ষিত নদীর ওপারে ইট পোড়াচ্ছে। না, এখনই দালান তুলবে ব'লে নয়, ইট বিক্রী করছে ভদ্রলোক টাকার জন্যে। অধ্যাপক মানুষ ইটের কারবার দিয়েছে নিছক অতিরিক্ত আয়ের জন্যে। ইটের গায়ে পরিষ্কার ছাপ আছে বি এম আর।

সবাই আয় বাড়াচ্ছেন এদিনে।

চল্‌তি বাজারদরের অনুপাতে আয় না বাড়লে মানুষকে বিপন্ন হতে দেরি হয় না।

এই সেদিন দর্শনের অধ্যাপক কামাখ্যা চন্দ কয়লার দোকান খুলেছেন চোখমুখ বুজে। কেন খুলবে না, মাষ্টারি করে কত আর এক একজনের রোজগার।

বোটানির প্রিয়নাথ নন্দী বাজারে নেমে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। বছরে দু'খানা ক'রে স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়ছে। একটা কিছু করছে সবাই।

করছে না, করল না শুধু সোনার মেডেল পাওয়া বিদ্যুৎবিকাশ। সব সময় মুখে না বললেও, মিনতি সর্বদাই জানাতে চাইছে, যে-ব্যক্তি অবসর সময় এলিয়ট নিয়ে কাটায়, ছেলেদের মিটিংএ মেয়েদের সভায় প্রবন্ধ পড়ার ঘন ঘন ডাক যার তার ভবিষ্যৎ তমসাবৃত।

ধরতে গেলে বিয়ের প্রায় পরদিন থেকেই বলছে মিনতি 'বিয়ের আগে কাব্য ঢের শোনা গেছে। এখন সংসারী হয়েছ পয়সাকড়ির দিকে মন দাও।' অদ্ভুত দক্ষতার সহিত বলছিল ও।

বিয়ের আগে আনন্দবাবুর বৈঠকখানায় মিনতির পড়ার ঘরে বিদ্যুৎ-বিকাশ মিনতিকে কবিতা পড়ে শোনাতেন এখন মনে হলে তাঁর লজ্জা হয়।

স্ত্রীকে কবিতা পড়ে শোনানো বিদ্যুৎবিকাশ অনেক দিন বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখানে আসবার পর থেকেই বিকাশবাবু অন্যান্য অধ্যাপকের বৈষয়িক অবস্থা, তাঁদের অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যম ও আয় বাড়ানোর নানাবিধ কাহিনী শুনছেন মিনতির মুখে। রোজ।

আশ্চর্য, বিদ্যুৎবিকাশ কি কিছুই করবেন না।

মিনতি পরিষ্কার জিজ্ঞেস করেছে আজ সকালে। না হলে তাকেই নামতে হচ্ছে, নিতে হচ্ছে একটা কিছু অতিরিক্ত রোজগারের অবলম্বন-স্বরূপ। মিনতি বেরিয়ে গেছে সকাল বেলা। দূর সম্পর্কের এক

জ্যেঠামশায় এসেছে ওর এখানে। একটা মোটা বীমা কোম্পানীর অর্গ্যানাইজার। যদি বোঝে, যদি সম্ভব হয় মিনতি জ্যেঠাবাবুর কাছ থেকে একটা এজেন্সি চেয়ে রাখবে।

বিদ্যুৎকিকাশ না করুক।

মিনতি করবে। নিজে ঘুরে ঘুরে ইন্সিওর করাবে লোকের জীবন। আর যাই-ই হোক দরিদ্র হয়ে বাঁচতে রাজী নয়।

দু'এক অক্ষর সে-ও যখন লেখাপড়া শিখেছে। খামোকা কষ্টভোগ কেন। 'একটা চাকর নেই বিয়ের পর থেকে।' প্রত্যেকটি কথার পর মিনতি বলে।

বিদ্যুৎবিকাশ বোকার মত তাকিয়ে ছিলেন স্ত্রীর দিকে। তাঁরই পরিচিত মুখ। মিনতি রায়। ছাত্রী মিনতি সেন। 'আমিই চাকরি করব।' বলছে ও এখন।

'ভাবতেই পারি না তুমি কি ক'রে ওসব ছাইমুণ্ড রাত জেগে লিখতে পার।' কাল রাত্রে বিদ্যুৎবিকাশ যখন প্রবন্ধটা লিখছিলেন মিনতি শোয়া থেকে বলছিল, 'মানুষ পয়সা পয়সা করে পাগল হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি, যা ভাল বোঝ কর—'

মিনতি চুপ ক'রে ছিল।

বিদ্যুৎবিকাশ হাসির ভাণ নিয়েই অবশ্য আলো নিভিয়েছিলেন।

'হ্যাঁ, পয়সাওয়ালা বাপের মেয়ে লিলি, পুলিশ সাহেবের স্ত্রী, এস ডি ও'র স্ত্রী, মিসেস রায়, পুলিশ কণ্ট্রাক্টারের বোন রেবা স্নমিতাকে নিয়ে ঐ সমিতি, ওখানে নাক ঢুকিয়ে কি সুবিধা হবে।' কথাগুলো ঘুমের ঘোরে কি জেগে থেকে মিনতি বিড়বিড় করে বলছিল শয্যার এক পাশে কাৎ হয়ে শুয়ে, বিদ্যুৎবিকাশ ঠিক ঠাহর করিতে পারে নি। বিছানায় তিনি চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন।

সকালে উঠে চা না খেয়ে দুপদাপ শ্রীমতী বেরিয়ে গেল বীমা কোম্পানীর জ্যেঠাবাবুর কাছে।

বিদ্যুৎবিকাশ বারান্দায় পাইচারী করতে করতে ভাবছিলেন ইতিমধ্যে লিলি ওরা কেউ এসে লেখাটা নিয়ে গেলে কি ভাল হত না? ভবিষ্যতে তিনি আর এসবে হয়ত রাজী হবেন না।

যেন লিলিদের জন্য রাত জেগে লেখাটা তৈরী করার দরুণই আরো বেশী জিদ্ করে মিনতি বেরিয়েছে অর্থাগমের উপায় খুঁজতে।

অপরাধ বৈকি।

তরুণ অধ্যাপকের এত দীপ্তি মেধা রাশি রাশি বিদ্যা সভা-সমিতিতে প্রবন্ধ কবিতা পড়ে ক্ষয়িত ব্যয়িত হচ্ছে আধুনিক স্ত্রী তা পছন্দ করবে কেন। কে-ই বা করে।

বিদ্যুৎবিকাশের ঠোঁটের প্রান্তে কি একটা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়ে আবার নিভে গেল।

আলাদা ক'রে বারান্দার টবে ছোট্ট একটা মল্লিকার চারা পুঁতেছিলেন তিনি যত্ন করে। ফুল আর ফুটবে না। চারাটা আস্তে আস্তে হলদে রং ধরে কেমন স্তিমিত ম্রিয়মান হয়ে গেছে। একটা বিদ্‌ঘুটে ছাই রঙের পোকা ডাঁটের একটা অংশ দিনের পর দিন কামড়ে ধরে একভাবে চুপচাপ শুয়ে আছে।

বিদ্যুৎবিকাশ স'রে আসছিলেন টবের ধার থেকে। জুতোর খুট্‌খুট আওয়াজে চোখ ফেরালেন সিঁড়ির দিকে।

লিলি নয়, স্ত্রী মিনতিও না।

আর, এক জোড়া জুতোর শব্দ নয়, ছোট ছোট অনেকগুলো আওয়াজ।

শিশির-ধোয়া শিউলীর মত ফুটফুটে সাতটি মুখ রেলিঙের ওপারে

আস্তে আস্তে উঁকি দেয়। অধ্যাপক-পাড়ার ছোট ছোট মেয়ের একটি দল।

'কোথায় গিছলে সব?' বিদ্যুৎপ্রকাশ হাসলেন। সমস্ত সকালে এই বোধ হয় প্রথম হাসি।

'আমাদের 'ডাক-ঘরের' রিহার্স্যাল হচ্ছে, দাদাবাবু।'

'কোথায়?' বিদ্যুৎবিকাশ যেন বেশ একটু অবাক হন। 'কে শেখাচ্ছে?'

'অরুণাদি।' ন'বছরের ডলি সবচেয়ে সপ্রতিভ। নতুন হেড-মিস্ট্রেসের নাম বলল সকলের আগে।

'আমাদের নতুন হেড মিস্ট্রেসকে দেখেন নি দাদাবাবু?' ডলির পর বাকি সব কলকলিয়ে উঠল। 'খুব সুন্দর, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।' বলল ওরা ছোট ছোট গলা বাড়িয়ে।

'হুঁ, বিয়ে করেনি, একলা আছেন, সারাদিন কবিতার বই পড়েন তোমার মতন।' বলতে বলতে সিঁড়ির পিছন থেকে মিনতি রায় এসে সামনে দাঁড়ালো।

বিদ্যুৎবিকাশ চোখ নামালেন।

'আশ্চর্য, কতদিন আমি তোমায় বারণ করেছি, অত ছোট মেয়েদের সঙ্গে বেশী কথা বলো না, বেশি কথা কয়ে কাজ কি?' অপ্রসন্ন চোখে মিনতি প্রথমে স্বামীর দিকে তাকালো। তারপর রূঢ় কটাক্ষ হানল অধ্যাপক নন্দিনীদের দিকে। 'তোমরা যে যার ঘরে যাও বলছি।' তর্জনী দেখাল মিনতি। ভয়ে ফুলের পাপ্‌ড়ির মত টুপ্‌-টাপ্‌ সব খসে পড়ল। ডলি, রীণা, ঝুমুকো, কাবেরী, তাপ্তী, ইরা, কুঙ্কুম। এদিক ওদিক।

'বেশ বড় হয়েছে সব মেয়ে, এগারো বারো বছর বয়েস কম কি।'

মিনতি বিদ্যুৎবিকাশের দিকে চোখ ফেরাল। 'ছুট্ ক'রে কে কি মন্তব্য করে, বোঝ না?'

'ওরা এসেছিল, আমি—'

'আসবেই, এপাড়ায় তোমার মতন এমন আর কে অবসর নিয়ে ব'সে আছে। শিক্ষয়িত্রীর কাছে সারা সকাল নাটকের মহড়া দিয়ে ওরা এখন তা তোমায় শোনাতে এসেছিল, তুমি একজন কাব্যরসিক কিনা, ছোট মেয়েরাও তা জেনে গেছে।' মিনতি বাইরের দিকে চোখ রেখে একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

'জ্যেঠাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?' যেন প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বিদ্যুৎবিকাশ আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন।

'হয়েছিল।' মিনতি গলা পরিষ্কার করে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। 'তোমার খুব সুখ্যাতি করলেন, সব শুনে জ্যেঠাবাবু কি বললে জান?'

বিদ্যুৎবিকাশ স্ত্রীর চোখে তাকাতে গিয়েই ফের মাটির দিকে তাকালেন।

'তোমার এলিয়ট সাহেব ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন, কবিতা লিখতে গিয়েও ভদ্রলোক টাকা কড়ি জিনিসটা ভুলতেন না।' একটু থেমে মিনতি বেশ ধীরে কঠিন গলায় বলতে লাগল, 'ওসব ছাড়, কবিতা স্বপ্ন,—কিছুই কিছু না এদিনে যদি না তোমার টেঁক ভারি থাকে। হ্যাঁ, আমি এজেন্সী নিলাম।' জুতোর শব্দ তুলে হাতের ব্যাগ দোলাতে দোলাতে স্ত্রী গিয়ে ঘরে ঢুকল। অধ্যাপক একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। হলদে ডাঁটের গায়ে ধূসর পোকাটা একবার একটুখানি যেন নড়ে উঠেছিল।

কিন্তু ঘরে গিয়েও মিনতি ক্ষান্ত হয়নি। 'অমন ফড়িং ফড়িং ভাব থাকবে না।' সমিতি তো কত হচ্ছে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। এস ডি ও'র বাংলোয় সেকেণ্ড অফিসারের বাড়িতে, পুলিশ সাহেবের

দরজায়—সারাদিন তো শুনি এই হচ্ছে। বাপ্ কী ঘোরাঘুরি না করতে পারে মেয়ে।'

লিলি সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্য।

ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে হাত বাড়িয়ে একটা কাঠি নিয়ে বিদ্যুৎ-বিকাশ পোকাটাকে তুলতে চেষ্টা করেন।

ঘুরে এসে মিনতি ক্লান্ত। একটু চা খাবে তার আয়োজন চলছে, টুং টাং শব্দ পেয়ালা পিরিচ কেট্‌লির। অধ্যাপকের কানে এলো।

'এই আর এক ফ্যাশান। বিয়ে টিয়ে করলাম না। একলা বিদেশে আছি, চাকুরি করছি,—তা-ও তো মেয়ে স্কুলের টিচারি। এতেই এমন অহংকার—শুনছি গরবিনী নাকি কারো সঙ্গে কথাই বলতে চান না। শুধু সুবিধা পেলে অমুকবাবু তমুকবাবুদের নিয়ে রেস্টুরেণ্টে মাঝে মাঝে চা খান। গা জ্বালা করে' কী সব হচ্ছে এক একটা মেয়ে আজ।'

এটা নতুন হেডমিস্ট্রেস্ সম্পর্কে।

যেহেতু একটু আগে ছোট মেয়েরা বিদ্যুৎবিকাশের কাছে এসে হেড-মিস্ট্রেস্ মিস্ সেনের প্রশংসা করছিল।

বিদ্যুৎবিকাশ শুকনো ডাঁটের গা থেকে পোকাটাকে ছাড়িয়ে এনে চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

'কি করে যে মানুষ এত টাকা করতে পারে বুঝি না। কেমনে সম্ভব। এক নিরঞ্জন রায়কে দিয়ে জ্যেঠাবাবু বিশহাজার টাকার পলিসি করিয়েছেন।...তাই ভাবি, কী থাকে লোকের অদৃষ্টে। কি হ'ল, কি

করল এত টাকা ক'রে—স্ত্রীরত্নটি রাতদিন ঘুরছেন কোন্ এক উকিলের ছেলের সঙ্গে। ভাল।'

এসব বাইরের মহলের খবর। মিনতি যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনে। শহরের এর ওর সংবাদ।

কাঠিশুদ্ধ পোকাটা রেলিঙ গলিয়ে বাইরে ফেলে দেন বিদ্যুৎবিকাশ।

বিদ্যুৎবিকাশের কানে আসছিল এবার এই মহলের সংবাদ। অধ্যাপক পাড়ার ইনি উনি সম্পর্কিত প্রাত্যহিক খবর। কাবেরীর মা নতুন রেডিও-সেট্ কিনল, ঝর্ণার মা ছ'গাছ করে ইলেক্ট্রিক চুড়ী গড়িয়েছে কাল, ঝুম্‌কোর মা-বাবা এবার পুজোর ছুটিতে নীলগিরি পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছে। প্রিয়নাথবাবু এটা করতে পারছেন পাঠ্য-বই বিক্রীর টাকায়। তাপ্তীর মা মেয়ের জন্যে এবং নিজের জন্যে আলাদা এক সেট করে গয়না গড়াচ্ছে আগামী মাসে। ইঁট বিক্রীর টাকায়। রেডিও আসছে কয়লায়।

বিদ্যুৎবিকাশ পায়চারী করতে করতে চলে গেলেন বারান্দার ও মাথায়।

বিদ্যুৎবিকাশের মনে পড়েছে, এমন এক ছুটির দিনে, এপ্রিলের নীল-আকাশ ঝলসানো রোদের দিকে চেয়ে পদ্মপুকুর রোডে আনন্দবাবুর বৈঠকখানার পাশে মিনতির পড়ার ঘরে বসে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন।

Miss Nancy Ellicott smoked
And danced all the modern dances ;
And her aunts were not quite sure
how they felt about it.

আর আকাশের মত ঝক্‌ঝকে নীল চোখ মেলে পরিচ্ছন্ন কুমারী মেয়ে পড়ছিল :

In the room the woman come and go

Talking of Michangel.

ঘড়ির কাটায় তখন বেলা দশটা।

মিনতির সেবার বি এ ফাইন্যাল দেবার বছর। এই সেদিন। গেলবার।

এক বছর এখনো পার হয়নি।

তরুণ অধ্যাপক পায়চারী করতে করতে ফিরে আসেন বারান্দার এমাথায়।

আধুনিক শহরে রোববারের দুপুরটা শান লাগানো ক্ষুরের মত চকচক করে ঝক্‌ঝকে।

কে বলবে সাব রেজিস্ট্রার কলেজের ছোকরা ন'ন। না আর গাছতলার নাপিত নয়, সেলুন, সোজা সেখান থেকে ক্ষৌরকর্ম সেরে এসেছেন। চেপ্টা দন্তহীন মুখের দু'পাশে চোয়ালের দুটো দিকে সাবানের ফেনার শুকনো দাগ নিয়ে তিনি এখন বাড়ি ফিরছেন না। পরিষ্কার পাউডারের পাফ-চাপড়ানো নিখুঁত কেতা দুরস্ত চেহারা।

পরিমিত বিত্ত কিন্তু পরিশীলিত মন।

অন্তত: নিজের সম্পর্কে সাব রেজিস্ট্রারের এই ধারণা, তাঁর ছেলেও নেই মেয়েও নেই। তিনি মোহিনীর মত একই সঙ্গে সন্ততির ভবিষ্যৎ ও পলিটিকস নিয়ে মাথা ঘামান না। ছুটির সকালে তিনি মোহিনীর মত বৈঠকখানায় আটক না থেকে বরং শহর ভ্রমণে বেরোন। বেঁরিয়েছেন।

হাত ঘড়ি আছে, পাকা-চুলে একটু টেরী আছে, কালো চিকচিকে

রুমাল-পার ধুতি পাম্প স্থ, সুদৃশ্য নস্যর কৌটো। এই বয়সেও বেশ তরুণ হবার মত গন্ধ-ঢালা রুমাল আছে পকেটে।

বেড়াতে বেড়াতে হাঁটতে হাঁটতে বুঝি বা শিস দিতে দিতেই সুন্দর বাঁধানো হসপিট্যাল রোড ধরে সাব রেজিস্ট্রার টিচার্স কোয়ার্টারের দিকে দিকে অগ্রসন হন। একলা। এমনি।

রাস্তার মাঝখানে মুরারী একবার দাঁড়ান। শহরে চীনা ডেণ্টিষ্ট আবার কবে এলো। সস্তায় এমন সুন্দর দাঁত বাঁধাতে পৃথিবীতে এদের জুড়ি নেই। বার বার সাব রেজিস্ট্রার সাইন-বোর্ডখানা পড়লেন, চিং লু ফিন।

সমর্থ চীনা মহিলা হলদে খোলা-বুক হয়ে ঘরের এক পাশে বসে সন্তানকে স্তন্য দিচ্ছে অন্য পাশে টিঙটিঙে, লম্বা, খড়ম পায়ে কালো চশমা পরা চীনা পুরুষ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে দরজায় দাঁড়িয়ে, এখনো রুগী আসেনি, এলেই ডাক্তার পেঁয়াজ ফেলে দিয়ে সাঁড়াশী তুলে নেবে। আর মেয়েটা কোলের ছেলেকে চট করে নামিয়ে রেখে উঠে উনুনে গরম জলের কেটলি চাপাবে, পটাস মেশানো লাল জলের গ্লাস নিয়ে ছুটে আসবে রুগীর পাশে মুখ ধোয়াতে। দাঁত বসাতে গিয়ে বিদেশীনীর হাতের সেবা-যত্ন। যেন ছবিটা কল্পনা করতে করতে মুরারীবাবু হুট করে এক সময়ে ঢুকে পড়লেন দোকানে নতুন নকল দাঁত পরতে, আজ তাঁর বাহান্ন বছর বয়েস পূর্ণ হবে। দৃশ্যটা চোখে পড়ল অটলবাবুর।

অটলবাবু দেখলেন, হাসলেন না।

কাঠের চেয়ারে চুপ চাপ বসে থেকে সকাল থেকে দেখছেন একটার পর একটা দৃশ্য আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

চাকর কানাই লণ্ড্রী থেকে ধোপদুরস্ত জামা কাপড় নিয়ে এল একটু আগে। অটলবাবুর নিজের জামা-কাপড় কখানা? প্রায় সবই

মেজবাবুর। নিশানাথের। কানাইর কাপড় জামাও আছে। নিশানাথকে বড়বাবু বা একমাত্র বাবু না ডেকে চাকরটা মেজবাবু ডাকছে কেন। নিশানাথের চেয়ে আর কে আছে বিলাসীবাবু এ বাড়িতে যেন পিতা হয়েও অটলবাবু তা মাঝে মাঝে ভাবেন।

হ্যাঁ বাড়ির ঘর দরজা মেঝের চেহারাই বদলে গেছে কদিনে। কানাই রাতদিন মেজবাবুর ফই-ফরমাস খেটে, বকশীস টকশীস পেয়ে টেরী মাথায় সিনেমা কার্নিভ্যাল দেখে বেশ ফুরফুরে বাবুটি হয়ে আছে।

বলতে কি অটলবাবু এ জীবনে লণ্ড্রীতেও কাপড় কাচাননি আবার লণ্ড্রীর জামা-কাপড় গায়ে চড়িয়ে বাড়ির চাকরকেও সিনেমার শো দেখতে তিনি ছুটতে দেখেননি। অটলবাবু চাকরই দেখেননি।

তাই চুপ করে রাস্তার নিম গাছটার দিকে চেয়ে থাকেন।

মুন্সেফ শশাঙ্ক আঢ্য। হাঁটছেন। বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে স্ত্রী।

একটা কুকুর। চাকর। কুকুরের শিকল ধরে চাকরটা কখনো মুন্সেফ মুন্সেফানীর কখনো সকলের পিছনে। ঠেলাগাড়িতে নবজাতক।

পেরাম্বুলেটারের হাতল ধরে আয়া স্বরূপিণী মুন্সেফ-শ্যালিকা, নাম যেন কি ও হ্যাঁ, ডায়না। নামটা কানে লাগল অটলবাবুর।

মুন্সেফবাবু ক্ষণে ক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে সহাস্য কলরবে পত্নীর অনুজাকে সম্বোধন করছেন। ডায়না দেবী কপট ক্রোধে মুখ রক্তিম করে মাথা নাড়ছে 'আমায় আবার কেন, আমি এসে করব কি, বেশ তো হাঁটছেন দু'জন।'

'বুঝলে,' মুন্সেফ-পত্নীর মন্থর কণ্ঠস্বর। 'আরো শেয়ার কিনে রাখা ভাল, আমি বলছি এই বেলা তুমি নিয়ে নাও।'

'হু' দেখছি। মুন্সেফবাবু শ্যালিকাকে ছেড়ে স্ত্রীর চোখে চোখে তাকান। ঘন ঘন শির সঞ্চালন করেন। অর্থাৎ, তোমার যুক্তি সর্বাগ্রে বিবেচ্য, তবে এখন বেড়াতে বেরিয়ে······

'ওকি, রাগ করে দাঁড়িয়ে পড়লে।'

ঠেলা গাড়ীসহ ডায়না দেবী আর এক পা অগ্রসর হচ্ছে না। আঢ্য মহাশয় ছুটে এসে শ্যালিকার সঙ্গে মিলিত হন, হাতে হাত রাখেন হাসেন।

কুকুর আনন্দে ল্যাজ নাড়ে। ডায়নার অধরে হাসি ফোটে। আবার পেরাম্বুলেটারের চাকা ঘুরল।

আস্তে আস্তে ক্যারাভান অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার সামনে থেকে। অটলবাবু নিস্তেজ নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঝুর ঝুর করে এক মুঠো পাকা হলদে নিমপাতা ঝরে পড়ে এলোমেলো হাওয়ায়। ঘরের সামনে। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে অটলবাবুর টেবিলে পড়ে, কোলে।

'গুডমর্নিং'।

'সুপ্রভাত'। অটলবাবু ক্ষীণ হেসে সোজা হয়ে বসেন।

'বেরোলেন না?'

'নাঃ।'

'শরীর খারাপ?' চোখ থেকে কালো ঠুলিটা ডাক্তার সরিয়ে নেয়। 'বলুন।' যেন পকেট থেকে এখুনি স্টেথস্কোপ তুলে অটলবাবুর বুকে চেপে ধরবে।

ডাক্তার হাসল।

'স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলো পর্যন্ত আমরা অবহেলা করি, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে। সত্যি কি তা নয়?'

অটলবাবু গম্ভীর।

'এমন ফাইন ওয়েদার, পার্কে দুটো চক্কর দিয়ে আসতে পারতেন, মাঠে যেয়ে—'

যোগীন ডাক্তারের কথা মাঝখানে থেমে গেল।

যেন অটলবাবু আজ এই প্রথম মুখ খুললেন।

'কথা হচ্ছে কি, ডাক্তার।' অটলবাবুর শুকনো স্তিমিত চোখে প্রতিবাদ, কিন্তু মুখে বিনয়ের হাসি। 'আমার মনে হয়, কেমন জানি ভয় হয়, সত্যি আমি পিছিয়ে গেছি, কারো সঙ্গে মেশার অনুপযুক্ত, বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে অযৌক্তিক।'

'কেন, এটা কিসে থেকে হ'ল।' যোগীন ভুরু কুঁচকে অটলবাবুর মুখের দিকে তাকায়। 'এই melancholy তো ভাল নয়।'

টেবিলের ওপর দুই চোখ নিবিষ্ট রেখে অটলবাবু কি যেন ভাবেন।

ডাক্তার জুতোর গোড়ালীটা মেঝের ওপর একটু ঠুকল। একবার বাইরের দিকে তাকাল।

'রাত্রে আপনার ভাল ঘুম হয়?'

'তা একরকম—' অটলবাবু দুর্বল ভঙ্গীতে হাসেন।

'দেখি—'

'ওকি, ব্লাডপ্রেশার দেখছেন নাকি?' অটলবাবু এবার শব্দ ক'রে হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'ও সব মোটামুটি ঠিক আছে যোগীনবাবু, বললাম তো আসল অসুখটা মনের, যার কোনো—'

'ওষুধ নেই,' বেশ অপ্রসন্ন চোখে যোগীন ডাক্তার হাত গুটিয়ে নিলে। একটু গম্ভীর থেকে পরে বলল, 'যদি ইচ্ছা করে সারাক্ষণ আমি মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকি, সত্যি এর কোনো ওষুধ নেই। আজকের দিনে মানুষ—'

যোগীন হঠাৎ থেমে যায়।

অটলবাবু আস্তে আস্তে বলেন, 'এটাও ঠিক—মানুষ দিন দিন যত বেশী সভ্য হচ্ছে মনের রোগ কিন্তু তত বেশী বাড়ছে, আর বেশ জটিল

আকারে তা দেখা দিচ্ছে, মিথ্যা বললাম কি?' অটলবাবু চৌকাঠের বাইরে চোখ রাখতে গিয়েও ডাক্তারের দিকে তাকান।

'তা হতে পারে, আপনারা পণ্ডিত মানুষ, ভাবেন বেশী।' যেন কথায় বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে যোগীন শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের অভিপ্রায়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল, 'নিশানাথ বুঝি বাড়ি নেই।'

'না আর্দালীকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে মফঃস্বল যাচ্ছে,—এখানকারই কোন্ গাঁয়ে।'

'ব্যাঙ্কের কাজে।' যেন ডাক্তার নিজের মনে বলল।

অটলবাবু চুপ থেকে মাথা নাড়লেন।

'খুব খাটছে ব্যাঙ্কটার জন্যে।'

অটলবাবু নীরব।

'চললাম।' ডাক্তার ঘুরে দাঁড়াল।

'কদ্দূর যাওয়া হবে? আজ রোববার।'

'না আজ আর দূরে যাওয়া হবে না, টিচার্স কোয়ার্টারে একবার উঁকি দিয়ে বাড়ি।'

'চলি।' বিলাতী কায়দায় মাথা নেড়ে ডাক্তার লাফিয়ে চৌকাঠের বাইরে নেমে গেল।

শাদা সর্টস, শোলার টুপি মাথায়। গগলস। বর্মা চুরুট। শাদা জুতো।

যতদূর দেখা যায়, অটলবাবু চুপ করে দরজার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন। চড়কির মতন এ বাড়ির দরজায় ও বাড়ির বৈঠকখানায় উঁকি দিয়ে কথা কয়ে হেসে গল্প করে ডাক্তার দেবদারু গাছের আড়ালে অদৃশ্য হল। অর্থাৎ সেখান থেকে রাস্তার বাঁক। আর দেখা যায় না।

একটা গোলাপ ঝুলছিল সার্টের বোতামের ওপর। অল্প অল্প গন্ধ বেরোচ্ছিল।

চলে যাবার পরও ডাক্তারের মূর্তিটা চোখের ওপর ভাসছিল অটলবাবুর।

দৃশ্য পরিবর্তিত হয়।

ছুটির সকালে বেশ সেজেগুজে বেড়াতে বেরিয়েছেন পঙ্কজ গুপ্ত, হীরেন্দ্র পালিত। এই শহরের বিশিষ্ট লোক এঁরাও।

ঘাড়ে গলায় অল্প অল্প পাউডারের ছোপ। চোখে সুদৃশ্য চশমা। আদ্দির তলায় নেটের গেঞ্জী উকি দিচ্ছিল একজনের। ত্রিশোর্ধ্ব দু'জনের বয়েস।

সিগারেটের ধোঁয়ায় হাস্যালাপে এবং গম্ভীর কথোপকথনে ছুটির সকালের হাওয়া চঞ্চল করে দিয়ে দু'জন চলল হসপিটাল রোডের দিকে। দেবদারু গাছের বাঁক এদেরও নিশানা।

অটলবাবু চুপ করে রইলেন।

অল্প পরে মাটির একটা পাকা নিমফলে ঠোকর দিতে একটা শালিক নেমে এল।

গরুর গাড়ী গেল একটা রাস্তার পিলার ঘেঁষে, একটার পরে একটা রিক্সা। শালিকটা নড়ল না।

অনড় পাথরের মত অটলবাবু বসে রইলেন এর পর কে যায় রাস্তায় দেখতে। রোদের হলদে রং শাদা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছে দুজন মুখোমুখি। মাঝখানে ছোট্ট চায়ের টেবিল।

বে-বার্নিশ, কেরোসিন কাঠ দিয়ে তৈরী।

টেবিলটির দৈন্য ঢাকবার জন্যে কালো কাপড়ে শাদা সুতোর ফুল ও প্রজাপতি তোলা একটা ঢাকনি।

টেবিলে ক'খানা কাপ-সসার জড়ো হয়েছে। বোঝা যায় কিছুক্ষণ আগে চা-পান পর্ব শেষ হয়েছে। পেয়ালার ধারে ধারে সরু মোটা রেখায় শুকনো বিবর্ণ চায়ের দাগ। আর সেই দাগ বেছে বেছে একটি দুটি মাছি বসে আছে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ।

দেবদারুর পাতাগুলো একটু নড়ছে না, মনে হয় সবুজের একটা মেঘ রৌদ্রের আকাশে থেমে আছে যেন।

'এঁদের দু'জনকে আমি চিনলাম না।' অরুণা সুশীর চোখে চোখে তাকাল।

'আস্তে আস্তে চিনতে পারবে।' সুশীলা বলল।

ডাক্তার ও সাবরেজিস্ট্রার ছাড়া আরো দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে আজ সকালে।

'ছুটির দিন ভদ্রলোকদের আনাগোনা একটু বেড়েছে মনে হয়।' অরুণা বাইরের দিকে চোখ রেখে কথা বলল।

সুশী চুপ।

'সাবরেজিস্ট্রারবাবু বেশী কথা কন।' অরুণা আবার সুশীর দিকে তাকাল।

'রসিক।' সুশী বলল অল্প হেসে।

'চুলে পাক ধরেছে কি না।' যেন নিজের মনে অরুণা বিড় বিড় করল। একটু থেমে পরে প্রশ্ন করল, 'তোমার কাকাবাবুটি কেমন?'

'কে ডাক্তার ?' সুশী গম্ভীর হয়ে গেল।

অরুণা মাথা নাড়ল।

প্রশ্নটা সে কাল রাত্রেই করত। ডাক্তার যখন অরুণা ও সুশীর সঙ্গে টিচার্স কোয়ার্টারের চৌকাঠ অবধি এসেছিল। আজ অরুণাদের রান্নার আয়োজন তদারক করতে যোগীন ডাক্তার সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল। অরুণা অবশ্য ঘরে ছিল না তখন। মেয়েদের নিয়ে সে পিছনের আতাতলায় রিহার্স্যালের উদ্যোগ করছিল।

ফিরে এসে দেখে সুশী ডাক্তারকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরোচ্ছে।

অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রীদের স্বাস্থ্য এবং সেই সঙ্গে তাদের রান্নাবান্নাও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সম্পন্ন হয় কি না ডাক্তারকে ফি রোববারে এসে পরীক্ষা করতে হয়। অরুণাকে বুঝিয়েছিল সুশীলা তখন।

'শিক্ষয়িত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এতটা উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত অন্য শহরের কোনো ডাক্তারকে আমি দেখিনি!' অরুণা আস্তে আস্তে বলল এখন।

'ডাক্তার সম্পর্কে কেন জানি আমার বরাবরই অন্য রকম ধারণা।' সুশী বলল।

'কি রকম ?' অরুণা ঢোক গিলল।

'পাহাড়ে কাটিয়েছে সারাজীবন, শুনি। কেবল কুলি আর জঙ্গল নিয়ে। হঠাৎ এখানে এতগুলো শিষ্ট পরিচ্ছন্ন স্বজাতীয় মুখ দেখে নাকি অতিমাত্রায় উল্লসিত হয়ে উঠেছে। মিশছে, হৈ হৈ করছে। খারাপ আমার মনে হয় না।'

অরুণা চুপ।

একটু হাওয়া উঠল।

টেবিল ঢাকনির একটা কোণা উঠে গিয়ে একটা ডিশের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

'আর দুজন? অল্প বয়সের দুই ভদ্রলোক?'

'কি জানি, এই তো দুই রোববার দেখলাম', হাসতে গিয়েও সুশী আবার গম্ভীর হল।

'কি জানি, এই তো দুই রোববার দেখলাম', বলছিল অরুণা।

'তাই বলে তুমি এঁদের ওপর রাগ করতে পারে না।' সুশী সোজা বলে ফেলল, 'একজন জুনিয়র উকিল, একজন উঠতি ব্যবসায়ী। স্কুল কমিটিতে না থাকলেও মেয়েদের স্কুল সম্পর্কে এঁদের মতামতের মূল্য খুব বেশি। একজন প্রেসিডেণ্টের ভাগ্নে আর একজন সেক্রেটারীর শ্যালক।'

'তবে আর কথা কি। দুজনেরই অবারিত দ্বার।' অরুণা মাথা নাড়ল। 'ছুটিতে একজোট হয়ে গোটা কমিটির প্ল্যান বানচাল করে দিতে কতক্ষণ।'

'যা বলেছ।' সুশী এবার হাসল। 'বরং আমার তো মনে হয়, সেক্রেটারী ও প্রেসিডেণ্টকে যত না শালা-ভাগ্নেকে তার চেয়ে বেশি সমাদর করা উচিত। আমাদের ইনক্রিমেণ্টের প্রশ্ন আছে, ডি এর!'

'চা খাইয়ে ভালই করেছি!' অরুণা বলল। সুশী এবার শব্দ করে হাসল। 'যা বলেছ।'

'তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক', বেণী-খসা একটা চুল কানের ওপিঠে ঠেলে দিয়ে সুশীলা বলল, 'কমলা মাসী কুড়িয়ে কাছিয়ে যে খবরটি আনে মিথ্যা হয় না।' এবার অরুণা আর কথা বলল না। মেঝের দিকে নিবিষ্ট চক্ষু।

কমলা এই স্কুলের অন্যতম টিচার। চল্লিশোত্তীর্ণা। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীদেরও মাসী। ছোট মেয়েদের ড্রিল শেখান ও বড় মেয়েদের ড্রইং। বিধবা। স্বাস্থ্যবতী। হাস্যরসিকা।

স্কুলের সময়ের বাইরের সময়টুকু শহরে ঘোরাফিরা করেন। এবাড়ি-ওবাড়ি। হাকিম থেকে মাস্টার মহুরী পর্যন্ত।

নানা রকম কাজে। শহরে একটি অর্ফান্যাজ হচ্ছে তাতে কমলামাসী আছেন। লিলিদের মহিলা সমিতির তিনি অন্যতম প্রধানা এবং স্থানীয় অবলা আশ্রমের অনারারী সেক্রেটারী তিনি। নিজে গরীব। রাতদিন ঘুরছেন নারী সমিতির চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে। হ্যাঁ, কমলা খাস্তগীরের মত অল্প সময়ের মধ্যে একসঙ্গে বেশি চাঁদা আর কেউ আদায় করতে পারে না। এই জন্যে শহরের নারী মহলে মাসী এত প্রিয়।

হেসে রং মাখিয়ে এমন সব কথায় তিনি বাবুদের মাত করে দেন যে, এক উকিল-পাড়া থেকেই এক দুপুরে সেবার মেয়েদের কি একটা অনুষ্ঠানের জন্যে উনি পঞ্চাশ টাকা তুলে এনেছিলেন।

হ্যাঁ সাহসিকা তো বটেই।

কারো কারো এমন ধারণা যে, শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যদি বড় ঘরে জন্মাতেন তো কমলা খাস্তগীর এক দেশবরেণ্যা নেত্রী হতেন। এমন মেয়েই হয়। ফর্সা ফটফটে গায়ের রং। কালো পার গরদ পরেন। বিধবা, শঙ্খ রুলি কিছু নেই হাতে। পায়ে পাতলা হরিণ-চামড়ার চটি। কালো চেনওলা ব্যাগ হাতে ফর্সা কোনো মহিলাকে দেখলেই বলে দেওয়া যায় কমলামাসী আসছে কি মাসী যাচ্ছে। চাঁদা তোলার কাজে বেরুলো। ব্যাগের ভিতরে খাতা। একটা কল্যাণী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তারপর সেটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অর্থের প্রয়োজন-টাই বড় এবং প্রতিদিন এই অর্থ সংগ্রহের ব্যাপার কতটা অপ্রিয়কর তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

কিন্তু কমলা খাস্তগীরকে দেখলে, অন্তত ওর মুখের দিকে তাকালে, তা আর মনে হয় না। মাসী হাসছেই।

আর হাসির সব কথা কুড়িয়ে কুড়িয়ে আসছে চাঁদার সঙ্গে, চাঁদা জমা দেওয়ার খাতার ব্যাগে লুকিয়ে।

কমলামাসী ইদানীং রোজ এসে বলছে, অমুক ডিপ্‌টি অরুণার রূপের এই ব্যাখ্যা করল। অমুক মুন্সেফ অরুণা সম্পর্কে এমনটি বলে।

তাঁরা তাকে এই প্রথম দেখছে। কেননা, এখানে এসেই অরুণা বেরোয়নি। মাত্র ক'দিন একটু বাইরে টাইরে যাচ্ছে। আর গুঞ্জন উঠছে। নতুন হেডমিস্ট্রেস দেখতে এমন তেমন। কমলামাসী বলে, ডিপ্‌টি, মুন্সেফ, উকিল, আমলা, কে নয়।

'হন্তে, জঘন্য সব।' মাসী বিড় বিড় করে। কমলার ঠোঁটে হাসি আর তখন থাকে না।

সেখানে যা ভাল ছিল এখানে তা ঘৃণ্য, অবাঞ্ছনীয়, অপ্রীতিকর। অপরাধজনক তো বটেই। 'পাকা চুল, চুল পাকিয়ে ফেললে সব পরিবার পাকিয়ে পাকিয়ে। এঁরাও, এঁদের মুখেও। বরং এদের মুখেই বেশি। ঘেন্না ধরে গেছে পুরুষ সমাজটাকে, পুরুষকে।' বলতে বলতে খবরটা অরুণা ও সুশীর সামনে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত করে মাসী নিজের ডেরায় ফিরে যায়। কমলার সময় নেই আর এক মিনিট দাঁড়াবার। রান্না-বান্না আছে, নিজের স্নানাহার। বেলা এখন তিনপ্রহর।

অর্থাৎ খবরের ফলাফল অরুণার মুখে কি ছাপ ফেলল, প্রবীণা কমলা খাস্তগীর তা আর দাঁড়িয়ে দেখে না, তাড়াতাড়ি সরে যায়।

তা ছাড়া হেডমিস্ট্রেস নিয়েই যখন কথা।

এর গুরুত্ব বেশি।

ধরতে গেলে প্রায় প্রস্তাবের মতনই, প্রত্যাশা জানানোর মতন। আপনাদের সমিতিতে মিস্ সেন আছেন তো? সবাই বলবে।

ওঁকে বলুন না একদিন আমাদের বাড়ি আসতে। আমার এখানে। বুড়ো হাকিম প্রণব চ্যাটার্জি নাকি সেদিন নরম স্বরে অনুরোধ জানিয়েছিল কমলা খাস্তগীরকে। 'আমার স্কুলে পড়বার বয়সের কোনো মেয়ে নেই

অবশ্য'। অর্থাৎ, কারোর অভিভাবক তিনি নন। স্কুলে এখন পড়ছে, এমন একটিও আর তার দুহিতা নেই ছোট ঘরে। বিয়ে হয়ে গেছে সব কটির। নাতি-নাতনীগুলো মা-বাপের সঙ্গে দেশবিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে এই মফঃস্বলে তিনি একা।

ছুটির দিনে কারো কাজ থাকে না হাতে, তাই হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে বসে একটুক্ষণ স্থানীয় সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে আলাপঅলোচনা করা।

দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিক তিনি এবং অরুণার পক্ষে দায়িত্বসম্পান্না একজন বিশিষ্ট নাগরিকা হিসেবে এমন আসা-যাওয়া ও কথাবার্তা বলার প্রয়োজন আছে বৈকি।

তা লাইন ডিঙিয়ে হাকিম তো আর টিচার্স কোয়ার্টারে ঢুঁ মারতে পারেন না, দয়া করে অরুণা একদিন আসুন না আমাদের হাকিম-পাড়ায়।

একটি 'বি' গ্রেডেড মেয়ে-স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের পক্ষে এতো গৌরবজনকই। 'উকিল, মোক্তার, আমলারা' আমন্ত্রণ জানাচ্ছে অন্যভাবে। স্থানান্তরিতা, অন্য স্থান থেকে সবে তিনি এলেন একলা এই শহরে চাকরি করতে। সেই মেয়ে দুঃসাহসিকা, তাঁকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। কমলা খাস্তগীরের কাছে সেদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করছিল রমেন চাকলাদার। স্থানীয় পেস্কার। 'আমার মনে হয়, তাঁর ভিতরে কি যেন এক হ্লাদিনী শক্তিও আছে।' বলছিল চাকলাদার বার বার ভুঁড়ির ওপর হাত রেখে। 'দূর থেকে মাঝে মাঝে দেখি। একদিন বলুন না তাঁকে আমাদের বাড়ি আসতে, আমার মেয়ে নীনা তো তাঁর ইস্কুলেরই ছাত্রী।' অর্থাৎ অভিভাবক হিসাবেই তিনি নতুন হেডমিস্ট্রেসের উপস্থিতিও প্রত্যাশা করছিলেন এবং আশা করছিলেন, নিশ্চয়ই অরুণাদেবী এতটা সামাজিক হবেন। মিশুক।

পর্যন্ত মোক্তার সুধীরবাবু। 'রোগা টিঙটিঙে লম্বা চেহারার ভদ্রলোক।

মোক্তারবাবুর মেয়ে রীণা পড়ছে এই স্কুলে। কমলা মাসীর কাছে নিবেদন করল, 'আজ পর্যন্ত তো নতুন হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কি কথাবার্তার সুযোগই পেলাম না।' সুধীর পাল দুঃখ করছিল এবং কথাবার্তা ও দেখা-সাক্ষাতের আগেই তিনি মাসী মারফৎ নিজের গাছের সমস্ত একটা বড় পাকা কাঁঠাল পাঠাতে চেয়েছিলেন টিচার্স কোয়ার্টারে গত শুক্রবার দিন।

হরেন উকিলের পড়ছে দুই মেয়ে। তিনি পাঠাতে চাইলেন মাছ। তাঁর দেশের বাড়ি থেকে এসেছিল প্রকাণ্ড দুই কাতল।

কমলা আনেনি। বিধবা। মাছ ছোঁবে কোন্ দুঃখে। কাঁঠাল বয়ে আনার মত তার গায়ে জোর দেখল কোথায় টেকো সুধীর। অভদ্র, জানোয়ার।

আর আজ দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন সেক্রেটারী ও প্রেসিডেণ্টের আত্মীয়তার সূত্র ধরে। শিক্ষয়িত্রীদের শুভানুধ্যায়ী। শিক্ষয়িত্রী-কোয়ার্টারের ওধারের জমির বন কেটে বাগান করা হবে। পিছনের ডোবাটা কাটিয়ে ঘাট-বাঁধানো পুকুর হবে। দরকার হয় আরো ক'টাকা কমিটিকে দিয়ে স্যাংশন করিয়ে তাঁরা হেডমিস্ট্রেসের শোবার ঘরের বেড়া, দরজা-জানলা এবং মেঝেটারও সংস্কার করবেন। কিছু রং, কিছু সিমেণ্ট আর ক'খানা কাঠের তো মামলা। সত্যি বড় জীর্ণ, অত্যন্ত দরিদ্র চেহারা শিক্ষয়িত্রী-আস্তানার। ভদ্রলোকদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একজন উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা মহিলার এভাবে এ-ঘরে থাকা চলে না। 'আমাদের শহর আমরা যদি নবাগতার, সুখ-সুবিধা, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগী না হই তো লজ্জার কথা।'

বলছিলেন, পঙ্কজবাবু ও হীরেনবাবু একবার চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বার বার অরুণার দিকে চেয়ে।

'যাকগে ওসব।' যেন প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য অরুণা বলল, 'এবার তোমার গল্প কর।'

'আমার গল্প!' সুশী নিজের মধ্যে ফিরে এল। হঠাৎ কমলা খাস্তগীরকে টেনে এনে এবং তারপর হেডমিস্ট্রেসকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে ও কেমন অপ্রস্তুত হয়েছিল। 'আমার গল্পের আর বাকী আছে কিছু, অরুণাদি? সব তো বললাম। এখন ভয় হচ্ছে—ভাবছি—তুমি যে আমায় করুণার চোখে দেখবে।'

'না, তা হবে কেন।' অরুণা সুশীর হাতে হাত রাখল। 'বরং শহুরে মনের সঙ্গে একটুখানি গাঁয়ের মন মিশে আছে বলেই তুমি বেঁচে গেছ।'

সুশী চুপ করে রইল।

অবশ্য, অরুণাকে আর হেডমিস্ট্রেস লাগছিল না তখন সুশীর চোখে। একটি মেয়ে, সমান বয়সের, জীবিকার জন্যে মফঃস্বলের গরীব স্কুলে টিচারি করছে।

ভারি করুণ মনে হলো, করুণ ক্লিষ্ট বিমর্ষ, সুশীর মত স্তিমিত বিষণ্ণ আর একটি যৌবন।

যেন ছন্দোহীন হয়ে, ছন্দোপতনের ফলে গ্রীষ্মের কাঠফাটা রৌদ্রের দুপুরে ঢেউটিনের বেড়া-দেওয়া গরম ঘরে শুকনো ধুলো আর হাওয়ার নিঃশ্বাস নিতে জেগে বসে আছে। কেন?

সুশীর তবু বিয়ে হয়েছিল।

ওর অবস্থা কি।

কার জন্যে চাকরি, কেন চাকরি।

রূপসী সন্দেহ কি। ভরভরতি যৌবন। ঈর্ষা হয়। সুশী ঈর্ষা করে অরুণাকে, ওর রূপ।

কেমন যেন স্তিমিত মনে হয় অরুণাকে এক এক সময়, নিস্তেজ। সুশীর ভাল লাগে এটা।

অনেকক্ষণ একভাবে চুপ করে চেয়ে থেকে অরুণা আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, অভাবে না পড়লে কে আর সখ করে মাস্টারি করতে আসে।' একটু থেমে অরুণা বলল, 'কি তার সম্মান।'

সুশীলা অরুণার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

অরুণা আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, সুশী বলল, 'থাকগে।' বাধা দিয়ে বলল, 'চল, স্নানের বেলা হল।'

অর্থাৎ সুশীলা আর চাইছিল না এখানকার সামাজিক জীবন নিয়ে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে বেশি আলোচনা করে।

রিজার্ভ। ভয়ঙ্কর চাপা মেয়ে অরুণা।

এমনিতে সুশী ঝোঁকের মাথায় ঝপাঝপ নিজের সম্বন্ধে অনেকটা বলে ফেলেছে। অবিশ্যি তেমন কিছুই নয়। একটি গরীব বিধবা টিচারের চাকরি যাবে কমিটির বিচারে, এমন সে কিছুই করেনি অতীত জীবনে।

জীবনের অতীত।

কোন্ মিস্ট্রেসটির না ছিল, কার না আছে।

কিন্তু অরুণা নিজের সম্বন্ধে স্তব্ধ।

আজ অবধি কোন কথাই বার করতে পারলে না সুশী। অরুণা বলল না, বলবে না।

অথচ ঘুরে ফিরে আসছে সুশীর গল্পে।

যেন এই দিয়ে সখীত্ব বজায় রাখা।

তবু স্বাভাবিক ঠেকত, যদি না ক্ষণে ক্ষণে থেকে থেকে মিস সেন কমিটির মেম্বারদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে এত সন্দিগ্ধ সচকিত প্রশ্ন তুলত। কি শহরের কোনো ভদ্রলোক টিচার্স কোয়ার্টারে এসেছিলেন বা আসতেন তাঁর সম্পর্কে।

'আমি তিনটে শহর ঘুরে এসেছি। আমার চোখে কোন ফাঁকি এড়াতে পারবে না।' যেন অরুণা বলে, বলতে চায় সময় সময় সুশীর চোখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে।

চুপ করে সুশী তখন চোখ ফিরিয়ে নেয়। কি আর বলবে। পদমর্যাদা ও বিদ্যার জোরে এমন কথা তুমি বলতে পার বৈকি—মনে মনে বলে সুশী। 'কিন্তু কেন, কোন্ দুঃখে বিয়ে, সংসার ছেড়ে মাস্টারনির কাজে আয়ুক্ষেপণ। কি উদ্দেশ্য?'

সুশীর এক এক সময় বলতে ইচ্ছা করে, বলে না। কাজ কি। অবশ্য, কমিটি শক্ত। সুশী এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। না, একটি হেডমিস্ট্রেসের কথায় রাতারাতি নতুন কোন নিয়ম এখানে প্রবর্তন হবে, তা নয়।

তবু সুশী কথাটা চেপে গেছল।

আজ বলে নয়, চিরদিন, অন্তত শিক্ষয়িত্রীদের তেমন বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ না থাক, ছুটি-ছাটায়, অবসর সময়ে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এই কোয়ার্টারে এসেছেন, আসেন, ওর মার আমাল থেকে দেখে আসছে সুশীলা। শহরের জল-হাওয়ার সঙ্গে এই রীতি মিশে গেছে।

অরুণার চোখে এটা খারাপ ঠেকল।

ওর পক্ষে এটা ভাল হচ্ছে কি, ভাবল সুশীলা, বরং উল্টো ফল দাঁড়াচ্ছে। শহরের স্কুলে, কলেজে, লাইব্রেরীতে, আদালতে, হাসপাতালে, বাজারে, মাঠে, রাস্তায়, ছেলে ও মেয়েদের আড্ডায় কেবল এই রব।

মেয়েটা অহঙ্কারী। একটু দেখতে ভাল তাই কি। না বিদ্যায় দেমাক।

সেদিন কোন মোক্তারবাবুর চিঠিতে নাকি মিস সেন ভুল-ইংরেজি বার করেছিল তিনটে। নলিনী মোক্তার বুড়ো আঙুল তুলে নাকি কাছারীতে বলছিল, 'রেখে দিক ইংরেজি বানান, অই ইংরেজিতে হাকিম কাঁপে তো কোথাকার না কোথাকার হেডমাস্টারনী। লাল পেন্সিলের দাগ মেরেছেন উনি 'মেয়ের কনেদেখা ছুটির' দরখাস্তের তলায়।

আরে নগদ আড়াই হাজার খরচা করে ইঞ্জিনীয়ার পাত্র বাগিয়েছি। তোর বিদ্যা তুই গাছপালাকে শেখা।

আমার মেয়ে ঘর করতে চলল নবদিল্লী। গরমকালে যাবে দার্জ্জিলিং। তিনটে চাকর, দুটো অর্দালি।

তোর মতন শুট্‌কীর কাছে কে পাঠাচ্ছে আর মেয়ে। তুই এখন মেয়ের বাপের ইংরেজির ভুল ধরবি না তো করবি কি, খেয়ে-দেয়ে আর কাজ আছে কিছু।

নলিনী কাছারীতে কমলা মাসীকে শুনিয়ে দিয়েছিল, 'গার্জিয়ানদের সঙ্গে ওসব বাজে ইয়ার্কি যেন না করে নয়া হেডমিস্ট্রেস, পাব্লিক পিছনে লাগলে ওঁর চাকরি যাবে। উপোস থাকবেন। মেয়েছেলের অত ট্যাণ্ডট্যাণ্ডানি ভাল না।'

মাসী গিয়েছিল চাঁদা আদায় করতে রিলিফের। শুনে এসেছে।

প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে নিন্দাবাদগুলিও এসে শুনিয়ে যায় কমলা খাস্তগীর। বেশ বর্ণনা করে। সেদিন নাকি ক্লাবে রীতিমত বৈঠক বসেছিল এইখুনিয়ে। নলিনী মোক্তার শহরের অনেক কিছু নেড়ে চেড়ে খায়। বৈঠক ডেকেছিল নলিনী বিচারের জন্যে। সরবে ঘটনাটা পেশ করেছিল শহরের মুরুব্বীদের দরবারে।

অটলবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

আর ছিল যোগীন ডাক্তার। চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী,

সাবরেজিস্ট্রার মুরারী হাজরা, উকিল রাধানাথ, অধ্যাপক নিকুঞ্জবাবু ও হোমিওপ্যাথ হীরালাল রক্ষিত।

'তাঁদের যুক্তি তাঁরা যা-ই দেখান, আমরা চাই অন্য রকম।' মোহিনীবাবুর গলা শোনা যাচ্ছিল।

অটলবাবু নাকি হেডমিস্ট্রেসের পক্ষ নিয়ে কি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন, চেয়ারম্যান টেবিলে চড় মেরে অটলবাবুকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। আজকাল অটলবাবুর কোন 'ভয়েস' নেই।

আর দেখাও গেল শেষ পর্যন্ত নলিনীরই জয় হল। একলা অটলবাবু ছাড়া সভাস্থ সকলে শিক্ষয়িত্রীর অন্যায় ধরেছিলেন।

'সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করা তাঁর অভ্যাস নেই বলেই তিনি সাধারণের সেন্টিমেণ্ট বুঝলেন না। তাই এমন মোটা কাজটি করলেন। কাঁচা কাজ।' সাবরেজিস্ট্রার দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন সভায় অরুণার ব্যবহারে। তিনি এটা আশা করেন নি।

রাধানাথ উকিল বলছিল, 'তাঁর কাজ মেয়েদের পড়ানো, একজন রেসপেক্টেবল জেণ্টেলম্যানের ভুল-ইংরাজি খুঁচিয়ে বার করা নয়।'

মিশনারী সাহেব ধর্মপ্রচার করেন। কে পাপ কাজ করল, কে না করল, তা খুঁচিয়ে বার করা তাঁর কর্ম নয়।

সবাই যখন চটছিল, একলা যোগীন ডাক্তার হেসে বলছিল, 'অরুণা যদি বাইরে আসা-যাওয়া করতেন, গার্জিয়ানদের সঙ্গে বেশ একটু যোগাযোগ রাখতেন তো এই অপ্রীতিকর ব্যাপারই হয়তো ঘটত না। নলিনীবাবুর মেয়েকে দেখতে আসছে, সামাজিক অঙ্গ হিসাবে হেড মিস্ট্রেসের তো তা জানাই থাকত, ফর্ম্যাল একটা সিগ্‌ন্যেচার দিয়ে দরখাস্ত গ্র্যাণ্ট করে দিতেন। ওটা কি আর তাঁকে পড়ে দেখতে হ'ত। না ভাবার ভুল চোখে ঠেকত।'

ডাক্তারের মধ্যস্থতার ফলে মামলার সেখানেই নিষ্পত্তি হয় বটে। কমলা সুশীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলছিল সেদিন। এমনটি কি এর আগে হয়নি, খুব হয়েছে। কুমুদিনী সরকার, মানে অরুণার আগে যে হেডমিস্ট্রেস ছিল, জেলার বাবুর এক চিঠিতে নাকি এক ডজন ভুল-ইংরাজি বার করেছিল। কিন্তু তাতে কি হৃদয় দস্তিদার চটেছিল। বরং খুশি হয়ে কুমুদিনীকে জেলখানার বাগানের তিনটে বড় বাঁধা-কপি উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিল কনস্টেবলের হাতে। কারণ কি। হৃদয়বাবু খবর না দিতে কুমুদিনী দিদি ছুটে গেছে জেলারের কোয়ার্টারে। ভালয়-মন্দয় খোঁজখবর নিয়েছে। সদ্ভাব ছিল। কেবল কি জেলার। যোগাযোগ রাখত কুমুদিনী শহরের মাথাগুলোর সঙ্গে। 'নলিনী চটবে না তো কি। অহংকারে দেবী ফাটো-ফাটো, তার ওপর এমন কাজ—চাকরি যায়নি এই বেশি। পাব্লিকের মেয়ে পড়িয়ে তোমার অন্নসংস্থান। পাব্লিককে চটিয়ে এক সন্ধ্যা এখানে টিকবে নাকি।'

অর্থাৎ, কমলা খাস্তগীরের ভাষায় অরুণার এই 'কাঠ-কাঠ' ভাবই নাকি ওর সর্বনাশের কারণ হবে।

তারপর অবশ্য এরকম কাজ অরুণা আর করেনি। কিন্তু তাহলেও নতুন হেডমিস্ট্রেসের ওপর শহরবাসী সন্তুষ্ট নয়। সুশী পাঁচজনের পাঁচ রকম মন্তব্য শুনছে। এই শহরে ওর জন্ম ও কর্ম। শহরের পুরুষ-মন সুশীর চেয়ে অরুণার তো আর ভাল জানবার কথা নয়। সুশী চাইছে একটু মেলামেশা। কাল একরকম জোর করে সে অরুণাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল রেস্টুরেন্টে। এ ধরণের অপ্রীতিকর ব্যাপার যত কম ঘটে, যোগীনবাবু, মুরারীবাবুরা তা-ই চাইছেন। তাই তাঁরা আগের চেয়ে এখানে একটু বেশি আসা-যাওয়া করছেন। কমিটির বাইরের দু'-একজনকেও সঙ্গে নিয়ে আসছেন। যেমন আজ সকালে। অথচ অরুণা

যদি এসব না বোঝে তো সুশী করবে কি। তেমনি 'কাঠ-কাঠ' ভাব। পঙ্কজবাবু তিনবার একটা কথা জিজ্ঞেস করার পর অরুণা কথা বলল। ভদ্রলোক কি ভাবলেন।

না, হেডমিস্ট্রেসের এই প্রকৃতিটা সুশীর মোটেই ভাল লাগছে না। চুপচাপ, চাপা—সারাটা সকাল কাটিয়েছে প্রফেসার পাড়ার ছোট মেয়েগুলোকে নিয়ে। রবিবাবুর নাটক করাচ্ছেন মেয়েদের দিয়ে। কিন্তু তাতে কি মুরুব্বীদের মন ভেজে।

ভাগ্যিস ক'খানা অতিরিক্ত চায়ের কাপ রেখেছিল সুশী নিজের ঘরে।

তিনবার সুশী নিজে গিয়ে ডাকবার পর তবে অরুণা এলো আতাতলা ছেড়ে। যেন ভীষণ অনিচ্ছা। যেন অভ্যাগতদের চেয়ে ওর 'ডাকঘরের' মহড়া বড়।

হ্যাঁ, কথা তো সেখানেই। হেডমিস্ট্রেস। পদে বড়। তাই মুখের ওপর সুশী কিছু বলতে পারে না। বলবেও না। বরং এখন ও ভাবছিল নিজের সম্পর্কে এতগুলো কথা অরুণাকে না বলাই উচিত ছিল। বলা যায় না—বলা কি যায় কার মনে কি আছে। বলা যায় কি—হয়তো হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, কি সন্ধ্যার পরেই খেয়ালের বশে নিশানাথ বেড়াতে এল এখানে—অরুণা যে তখন লম্বা এক রিপোর্ট খিঁচে দেবে না সুশীর বিরুদ্ধে তারই বা নিশ্চয়তা কি। অবশ্য এটা কোনদিন হবে না। সুশী আশাও করে না—কিন্তু তবু, তবু তো—নিশানাথ না আসুক, পঙ্কজ গুপ্ত, হীরেন পালিত—এঁরা যদি···

'হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেলে যে?'

'কই, না তো।' বুদ্ধিমতী সুশী হেডমিস্ট্রেসের প্রশ্নে চমকে না উঠে মুখখানাকে চট করে বেশ হাসি-হাসি করে ফেললে। 'ভাবছিলাম। এখন এই রৌদ্রে আবার বুঝি বেরোতে হল।'

'যাচ্ছ নাকি কোথাও?'

সুশী মাথা নাড়ল।

'তবে?' ভুরু তুলল অরুণা আনত সুশীর দিকে চেয়ে। 'কি ব্যাপার?'

ছড়ানো কাপ-ডিসগুলো সুশী একটা-একটা করে গুছোয় মুখে শব্দ নেই।

বাইরে দেবদারুর গুঁড়ির কাছে চুপ করে একটা ছাগল-ছানা শুয়ে। একটা শালিক উড়ছে ছাগল-ছানার মাথার ওপর। হঠাৎ শুকনো পাতার ঘূর্ণী উঠল চকিত হাওয়ায়। সুশী চোখ তুলল।

'আমার এবেলার সাবান নেই গায়ে মাখার।'

'তা তুমি আমায়ও তো বলতে পার।' অরুণা ভুরু নামায়। যদি কিছুর দরকার হয়, আমার থাকে, আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিই।'

সুশী কথা বললে না। অরুণা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় পায়চারী করল একটুক্ষণ। অর্থাৎ অরুণা এটা পছন্দ করে না, এখন এই অবেলায় সুশী বাইরে যাক।

আর যা-ই হোক, অরুণা ডিসেন্সি নষ্ট হতে দিতে রাজী নয়।

হ্যাঁ, এটা টিচার্স কোয়ার্টার।

শহর যতই আধুনিক হোক, এখানকার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়মকানুনগুলো যাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয়, সেইটাই সে চাইছে।

কাপ-ডিসগুলো তুলে সুশীলা স'রে পড়ল।

সুশী গম্ভীর। অরুণা টের পেল।

অর্থাৎ বাইরের লোকজন আসায় অরুণা বিরক্ত বুঝতে পেরে সুশী নিজের গল্পটি বলাও বন্ধ করল। থেমে গেল। কিন্তু এর সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি। তোমার জীবন আর বাইরের জীবন? ভাবতে ভাবতে

অরুণা স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে আমি হেডমিস্ট্রেস ছিলাম কি?' যেন প্রশ্ন করল অরুণা অনুপস্থিত সুমীকে। 'যেখানে তুমি শূন্য, ব্যর্থ, নিঃসঙ্গ,—অনুতাপের সলতে হয়ে ধিকিধিকি জেগে আছে এই ভাঙা টিনের ঘরে। গরীব তো বটেই নইলে আর খেটে খাওয়া কেন। আমি কান পেতে শুনতাম, শুনছিলাম তোমার কান্না, স্বপ্ন, ভুল। কিন্তু এক জায়গায় আমাকে নিয়মতান্ত্রিক হতে হবে, দেখতে হবে ডিসিপ্লিন,—যেন অরুণা এবার নিজের মনে বলল, দরকার হয় আমায় এখানে কড়া হতে হবে,—কঠিন। হ্যাঁ, তোমার বয়সের আর একটি মেয়ে, আমারও শিক্ষয়িত্রী জীবন। বলতে বলতে, ভাবতে ভাবতে অরুণা নিজের দিকে তাকাল। তিনটি সহর ঘুরে এসেছে ও।

সুমী স্নানের ঘরে ঢুকেছে অরুণা টের পেল। জলের ছপ্‌ছপ শব্দের সঙ্গে সাবানের গন্ধ ভেসে আসছিল। হ্যাঁ, অরুণার ভিনোলিয়া কেক্।

গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইছিল সুমী স্নানের ঘরে।

তামাটে রুক্ষ মধ্যাহ্ন-আকাশের দিকে তাকিয়ে অরুণা চুপ করে রইল।

ছুটির দিন সকালে সবচেয়ে বেশি সেজেগুজে যাবে ডাক্তার-গিন্নী, হ্যাঁ চেরীর মা, নিহারনলিনী।

ডাক্তার তো আর বাড়িতে বসে থাকে না। ডাক্তারের ছুটি অ-ছুটি নেই। সবদিনই বাইরে ছুটছে।

আর ডাক্তারের খোঁজে যতজন আসেন ডিস্‌পেনসারীর বড় টেবিলের চারিদিকে ভিড় ক'রে বসেন তাঁরা নীহারকে ঘিরে। পলিটিক্‌স নিয়ে পড়ে থাকলে তো হয় না, পসারও দেখতে হয়। যেন এই অজুহাতে

ডাক্তারের অনুপস্থিতি মার্জনা ক'রে শহরের মন্তগণ্যরা ছুটির সকালে ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতি, সমাজনীতি ও স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

তা ছাড়া যোগীনবাবু আছেন একেবারে শহরের মাঝখানে। আর তাতে যোগীন-গিন্নী হলেন মধুরভাষিণী, হাস্তময়ী, সত্যিকারের সুরুচি-সম্পন্না প্রিয়দর্শিনী মহিলা।

যেন এইজন্যেই আরো বিশেষ ক'রে রোজ রোববার ডাক্তার সেনের ডিস্‌পেনসারীতে এসে জমকালোরকম ভিড় জমান সম্ভ্রান্ত পৌরজনেরা। আসেন পোস্টমাস্টারবাবু, ছোট দারোগা, নাজীর সারদা রাহা, বরদা উকিল, সাব-রেজিস্ট্রারবাবু, তৃতীয় মুন্সেফ হেম লাহা, ইন্সপেক্টারবাবু এবং আরো অনেকে।

চেরীর মা তাতে গর্ববোধ করে বৈকি।

একটা সভ্য শহরের মধ্যমণি হয়ে আছে ও, বলা যায়। নিশ্চিয়ই, স্টাইলবোধ আছে তার, চমৎকার হিউমার জ্ঞান। নীহার বাক্‌নিপুণা, বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মপটিয়সী তো বটেই।

ডাক্তারের মিসেস সর্বগুণসম্পন্না। সবাই বলছে।

সত্যিকারের আধুনিক মহিলা বলতে যা বোঝায় তাই হ'ল চেরীর মা। শহরে প্রবল জনশ্রুতি।

আর নীহার এসব মেয়েকে বোঝায়।

চেরী কতটা বুঝল কি শিখল সে সম্বন্ধে নীহার যদিও অতিমাত্রায় সচেতন, তবু যতটা সম্ভব ব'লে ব'লে ঘসে ঘসে দেখিয়ে শুনিয়ে অন্তত চলনসইরকমও ওকে দাঁড় করাতে পারে কিনা, নীহারের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না।

'কত দ্রুত, কত তাড়াতাড়ি আমি বদ্‌লে গেলাম। সবাই বলছে।

আর আজ, এখন পর্যন্ত, শহরের অত্যন্ত সাধারণ হালচালই তুমি আয়ত্ত করতে পারলে না।'

হ্যাঁ, নীহার মেয়েকে ধমক দেয়, বড়ো হয়েছ, আজও যদি অষ্টপ্রহর খেতে-বসতে চলতে ফিরতে মাকে মেয়ের পিছনে লেগে থাকতে হয় তো বিপদের কথা। নীহার নিজের কাজ করে কখন। ধৈর্যের বাঁধ এক এক সময় ভেঙে পড়ে তার।

বেজায় রুষ্ট হয়েছিল ও আজ চেরীর ওপর। অর্থাৎ সকাল হ'তে ডাক্তারকে চা খাইয়ে বিদায় করে দিয়ে নীহার যখন স্নানের ঘরে ঢুকছিল তখন ও বল্‌তে গিছল মেয়েকে রাত্রের কাপড়জামা ছেড়ে ডাইংক্লিনিং থেকে ধুয়ে আসা হল্‌দে মীর্জাপুরী শাড়িখানা এবং চলিপীস্‌এর ব্লাউজটা যেন পরে নেয়।

মেয়ে মিশনারী স্কুলে পড়ে। গির্জাঘরে সান্‌ডে ক্লাসে যোগ দেওয়ার যে বিশেষ পক্ষপাতী নীহার তা নয়।

এবং তাতে চেরীরও উৎসাহ নেই।

'তার চেয়ে ছুটির সকালটায় ও বাড়িতে থাকুক।' নীহার ডাক্তারকে বুঝিয়েছে। 'এঁ ওঁ আসেন। চা করা আছে, এটা-ওটা কাজ। একলা আমি পারব কেন। মেয়ে বড়ো হয়েছে, ওর তো এখন এসব শেখা দরকার।'

'নিশ্চয়।' যোগীন ডাক্তার জোরে মাথা নেড়েছে। 'খৃষ্টান-পাড়ার চেয়ে বাঙালীপাড়া অগ্রসর বেশি হয়েছে। চাল-চলনে কি ঠাট-ঠমকে।'

অর্থাৎ নীহারকে সাজতে দেখেই যেন ডাক্তার একটা চিম্‌টি কাটল।

নীহার চুপ ক'রে ছিল।

অর্থাৎ ইদানীং নীহারের স্বাস্থ্যটা একটু বেশি ভালর দিকে যাওয়ায় এবং ও রোজ অন্তত ছুটির সকালবেলাটায় অতিরিক্ত সাজ-গোজ ক'রে থাকার দরুণ ডাক্তারের মনে যেন একটু ঈর্ষা জাগ্‌ছিল।

টের পেয়েও নীহার কিছু বলে না।

কেন না তাতে লাভ হবে না কিছুই। ভাবে নীহার, এই বাঙালী পাড়াতেই তোমাকে থাকতে হবে,—এই সমাজের গায়েই ছুঁচ ফুঁড়ে তুমি পয়সা কামাবে। যখনকার যা।

খৃষ্টান-পাড়ার মায়ায় এখন আর পাহাড়ের ঢেঁকুর তুলে লাভ কি। মনে মনে বলে নীহার, 'একটা বুড়ো কার্টারের গায়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে ক'পয়সা আর পকেটে আসতো।'

অর্থাৎ এই সমাজের এতটুকু নিন্দা আর এখন নীহারের সয়না। এখানে এসেই তুমি সম্মান পাচ্ছ। একটা ক্লাবের সেক্রেটারী হয়েছ, খেলায়, মিটিংএ, মেয়েদের সভায়, ছেলেদের জলসায়, ছোট বড় সকল আড্ডায় মাতব্বরী করছ,—আজ তোমার বাড়িতে এঁদের আগমনে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন। নীহার আরও বলে, তুমি যেমন সামাজিক হতে চাইছ, —রাতদিন সোশ্যাল হবার জন্যে চোখে ঘুম নেই, তেমনি তাঁদেরও ইচ্ছা ডাক্তার-গিন্নীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখা, দেখা-সাক্ষাৎ করা। এটাই সভ্যতার লক্ষণ। সুতরাং আমায়ও সেজেগুজে এদের অভ্যর্থনার জন্যে তৈরী থাকতে হয়।

আর বাড়িতে বয়স্কা কুমারী মেয়ে থাকলে তাকেও মার সঙ্গে সঙ্গে সাজতে হয়। টেবিলে উপস্থিত থেকে চা চিনির তদ্বির করতে হয়, দুকথা বলতে হয়, গান গাইতে হয়। তা মেয়ে তো তোমার কথা কওয়া কি গান গাওয়া আর শিখবে না, সুতরাং—

অবশ্য নীহার এ নিয়ে একেবারেই কথা কাটাকাটি করতে চায় না স্বামীর সঙ্গে। কেননা ডাক্তার একটুখানি চিমটি কাটার পর সেই যে চা-এর বাটিতে মুখ লুকিয়েছিল সেদিন আর মাথা তোলেনি। কথা বলতে গেলে বেরোতে দেরী হবে সেজন্যে কি। এসব ব্যাপারে কথা কওয়াই

মানে নীহারকে চটানো, আর তার অসুখটি ফিরিয়ে আনা। তার চেয়ে, তার চেয়ে বরং, শুভক্ষণে—ডাক্তার এই ভাবছিল, আর কোনরকমে চা-এর পাত্রটি শেষ ক'রে সোলার হ্যাটটি হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। রোগী দেখা তো আছেই, অমুক ক্লাবের আজ আবার একটা ফাংশন। আজই কাদের এগজিবিশন-এর ওপেনিং ডে। দেরী হয়ে গেল কি?' যেন নীহারকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ডাক্তার চৌকাঠ ডিঙোবার সময় স্ত্রীর দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসেছিল। 'না দেরী আর কি, মোটে তো ছ'টা কুড়ি।' গম্ভীর হয়ে নীহার উত্তর করেছিল, 'এইবেলা বেরিয়ে পড়। পাংচুয়েলী পৌঁছুবে।'

অর্থাৎ বাড়ি থেকে ডাক্তার যত শীগগীর বেরোয় তত ভাল। বাইরেই তো ও থাকবে। চিরকাল বাইরে কাটিয়েছে। ভাবছিল নীহার।

হ্যাঁ, সেই পাহাড়ের যুগ থেকে।

বাড়ির বাইরেটা যেমন সামলায় ডাক্তার তেমনি ভিতরটা আগলায় নীহার। আগলে এসেছে। হ্যাঁ, সেই চা-বাগানের আমলেও।

অর্থাৎ বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে চোখ মেলে যখন দেখনি তো এখন আর চোখ ঘোরাচ্ছ কেন, এদিকে। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর নীহার স্বামীকে প্রশ্ন করে। যেন নীহার অনুপস্থিত স্বামীর সঙ্গে কথা কয় বিড় বিড় করে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রসাধনরতা নীহার সেযুগ এবং এযুগের তুলনামূলক সমালোচনা করে নিজের মনে।

তখন জীবন ছিল অনেক বেশি সরল। সহজ।

তখন কালেভদ্রে আধ-বুড়ো মাথা পাগলাটে কার্টার ছাড়া আর কে এসেছে বাড়িতে। সৌজন্য। জঙ্গলের ক্লার্কবাবু ও গুদামবাবু আড্ডা মারবে দূরে থাক, চলে গেছে শাবল হাতে মাটির নীচের আলু তুলতে আর একটি জঙ্গলে।

ছুটির সারাটা সকাল নীহার একলা বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চুপচাপ শুয়ে থেকে শুকনো জলপাই-পাতারা খসে খসে পড়ছে দেখত, আর নীহারের কোলে এসে পড়তো যতগুলো শুকনো পাতা নীহার একটি একটি ক'রে গুণত। তখন চেরী যত ছোট ছিল এখন তার চেয়ে ঢের বেশি বেড়েছে, এই পাঁচ বছরে।

হ্যাঁ, তখনকার চেয়ে এখনকার বাড়ির ভিতরের সমস্যা বেড়েছে ছাড়া কমেনি।

চেরী এখনও বেড়ার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার ক্ষতিপূরণ করতে হয় নীহারকে।

কেননা এখন এখানে চুপ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকলে চলে না। অবশ্য চেয়ারেই বসে থাকে নীহার।

এখন ছুটির সকালে শুকনো জলপাই-পাতার পরিবর্তে সরস প্রফুল্ল জেন্টলম্যানদের অভ্যর্থনা করতে হয়। হ্যাঁ, আধুনিক শহরের এক অতি-আধুনিক ডাক্তার-গৃহিণী নীহাররলিনী।

বেশ সহজেই এই শহরের আধুনিক মনের চাবিকাঠিটি হাত করেছে ও।

'নিশ্চয়, তুমি সিরিঞ্জ হাতে ডাক্তারি করছ। দিনের শেষে মনিব্যাগ ভর্তি টাকা আনছ। কিন্তু কার জন্যে, কিসে এমন হ'ল পাঁচ বছর না পূরতে।' দুই হাত ভরে পাউডার নিয়ে গলায় মাখতে মাখতে নীহার স্বামীকে প্রশ্ন করে আয়নার মধ্যে। প্রতিবিম্বিত নীহার উত্তর করে, 'এখান থেকেই উকিলবাবুরা প্রেরণা পাচ্ছেন, অন্দরে অসুখ হওয়া মাত্র যোগীন ডাক্তারকে কল্ দেওয়া উচিত। মুন্সেফপাড়া থেকে রোজ জোর তলব আসছে যোগীনবাবুর।'

আমলা পাড়ায়। দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রফেসার পাড়ায়। শহরের মধ্যবিত্ত বাবু বাঙালী সমাজে সর্বত্র।

'আমার গুণে।' নীহার বলে।

কেননা এঁদের সকলকে মিষ্টি হেসে চা খাইয়ে প্রীত করে রাখছে ও রোজ।

ঘরে অসুখ হওয়ামাত্র যোগীন ডাক্তার ছাড়া কে আর তাঁদের ডাক্তার আছে এখন নিজেদের। নীহার নিজে পপুলার হয়ে ডাক্তারকে পপুলার করে দিলে। এবং এই গৌরবে, ডাক্তারের চিম্‌টি কাটা সত্ত্বেও, নীহার গদ্‌গদ্ হয়ে সেদিন সকালবেলা অর্থাৎ এক রবিবার ছুটির সকালে নিজের ছোট্ট কেলিকো রুমালে আধশিশি লেভেণ্ডার ঢেলেছিল।

হ্যাঁ, ঐ দিয়ে ও ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীর আইডিন আর লাইজোলের উগ্র গন্ধটা ঢেকে রাখে। ডাক্তারের বাড়িতে পা দিয়েই রুগী কি তার আত্মীয়স্বজনেরা উঁচানো ছুঁচ দেখতে চায় না। দেখে ফুল আছে কিনা, বাগান, ফার্নিচারের বহর কেমন, ডাক্তারের আদালী-পেয়াদা ক'টা, দিশি কুকুর কি বিলাতী। আর, ডাক্তার-গিন্নী দেখতে কেমন। কি তাঁর সাজ কেমন ব্যবহার। অন্ধ কুলি নয়। শহুরে সমালোচকের চোখ।

তবু নীহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আপ্-টু-ডেট্ সবকিছু হয়েও ও পুরোপুরি আপ্-টু-ডেট্ হ'তে পারল না। আর, চেরী যদি এমন না হয়ে একটু অন্যরকম হ'ত। একটু চালাকচতুর, করিৎকর্মা।

এদিনে উপযুক্ত স্ত্রী ও একটি উপযুক্ত কন্যা বর্তমানে পুরুষ সংসারে দশজনের একজন হয়ে ওঠেনি এই দৃষ্টান্ত যে-কোনো আধুনিক সমাজে বিরল।

সংসারটা আরো উঠত, আরো তুলে ধরত নীহার যদি চেরীর একটু পরিবর্তন হ'ত। সকালে বৈঠকখানায় পার্টি বসলে টেবিলে চা-এর কাপ এগিয়ে দিতে তো আর নীহার মেয়েকে ডাকে না। ডাকবে না কোনোদিন।

চাকর ভোলাকে দিয়েই নীহার সব ব্যানেজ ক'রে নেয়। এই ইজি-চেয়ারে বসেই নীহার কল টেপে। কলের মত সব কাজ সম্পন্ন হয় ঘরের। এক চুল এদিক ওদিক হয় না।

যে জন্যে নতুন দারোগা হিমাংশু ব্যানার্জি সেদিন বলছিল, 'মিসেস সেনকে দেখলে ঈর্ষা হয়, তার চেয়েও বেশি তাঁর সাজানো গুছানো ঘর।'

'পাকা গিন্নী, ডাক্তারের মিসেস পাকা মেয়ে।' বুড়ো সাব-রেজিস্ট্রার সকলের আগে উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়। 'প্রথম দিনই দেখে বুঝেছিলাম। **An intelligent woman.'**

নাজীর সারদা রাহা রসিক ব্যক্তি। 'মিসেস সেন যখন অই ইজি-চেয়ারে বসে চাকরটাকে অর্ডার করেন, সত্যি, বলব কি, আমার মনে পড়ে যায় কুইন এলিজাবেথের কথা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কথা।' কথার শেষে সারদা হাসে।

'কেন, আমি কি রাজ্য চালাচ্ছি নাকি।' নীহারও হেসে উত্তর দিয়েছিল।

'না, তেমনি মহিমান্বিতা।' উকিল বরদা তালুকদার বুঝিয়েছিলেন, 'ভূদেববাবুর প্রবন্ধের একটা উক্তি মনে পড়ে গেল। 'যিনি একই সঙ্গে বিবি এবং বাঁদী সাজিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গৃহিণী।' হেসে তালুক-দার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাকিয়ে দেখছিলেন নীহারের নিখুঁত সাজসজ্জা, ঘরের উজ্জ্বল শ্রী। আর নীহার চুপ ক'রে ছিল।

'বলতে কি, মিসেস সেন, আপনার এখানে এলে ছুটির সকালটা এমন অদ্ভুদ আনন্দে কাটে।' এখানকার নতুন ট্রেজারার অনাদি পুরকায়স্থ প্রশংসা করছিল সেদিন নীহারের বারান্দার, বাগানের, তার গায়ের সুন্দর ব্লাউজের, কচি-পাতা-রং চায়ের পেয়ালাগুলোর, সর্বোপরি নীহারনলিনীর হাতের তৈরী চা, মনোমুগ্ধকর হাসি ও বুদ্ধিমার্জিত ভাষণের।

কিন্তু এত প্রশংসা পেয়েও নীহার মূক হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে একটা ক্ষত চর্‌চর্‌ করে।

আরো পাওয়া উচিত ছিল, আরো হওয়া। নীহার ভাবে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চেরীর দিকে চেয়ে।

মাংসের পুতুল।

রক্তমাংসের একটা ডল্‌ ছাড়া আর কি তুমি সংজ্ঞা দিতে পার ওর।

অবশ্য, বাড়িতে ঢুকবার সময়, কি যখন বেরোয় অভ্যাগতরা আড়-চোখে চেরীকে যে না দেখে তা নয়। ঐ পর্যন্ত।

মেয়ে সম্পর্কে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই চায়ের টেবিলে। কেননা, সামাজিকতার একটি তৃণখণ্ডও আঁকড়ে ধরতে পারল না যে-মেয়ে আধুনিক সমাজ তাকে অনুকম্পার চোখে দেখবে না তো কি। বেশ টের পায় নীহার। আর তার বুকের ভিতর হু হু করে।

এতবড় মেয়ে।

এই বয়সের একটি মেয়ে ঘরে থাকলে সংসার ঝলমলিয়ে ওঠতে কতক্ষণ, ক'দিন বা লাগে। নীহার কি জানে না মোক্তার মোহিনী কি ছিল। সাব-রেজিস্ট্রারের মুখে সে সব শুনেছে। 'দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল নন্দী।' সাব-রেজিস্ট্রার সেদিন বলছিল, 'মেয়ের জোরে, লিলিটা বেজায় তুখোর। বলতে কি এবারের ইলেক্‌শনে মোহিনী জিতেছে লিলিটা ডাইনীর মত খেটেছিল বলে। শহরের সব ক'টি চাই মেয়ের হাতের মুঠোর মধ্যে। এস ডি ও থেকে আরম্ভ করে বাজারের বিপিন পাল অবধি। হাঁ, সমিতি দিয়েই ও বাজি মাৎ করেছে, তুখোড় মেয়ে।'

সে কথাটাই নীহার থেকে থেকে ভাবে।

মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্‌শনে ডাক্তারও তো এবার দাঁড়িয়েছিল। মোহিনীর চেয়ে যোগীন সেন শহরে কম পপুলার কি। তবু হয়নি কেন, কিসে আটকাল।

যাক্‌গে নীহার হাল ছাড়েনি।

মেয়ের দৌলতে মোহিনী মোক্তারের ল্যাজ মোটা হয়েছে। নীহারের চা-এর আড্ডায় সব উপস্থিত, এক চেয়ারম্যান ছাড়া। সে জন্যে নীহার থোড়াই মাথা ঘামায়। সে হবে, মেয়ে না থাকুক, নীহার তুলে ধরবে ডাক্তারের সংসার, ডাক্তারকে। তুলছে আস্তে আস্তে।

অবশ্য এ জন্যে নীহার লিলি মেয়েটার সঙ্গে মনে মনে শত্রুতা করছে, তা নয়।

বাপ সম্পর্কে ওর মনোভাব যাই থাক, মেয়েটা বাস্তবিকই ভাল, দেখতে এবং বুদ্ধিতে। নীহার স্বীকার করে।

হ্যাঁ, বলা যায়, আজকালকার চলার উপযোগী মেয়ে। নিখুঁত।

কী ধার, কী দীপ্তি!

কালকের মত এত কাছে নীহার মোহিনীবাবুর মেয়েকে আর দেখেনি।

এদিকে বড় একটা ও থাকে কই। আছে সারাদিন পুলিশ সাহেবের বাংলোয়, হাকিম-পাড়ায়। ওর বন্ধু-বান্ধব ওপাড়াতেই বেশি। সেখানেই কাজ।

হ্যাঁ, মেয়ে সত্যি স্টাইল জানে।

আর যা-ই দেখুক, এমন সুন্দর বেণী বাঁধতে নীহার আর কোনো মেয়েকে দেখেনি। আর এমন বুদ্ধি-ঝলমলে, টিপটাপ কথা, হাসি, ওঠা, বসা। একটি কুমারী বটে তো। এ মেয়ে ঘরে থাকলে কী না করা যায়, দিগ্বিজয় হয়। নীহার অনুভব করে মেয়ে জীবনের আশ্চর্য

স্তিমিত প্রচ্ছন্ন এক শক্তি নিজের মধ্যে,—কেননা চেষ্টা এখন হল না বলেই তার বুকের ভিতরটা অত বেশি খাঁ খাঁ করে রাতদিন।

এই শহরে নীহার শীর্ষস্থান অধিকার করত। মোহিনী আর কত বেড়েছে, কত বড়লোক হয়েছে। মোটা-বুদ্ধি। মাঝে মাঝে যখন কোর্টে যায়, এ রাস্তায় ওর নতুন-কেনা কালো রঙের টমটম্ হাকিয়ে, অথবা বলা যায় পাড়ার লোকজনকে দেখিয়ে যে নতুন পয়সা হয়েছে বা হচ্ছে যাদের তাদের মধ্যে মোহিনীই প্রথম ঘোড়ার গাড়ি কিনল এবং এই অহঙ্কার নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর জানালা থেকে, যখন ও এদিকে তাকায় তখন নীহারের কেন জানি মনে মনে বেশ রাগ হয়, আবার হাসিও পায়। অর্থাৎ লোকটার চেহেরায় যেন কোথায় বোকামি মেশানো আছে। আকারে বড় বুদ্ধি কম এবং স্বাস্থ্যেও তিনি বেশ অগ্রসর হয়েছেন। ডাক্তারের কাছে নীহার শুনেছে ব্লাডে চিনির হাই পার্সেণ্টেজ।

অর্থাৎ হুট করে একদিন টেঁসে যাবে। তাই মোক্তারের উত্থানকে নীহার অনুকম্পা মনে করে। বেশি আমল দেয় না। তার চেয়ে সে অনেক বেশি শক্তি ও তারুণ্য নিজের মধ্যে তো বটেই, এমন কি ডাক্তারের মধ্যেও অনুভব করে, করছে।

আরো হয়ে ওঠার, অগ্রসর হবার সম্ভাবনা। মোহিনী মোক্তারের চেয়ে ডাক্তার যোগীন সেনের মধ্যে এখনো অনেক বেশি সঞ্চিত ও নিহিত বুদ্ধি তো বটেই, এ দিনে আয়ুটা কম বড় কথা কি। স্বাস্থ্য।

জীবনের রেসে এর দামই বরং এখন বেশি। একদিন বেশি বাঁচলে আর একটু করে গেলাম। আর একটি আশা পূরল।

কাল লিলিকে দেখে সেই সব শক্তি, তেজ ও তারুণ্য, সাহস ও স্পর্ধা নীহার নিজের মধ্যে বড় বেশি অনুভব করছিল।

ডাক্তার তো আছেই, স্ত্রী হিসাবে নীহার রয়েছে ঘরে।

হ্যাঁ সমিতি করুক, আর যাই করুক, মা হিসাবে, মহিলা হিসাবে, আধুনিক শহরের এক ডাক্তারের প্রগতিসম্পন্না সহধর্মিণীরূপে এখানে এই ইজিচেয়ারে বসেই যতটুকু করার নীহার করবে, করছে। মেয়েদের মত অত বাইরে ছুটোছুটি করা তার মানায় না এবং নীহার নিজেও সেটা চায় না।

না,—তার যদি লিলির মত একটি মেয়ে থাকত।

যদি চেরী না থাকত। নীহারের গর্ভে—নীহার সে সব দুঃখ কাহিনী চেপে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে যদিও। তার বিষণ্ণতা আর ম্রিয়মাণতা ও বুঝতে দেয় না অথিতিরা সামনে থাকেন যতক্ষণ।

নীহার অজস্র হাসে, অজস্র কথা কয়।

আজ সকালে আবহাওয়াটা ভারি চমৎকার ছিল। কাল রাত্রে, শেষ রাত্রের দিকে এক পশলা হয়ে গেছে। ধুলোর একটা লাল আস্তরণ পড়েছিল পি ডব্লিউ ডি'র পিলার ঘেঁষা বাদাম গাছের পাতায়। নতুন বৃষ্টি লেগে সব এখন আবার চিক্‌চিক্ করছে! ঝক্‌ঝকে রোদ উঠেছে সোনালী হলুদ। কি একটা পাখী শিস্ দিচ্ছে।

বেশ শান্তমনে হৃষ্টমনে ডাক্তারকে চা খাইয়ে বিদেয় করে দিয়ে সাবানের বাক্স ও টাওয়েল হাতে নীহার স্নানের ঘরে চলছিল। হ্যাঁ, চেরীকে বলে যাওয়া, নতুন শাড়ী ও ব্লাউজটা চট্ করে পরে নেয় যেন ও। এখুনি লোকজন আসতে শুরু করবে। ছ'টা পঁয়তাল্লিশ। গ্রীষ্মের সকাল। আবার একটা ছুটির সকালের শুরু।

ছুটির সকালের আমেজ ও স্নিগ্ধতা নিয়েই বাথরুমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল নীহার। চেরীর কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়াল।

অর্থাৎ এই বয়সেও চেরী মাঝে মাঝে এমন এক কাণ্ড করে। প্রায় শক্ লাগার মত।

নীহার ভয়ঙ্কর শক্ত হ'ল।

আঁকশী হাতে মেহেদীর আগা ছাঁটতে লেগেছে খোঁড়া, চেরী দিব্যি ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এই বেশে, এই সময়ে।

'মোটে তো পৌনে সাতটা।'

চেরী প্রতিবাদ করতে গিছল, নীহার ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল মেয়েকে।

'সাতটা আটটা বুঝি না। সময়মত,—ঘড়ির কাঁটা ধরে, তুমি সব কাজ করবে, এটাই আমি আশা করছি। যখনকার যা।' নীহার আবার ছেলেটার দিকে তাকাল কটমট করে।

'আমি ছিনেমার টিকিট বেচি, আমি খারাপ লোক না মা।'

শুনে নীহার শান্ত হল তবু, একটু আশান্বিত। 'তোর নাম কি?'

'রাসু।'

'শহুরে কাটছাট আছে, একেবারে জংলী না।' নীহার ভেবেছিল বাগানের কুলী। ছেলেটার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নীহারের গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

শেয়ালের মত হাত, পা, চোখ, মুখ।

'তুমি আর একটু সরে দাঁড়াও চেরী।'

মেহেদীর গা ঘেঁসে দাঁড়ানো চেরীর দিকে তাকাল নীহারনলিনী।

তারপর নীহার ঘাড় ফেরাল খোঁড়ার দিকে।

'সেলুনে চুল ছেঁটে এসেছিস মনে হয়, এমনি তো খুব বাবুয়ানা শিখেছিস।'

ঠাট্টা হলেও এটা প্রকারান্তরে প্রশংসা, ডাক্তার-গিন্নী যে খুব বেশি অপছন্দ করছেন রাসুকে, রাসুর তা মনে হল না। সাহস পেয়ে একটা খুঁটির গায়ে আঁকশীটা আটকে রেখে রাসু এবার সোজা হয়ে

দাঁড়াল এবং ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর চোখে চোখে তাকাল। অল্প অল্প হাসি ঠোঁটে।

নীহার লক্ষ্য করল একেবারে ছেলে-ছোকরা, কি রীতিমত যুবা। থুঁতনির আশেপাশে ও ওপরে অসুস্থ অসংলগ্ন দাঁড়ির মাথা উঁকি দিয়ে আছে, যেন যৌবন আসতে না আসতে চাপা পড়ে গেছে, থেমে আছে. অভাবে, অত্যাচারে।

নোংরা দাঁত বার করে রাসু হাসছে।

'হাসছিস যে?' নীহার ভ্রূকুটি করল। 'হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি।'

এটাও গিন্নীমার ঠিক ধমক হ'ল না, ধমকের একটু সুড়সুড়ি, আসলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকায় উনি বিশেষ চটেননি, যেন টের পেয়ে রাসু ঠিক তাকিয়েই রইল। অল্প অল্প হাসি ঠোঁটে।

'আমার মত চেহারা আর দেখিসনি নাকি টাউনে কারোর?' কেন জানি, নীহার হয়ত নিজেও বুঝল না, প্রশ্ন করে বসল ঝুপ করে।

মুখে নয়, যেন গলা থেকে হাসি বার করল রাসু, শরীরটাকে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে।

'মনের কথা কইলে চটবেন ঠাকুরাণ।'

'কি আবার তোর মনের কথা আছে, শুনি না?' শহুরে খোঁড়ার রসিকতা শুনবার জন্যে নীহারের যেন বেশ আগ্রহ দেখা দিল, বেড়ার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়।

'ছিনেমার চন্দ্রাবতীর মতন সুন্দর লাইগছে গিন্নীমারে দেখতে।' বলে রাসু নীচের ঘাসের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে।

নীহার চটে না, বরং বেশ কৌতুক বোধ করে। শহরের সাধারণ একটা মজুর সিনেমা অ্যাক্ট্রেসের নাম মুখস্থ করে ফেলেছে।

'আর কার বই দেখলি? আরো দু'এক জনের নাম বল্‌না শুনি। খুব লায়েক হয়েছিস।'

'চিট্‌নীশ, কানন, কেশরবাঈ, বেগমপারা।' গর্‌গর্‌ করে বলল রাসু। আর নোংরা দাঁতে হাসল।

আর নীহার আড়চোখে দেখল একবার মেয়েকে। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'মেনকা-মিনারে' আজ অবধি যতগুলি নতুন বই দেখানো হয়েছে নীহার কোনটা বাদ দেয়নি। সব ক'টা চেরীকে দেখিয়ে এনেছে। এবং প্রত্যেকটি ছবির বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম ছবি দেখার সময়, এমন কি বাড়িতে এসেও, ও চেরীকে একবার নয় দশবার করে বলেছে, বলছে। একটি নাম যদি মেয়ে আজ অবধি মনে রাখত। এমন মাথা। নীহারের দুঃখ কি কম। নীহারের—

'যাও, চট্‌ করে কাপড় পড়ে এসোগে।' রুষ্ট গলায় নীহার মেয়েকে বলল, 'সাতটা বাজে, খেয়াল রেখো?'

চেরী চলে গেল ভিতরে।

জলজলে চোখে রাসু মেয়েকে দেখা শেষ করে মার মুখের দিকে তাকাল।

'থাকিস্‌ কোথায়?'

'গুদাম ঘরের পিছনডায়।'

'তবে তো তুই পাড়ার লোক।' নীহার আরো বেশি নিশ্চিন্ত হ'ল; 'ভাল করে ছেঁটে দে সব মেহেদীর আগা। ক'দিনের চুক্তি?'

'তিন রুজ। তিন দুপুরে বেবাক্‌ সাফ্‌ কইর‍্যা ফালামু।' রাসু আঁকশী হাতে নিল।

যন্ত্রটা গাছের মাথায় ঠোকাবার আগে ও খুপ্‌ করে আবার হাসল।

'হাসছিস যে?' নীহার ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফিরে এল। এল খোঁড়ার সামনে।

'আবার কিছু মনে পড়ল নাকি?'

'না।' থুথু ফেলার জন্যে রাসু মুখ ফেরায় সদর রাস্তার দিকে। যেন মুখ ফিরিয়ে ভাবল বেশি হাস্যালাপে না ডাক্তার-গিন্নী চটে যায়। আজ এই পর্যন্ত। এবার কাজের কথায় ফিরে আসা যাক।

'কাইল্ এই বেড়ার মধ্যে অতবড় শিয়াল ঢুকছিল মা'ঠান।'

'মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী।'

নীহার রাগ করতে গিয়েও হাসল। কেননা সহরের মাঝখানে চারিদিক এমন ফিটফাট পাকা:পোক্ত ছিমছাম্ যেখানটা সেখানে—

'তা ঢুকুক, বন্দুক আছে।' নীহার স্পষ্ট গলায় শুনিয়ে দিলে।

রাসু চুপ। হঠাৎ বন্দুকের কথা শুনলে কার না বুকের মধ্যে দুম্ করে ওঠে।

কথাটা বলে নীহারও চুপ।

বলতে কি, ও হাসল বটে, কিন্তু বুকের ভিতর শিরশির করে উঠল। কুকুর, বেড়াল, শিয়াল। যেন কতকাল পর, কতদিন পর একটা কথা মনে পড়তে পড়তেও নীহারের মনের মধ্যে তা মজে গেল, অর্থাৎ নীহারই চাপ দিয়ে থামিয়ে দিলে, যেমন করে ও ডাক্তারের ডিসপেন্সারীর লাই-জলের ঝাঁঝ কি আইডিনের গন্ধটা রুখতে মাঝে মাঝে নাকের উপর চেপে ধরে ওর ইভিনং-ইন্-প্যারিস ঢালা সুরম্য সিল্কের রুমালখানা। শহরের পরিষ্কার ঝলমলে আকাশের দিকে চেয়ে নীহার হাসল। 'বাজে গল্প রেখে দে, এখন কাজের কথা বল্।'

চতুর রাসু কাজের কথায় ফিরে আসতে বিলম্ব করল না। চেরী সেজেগুজে এসে গেছে, টিপটাপ, সুন্দর খাঁটি শহুরে মেয়ে। এবং

মাজা-ঘসা পরিষ্কার শহুরে গলায় রাসু বলল, 'বেবাক্ মেয়েছেলের ছবি আছে যা'ঠান, ছিনেমা-ঘরের বারিন্দায়। বড় বড় ফটু।'

'থাকবেই তো, ওরা সব আর্টিস্টের ফটোই টাঙিয়ে রাখে হল্এর বারান্দায়।' যেন নীহার অন্ধকার দেখতে দেখতে আলো দেখল। 'আজ ছুটির সকাল। যাও না, সিনেমা হলের বারান্দায় গিয়ে ঘুরেটুরে একটু ছবিগুলো অমনি দেখে এসো না। বাইরে যেতে-টেতে হয়। বাইরে না গেলে চোখ ফোটে না, এটা শহর।' নীহার চেরীর চোখে চোখে তাকাল।

'আমি পারমু। আমি চিনি সব। চিনাইয়্যা দিমু দিদিমণিরে বেবাক্ এক্ট্রেসের মুখ!'

'তোকে দু'আনা বকশিস্ দোব।' খুশি গলায় নীহার বলল, 'যা না, এখুনি যা। বেড়া পরে এসে ছাটাবি। আমি বলছি।'

'মাঠারাণের এখন সিনেমার বেগমপারার মত লাগছে।'

'তা লাগুক। ওকে শেখা, ওর কাছে বল্ সব নাম। আমি জানি।' নীহার খোঁড়ার হাস্যালাপে আবার খুব কৌতুক বোধ করল, পুলকিত হল। তারপর কড়া চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'যাও, যেটা জান না ওর কাছে শিখে যাও। হতে পারে ও দিন-মজুর, কিন্তু তাতে লজ্জা নেই, মানুষ শিখতে পারে সবার কাছেই।'

রাসু হঠাৎ মনোযোগী হয়ে তেল্চিটে খাকি শার্টটা গায়ে চড়ায়। নীহারের চোখে পড়ে না, নীহার মনোযোগ দিয়ে দেখছিল দল বেঁধে দূরে হিমাংশুবাবুরা আসছেন, এসে গেছেন রাস্তার এপারে।

স্নানের তাড়া নিয়ে নীহার বারান্দা ঘুরে বাথরুমের দিকে যায়।

বুকে টিবিটিবি নিয়ে চেরী খোঁড়ার পিছু পিছু বেড়া পার হয়ে বাইরে গেল।

'তুমি একটু বাইরে ঘুরে এলে পারতে।'

'কি রকম ?'

পাইচারী করছিল পপি। নিরঞ্জনের ইজিচেয়ারের সামনে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

নিপাড় মুগা রং একটা শাড়ি পরনে। গায়ে শাদা ব্লাউজ। যেন চুলে তেল দেওয়া হয়নি, কি সাবান ঘসার দরুণ লালচে রং ধরে ঘাড়ে কপালে এসে উড়ু উড়ু করছে। অনেক সময় মেয়েদের এই শুকনো এলো চুল দুঃখের চিহ্ন।

একঝাঁক চুল কপালের ওপর থেকে বাহাতে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে পপি বলল, 'এক কোলকাতায় ছাড়া, মফঃস্বলে এসে, তুমি সঙ্গে না থাকলে ওর সঙ্গে আমি বাইরে গেছি, কোনদিন দেখেছ ?' পপি ভ্রূকুটি করল। 'তোমার ব্যাঙ্কের কাজে গেছে ও গ্রামে। আমি সঙ্গে যাব কোন্ দুঃখে।'

নিরঞ্জন চোখ নামাল।

এবং পপির গলা আরও একটু চড়ল। 'আমি ভাবতেই পারি না, আমি এক এক সময় ভাবি, কি করে তুমি এই কুৎসিত ঠাট্টাগুলো কর আমাকে নিয়ে, ওকে নিয়ে। এই বিশ্রী সন্দেহগুলো তোমার মনে কেন আসে জানি না।'

নিরঞ্জন চুপ।

'এবং এই রোগ তোমার ক্রমশই বাড়ছে।' রাগ করে ফের পাইচারী আরম্ভ করল পপি। 'এটা হেলদি সাইন্ নয়, যে কোনো এনালিষ্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পার।'

পপি আর দাঁড়াল না, পর্দা ঠেলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ চেয়ে রইল বাগানের দিকে। ইমামবক্স

ফুল গাছের গুঁড়ির আগাছা উপড়ে ফেলছে নিড়ানি দিয়ে। একটু দূরে ঝুমকো লতার জাফ্রির গায়ে দু'টো শালিক কিচিরমিচির করছে। নিদাঘের উত্তপ্ত দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ চারিদিকে। কি একটু ভেবে পপি আবার এল ফিরে ঘরে।

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তোমায়?' পপির ঠোঁট কাঁপছিল তখনও।

'বলো।' বীয়ারের গ্লাশ ঠোঁট থেকে আলগা করে নিরঞ্জন স্ত্রীর চোখে চোখে তাকাল।

'এখানে এসে ওটার বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?' টেবিলের দিকে পপির আঙুল। নিরঞ্জনও চুপ।

'অবিশ্যি, তোমার টাকা। বলবার কিছু নেই। যা করে ইচ্ছা খরচ করতে পার, যতখুশি।' লালচে চুলের গোছা কানের ওপিঠে ঠেলে দিয়ে পপি আবার পাইচারী শুরু করল।

'তবে মনে রেখো, অত্যধিক ড্রিঙ্ক করার পরিণামটাও খুব সুবিধার নয়।' পপি হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'লিভার কেটে মারা যাব।' আর এক ঢোক গিলে নিরঞ্জন স্ত্রীর কথা সমর্থন করল।

'লিভার না-ও ফাটতে পারে।' অল্প মাথা নেড়ে পপি গম্ভীর গলায় বলল, 'পচা লিভার নিয়ে ক্যানসারে ভোগে কেউ কেউ বেশ কিছুদিন। মরে যে যায় সে তো রক্ষাই পায়।'

নিরঞ্জন আর কথা কইল না। একটু পরে পাইচারী থামিয়ে পপি আবার এসে দাঁড়াল স্বামীর চেয়ারের সামনে। এবার আর তভটা রাগ নেই। বরং চোখে সহাস্য প্রশ্ন। ঠোঁটে কৌতুকের ধার।

'আচ্ছা, ধরা যাক লিভার কেটেই হঠাৎ তুমি মরবে,—আফশোষ হয়না সেজন্যে ?'

কথাধা ঠিক ধরতে না পেরে নিরঞ্জন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'মাথায় ঢুকল না বুঝি ?' পপি ঠোঁট মোচড়ায়।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' নিরঞ্জন হাসল।

'কোন্ কথাই বা তুমি একবারে বুঝতে পার, এমন মোটা বুদ্ধি।' সিলিংএর দিকে চোখ রেখে পপি গলার অস্ফুট শব্দ করল। তারপর স্বামীর চোখে চোখ রেখে স্বচ্ছ গলায় জানাল, 'বলছিলাম, অগাধ সম্পত্তি তো তোমার, ভোগ করবার জন্যে রেখে যাচ্ছ কাকে ? যদি হঠাৎ মরে যাও ?'

চমকে উঠতে উঠতেও নিরঞ্জন স্থির হয়ে গেল: 'ও, সে কথা।' গ্লাশটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সে সিগারেটের টিনের দিকে হাত বাড়ায়।

'মিথ্যা বলছি কি ?' পপির প্রশ্ন।

'সত্যটা একটু সকাল সকাল বলা হল না কি ?' বলতে গিছল নিরঞ্জন, স্ত্রী থামিয়ে দিলে। 'আজ যা সত্য, কালও তা সত্য থাকবে, দশ বছর পরও এর ব্যতিক্রম ঘটবে বলে তুমি আশা করছ নাকি, আশাবাদী বটে।' বলতে বলতে গ্রীবার অদ্ভুত ভঙ্গি করে অনুচ্চ হাসির রেশ তুলে পপি আবার পর্দার ওপারে চলে গেল। হা করে নিরঞ্জন চেয়ে রইল।

নিরঞ্জন সবই বুঝল।

'তাইত। আশা। কার আশা, কিসের আশা, কেন আশা।' নিঃশেষিত গ্লাশের তলায় তিনটে বুদ্বুদ্ পরস্পর গা জড়াজড়ি করে ফুলের মত ফুলে ওঠে পরমুহূর্তে ফুটুস্ করে মিলিয়ে গেল। নিরঞ্জন নিজের মনের কথা বলল। সিগারেট ধরাতে যাবে সে, পপি আবার এল ঘরে। তেমনি হাসিহাসি চোখ। ঠোঁটে ধার।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রাগ করবে ?'

'আমি তোমার কথায় রাগ করেছি কোনোদিন, দেখেছ ?' নিরঞ্জন হাসতে চেষ্টা করল।

'না, তুমি শিব।' চোখের নিমেষে পপির চেহারা আবার বদলে যায়। টের পায় নিরঞ্জন। অর্থাৎ রাগারাগির ব্যাপারে কে অগ্রণী এবং একবার ওর রাগ হলে তার মাত্রা কতটা চড়ে যায় বুঝতে না পারার মত নাবালিকা পপিরাণী নিজেও নয়। যেন বুঝেই জানালার বাইরে তাকাতে গিছল নিরঞ্জন।

'বেশ।' খুশি গলায়, রাগ করতে করতেও সামলে উঠে পপি বলল, 'তবে কথার উত্তর দাও। আমি তো জানি, যদ্দুর শুনি মানুষ যখন ড্রিঙ্কফিঙ্ক করে তখন আর একটা নেশার জন্যেও ভিতরে ভিতরে নাকি ভয়ানক ছটফট করে, সত্যি কি ? বল না ?' পপি সত্যি হাসছিল।

'কি রকম ?'

'উঃ, যদি একটু সুখ থাকত তোমার সঙ্গে কথা কয়ে, এক বিন্দু আরাম।' যন্ত্রণাসূচক শব্দ করল পপি মুখের।

রাগ করে ও বাইরে চলে গেল না যদিও। চেয়ারের হাতল ঘেঁসে দাঁড়াল। শক্ত হয়ে দাঁড়াল। মুখটা নুয়ানো, মাথাটা নামানো। কানের হীরা দুটো আর একজোড়া চোখের মত জ্বলছে। 'বল না ?' পপি প্রশ্ন করল।

মেয়েদের হাসি ও রাগের পার্থক্য বোঝা কঠিন। তবু আন্দাজে ঢিল মেরে, হঠাৎ গম্ভীর না হয়ে হেসে হেসেই বলল নিরঞ্জন, 'কে বললে তোমায়, শুনি না ? কার কাছে শুনলে ?'

'আশ্চর্য লোক তুমি। বোর্, এ রেগুলার বোর্। হাসিও না।' চাপা শুকনো একটা নিঃশ্বাস ফেলেই পপি সোজা হয়ে গেল।

'ইন্টারেস্টিং কোনো কথা তুললেও তুমি এর মর্যাদা রাখ না। কোনোদিনই রাখছ না। বা-রে!'

নিরঞ্জন চুপ। পপি হাঁটতে আরম্ভ করল।

'বল না শুনি?' পাইচারী করতে করতে ও আবার এল স্বামীর চেয়ারের সামনে। 'এটা নিশ্চয়ই জানতে বাকি থাকে না', যেন পপি ঠাণ্ডা গলায় বোঝাল, 'টাকা যত বেশি হাতে আসছে তত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে তোমার মর্জির এবং মেজাজের। স্বাভাবিক। কিন্তু সেজন্যে কি, আমি আপত্তি করছি না বলেছি কখনো, আমার কি, এই যে তুমি বসে বসে টানছ—কেন বলতে যাব, আমার টাকায় কি আর হচ্ছে ওসব। অর্থাৎ ওরকম এক-আধটু ইচ্ছা হওয়া বড়লোকদের খুবই স্বাভাবিক। বা শুনি।' বলতে বলতে পপি ঘুরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

নিরঞ্জন চুপ।

ঘরের ভিতর কি একটা পোকা খুট খুট করে কাঠের ওপর মাথা ঠুকছিল। সেই শব্দ ছাড়া কতক্ষণ আর কোন শব্দ ছিল না।

বাইরে বাগানে ইমামবক্স ঘাস কাটছে। তার শব্দ শোনা গেল। আর পপির হাতের দুটি মাত্র চুড়ির লঘু নিক্কণ। পপি হাত উঠিয়েছে কি হাত নামিয়েছে। নিরঞ্জন সেদিকে তাকাল না।

বেশ হেসে হেসেই গ্লাশের দিকে চোখ রেখে, ধীর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এমন ভাল ভাল কটা জিনিস নিশানাথ যখন এখানে জোগাড় করতেই পারল তো আমার বসে বসে সেগুলোর সদ্গতি করতে দোষ কি।'

'ঐ তো বলবে।' পপি মুখ ঘোরাল। 'আশ্চর্য, কি করে যে তুমি লোকের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পার।'

পপি গলায় একটা সুন্দর শব্দ করল স্নেহের।

'তুমি টাকা দিয়েছ বলেই ও জোগাড় করেছে। করতে পেরেছে। নাবালক নয় তো। আর, তা ছাড়া,—'

লাল চুল দুলিয়ে ঝলমল করে রীতিমত গা ঝাড়া দিয়ে উঠল পপি, 'যেন ছেলেমানুষকে বোঝাচ্ছ, নিশানাথ জোগাড় করেছে এই শহরে এমন ভাল ভাল জিনিস, আর সেই উল্লাসে তুমি খাচ্ছ। এটাকে অজুহাত দেয়া বলে।' পপি পাইচারী করতে করতে দূরে সরে যায়। 'হতে পারে গরীবের ছেলে, তোমার কর্মচারী। কিন্তু কি ক্ষমতা ছিল ওর তোমার টাকা না পেলে, এসব জোগাড় করে ? কি গরজই বা ছিল—' স্বর পরিবর্তন করে পপি হঠাৎ স্থির হয়ে গেল।

'এটাও শহর। ছোট জায়গা বলে কি আর এসবের অভাব হয়।'

যেন নিজের মনে পপি বেশ আস্তে আস্তে কড়া কথাগুলো বলল, 'তুমি তো ভাবছ একলা তুমিই ব্ল্যাকমার্কেট করে পয়সা করেছ, আর বড়লোক নেই পৃথিবীতে।'

'এই শহরে আরো বড়লোক বাস করে নিশ্চয়ই, না হলে ওরা বাজারে এমন ভাল ভাল দামী জিনিস সাজিয়ে রাখবে কেন।' বলে পপি সোজা পর্দার বাইরে চলে গেল।

নিরঞ্জনের পয়সা সম্পর্কে যখনই কোনো কথা ওঠে পপি বেশ সতর্ক ভাবে 'ব্ল্যাকমার্কেট' কথাটা জুড়ে দেয়। এখানেও এটা ঠিক টেনে আনল। নিরঞ্জনের এই অর্থের ওপর পপির শ্রদ্ধা নেই। পপির এটাই চরম বক্তব্য। অর্থই জীবনের সব নয়।

'অর্থ দিয়ে রূপ রস প্রাণ কেনা যায় না।' স্ত্রীর উদাস গলা নিরঞ্জন রাত-দিন শুনছে। আবার শুনল। আর তা ছাড়া, তা ছাড়াও এখন নিশ্চয়—চিন্তায় ছেদ পড়ে নিরঞ্জনের।

একটা আইভি পাতা হাতে নিয়ে পপি আবার ঘরে ঢুকছে। পাতাটা

নোখ দিয়ে চিরতে চিরতে বলল, 'থাকগে ওসব বাজে কথা। ঠাট্টা করছিলাম। আসলেও তুমি বড়লোক কিনা, বড়লোকদের ওরকম ইচ্ছা —বিশেষ করে ইয়ের যখন অভাব হয়—'

পপি থামল।

ঠিক চমকাল না নিরঞ্জন। বরং লঘু দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের ওপর ফেলে হাসল, 'কিসের অভাব ?'

'ওই তো দোষ তোমার, সাধে কি বলি' নিমেষেই বিরক্ত হয় পপি। আস্তে আস্তে আয়নার দিকে সরে গিয়ে বলল, 'এখানে চালাকি করে লাভ কি। যা ফ্যাক্ট। মনকে চোখ ঠেরে তুমিও একথা বোঝাতে পারছ না, আমি তো না-ই। হ্যাঁ, অভাব, অসুখী তো দুজন নিশ্চয়ই। তার ক্ষতিপূরণের জন্য তুমি যদি এখন—'

'তাই বলো।' যেন এতক্ষণ পর বুঝল নিরঞ্জন। হাসির ধমকে সোজা হয়ে বসল। 'তাই বলো। নাও আই আণ্ডারস্টাণ্ড ইউ—' সিগারেটের আগুণ ঝরল কাপড়ের ওপর, নিরঞ্জন খেয়াল করল না। 'কিন্তু আমায় কি বলতে পার, পপি, অভাববোধে গরীবরা কি করে, গরীবের তো টাকা নেই ?'

'আত্মহত্যা করে, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়—' পপি না থেমে উত্তর করল।

'আর ?' অদ্ভুত গলায় শব্দ করল নিরঞ্জন। 'আর কি করে ?' সে জানে না।

'নিশ্চয়ই স্ক্যাণ্ডেল করে না, যা তোমরা করছ, করে এসেছ বড়লোক ছেলেরা, টাকা, গাড়ি, বাড়ির মালিক হয়ে—'

এই আর একটা অভিমান পপির। সূক্ষ্ম অর্থে বড়লোক ছেলেদের ওপর ওর আন্তরিক বিদ্বেষ।

কোলকাতায় ভবানীপুর পপির মামাবাড়ি, ও নিজে গড়পাড়ের মেয়ে। গরীবের মেয়েই একরকম বলা চলে। কিন্তু অর্থ দেখে, নিরঞ্জন রায়ের অঢেল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে শুনে পপির একটুও শিরঘূর্ণন হয়নি। কথাটা ও বিয়ের রাত্রেই বলেছিল স্বামীকে—নিরঞ্জন রায়ের উঁচু হাতীর দাঁতের পাড় লাগানো নতুন মেহ্‌গিনি খাটের উপর বসে। অর্থের চকমকি দিয়ে কোনো পুরুষ একটি মেয়ের মন খুশি রাখবে যদি বাসনা করে তো সে ভুল। নিতান্তই ভ্রান্ত।

বলেছিল পপি আলস্য-জড়ানো চোখে।

একটি মেয়েকে বিয়ের রাত্রেই বলে দেওয়া যায় কেমন, যেন কে এক বন্ধু বলছিল নিরঞ্জনকে কবে, তখনো বুঝি সে বিয়ে করবে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।

অথচ বিয়ের রাত্রে, নববধূর মুখোমুখি ব'সে নিরঞ্জন বেমালুম ভুলে ছিল সেসব কথা।

হ্যাঁ, এখন যেমন সিগারেট পুড়ছে সেই রাত্রেও তার হাতে সিগারেট জ্বলছিল। একটার পর একটা।

নিরঞ্জন দুই চোখ বিস্ফারিত, মুখের হাসি বিস্তৃততর করে শুনছিল কথা। জীবনে সে এত সামনা-সামনি হয়ে বসেনি কারোর, কোনো মেয়ের। নারী সম্পর্কে বরাবর ও কেমন ঘুমন্ত ছিল।

'অর্থ সুখের জন্যে। শান্তির জন্যে কি। শান্তির সঙ্গে টাকা পয়সার সম্পর্ক নেই।'

যেন খুব বুদ্ধিমানের মত নিরঞ্জন আস্তে আস্তে হেসে উত্তর দিয়েছিল।

চারদিকে তাকিয়ে পপি চুপ ক'রে ছিল।

'সেজন্যে বলছি না।'

যেন ঠিক কি জন্যে, কিসের দিকে পপির মৌন দৃষ্টি নিক্ষেপ নিরঞ্জন তখন ধরতে পারেনি।

এখন বুঝছে।

তখন, সেই বাসর জাগার রাত্রে বসন্তের নতুন মুকুলিতা এক বধূকেই সে চোখ ভরে দেখছিল। কথায় মন ছিল না।

কে জানে সেদিন পপি যা বলেছে তা যে চিরদিনের মতো সত্যি করে ওর বলা হয়ে গেছে ধারণা ছিল না নিরঞ্জনের।

'উঃ, কি অদ্ভুত সব চরিত্র তোমাদের বনেদী ভবানীপুরেরর গাড়িওয়ালা সব ছেলের। বাড়িওয়ালা সব বরদের।'

'কি রকম?' হরষিত চোখে গদ্‌গদ গলায় নিরঞ্জন প্রশ্ন ক'রেছিল। 'কি শুনলে?'

'তোমাদের এখানকার কে এক পরিতোষ লাহিড়ী নাকি বিয়ের দশ বারো দিন পর নিজের অফিসের এক টাইপিস্ট মেয়েকে বিয়ে ক'রে পুরোনো বৌয়ের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছিল?'

'আমি জানি না, শুনিনি।' নিরঞ্জন স্বচ্ছ হেসে পপির হাল্কা হাত নিজের রোমশ মোটা আঙুলের মধ্যে নিবিড় অনুরাগে চেপে ধরেছিল।

আস্তে আস্তে সেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাই তুলে পপি বলেছিল, 'ভবানীপুরে আমার মামাবাড়ি, বেড়াতে এসে বহুরকম গল্প শুনে গেছি এই অঞ্চলের।'

নিরঞ্জন চুপ ছিল।

গড়পাড়ের ক্লার্ক গোকুলবাবুর মেয়ে যে অর্থের ওপর আজন্ম বিদ্বেষ নিয়ে নিরঞ্জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা সুন্দর দুধের মত ধবধবে পাথরের বাড়িতে ঢুকেছে তা সে জানত না,—অন্তত সেই রাত্রে সে টের পায়নি।

শুধু পপির মিষ্টি মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হেসে বলেছিল, 'কি জানি, কারোর প্রাইভেট্ লাইফ সম্পর্কে আমার তেমন কৌতূহল নেই, আমি জানতে চাইওনি।'

'তবে কি নিয়ে বেঁচে আছ।' হেসেছিল পপি। আর হেসে স্ত্রীর রুষ্ট ভুরুর দিকে তাকিয়ে নিরঞ্জন প্রথমটা যেন কৌতুক বোধই করেছিল। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে।

'এখানকার এক অলক ব্যানার্জি বৌকে জোর ক'রে বার-এ টেনে নিয়ে গিছল। খবর রাখ?'

'তাই নাকি?' অপলক চোখে নিরঞ্জন তাকিয়েছিল পপির ধারালো মুখের দিকে। 'তারপর?' নিরঞ্জনের চোখে কৌতূহল।......

'তার আর পর কি।' পপি অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল, 'বাড়ি ফিরে বাথরুমে ঢুকে সেই রাত্রেই মঞ্জুলিকা গলায় দড়ি দেয়।'

নিরঞ্জন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। হ্যাঁ, ফাল্গুন মাস। ফাল্গুনের শেষ সেটা তখন। মৃদুমন্দ হাওয়া দুধের সরের মতন মশারির চাঁদোয়াটা কাঁপছিল এক একবার। কখনো বা নিরঞ্জনের গরদের কোঁচা, পপির বেনারসীর অঞ্চল। আর সারা ঘরে ভুরভুর করছিল রজনীগন্ধা অগরুর বাস। চুপ করে থাকলেও নিরঞ্জন চোখ ফেরাতে পারছিল না।

শঙ্খের মত সুবলিত ঘাড়।' চন্দনচর্চিত মুখ, ঝক্‌ঝকে চোখ কাজল-টানা। বাসঘরের ব্রীড়ামুখী হয়ে ব'সে থাকবে না এ যুগের একটি মেয়ে নিরঞ্জন জানত যদিও। পপি সেভাবে ছিলও না। কেবল নিরঞ্জন জানত না মামাবাড়ি বেড়াতে এসে এই মেয়ে এত কথা শুনে গেছে, আর বিয়ের রাত থেকেই মন খারাপ ক'রে বসে আছে।

'এ পাড়ার কোন খোঁজই আমি রাখিনি।' কতক্ষণ পর সরল স্বীকারুক্তির মত যেন শোনাচ্ছিল নিরঞ্জনের গলা। 'চারিদিকের ব্যবসা

বাণিজ্য নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত ছিলাম, সত্যি বলতে কি, বাড়িতে দুপুর-বেলা আমি দু'মাসের মধ্যেও একদিন এসে ভাত খেতে পারিনি—তাই নিয়ে আত্মীয়স্বজন—'

'ওসব কথা আমায় শুনিয়ে আর হবে কি। এতটা বয়েস যদি বিয়ে না ক'রে ছিলে হঠাৎ এখন—'

অবশ্য কথার শেষে পপি একরত্তি হেসেছিল। আর কথার মোড় ঘুরিয়ে তখুনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে উদাসস্বরে বলছিল, 'সারা জীবন চোখকান বুজে কেবল টাকাই জমিয়েছ, সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখনি।'

'দরকার পড়েনি।'

'বেশ মানুষ।' অল্প মাথা নেড়ে নিজের মনে পপি বিড়বিড় করে পরে খাটের এক প্রান্তে কাত হয়ে শুয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'অদৃষ্টে কি আছে জানি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল নবপরিণীতা।

অদৃষ্টে কি ছিল নিরঞ্জনই কি জানত ?

না, আর সাহস পায়নি। খাটের অন্য প্রান্তে নির্জীব হয়ে চুপচাপ সে ব'সে ছিল, একটু একটু ক'রে শেষ হয়ে গেছে বাসর রাত।

না, সাহস পায়নি নিরঞ্জন আর একবার পাপির পালকের মত নরম হাত নিজের মুঠোতে টেনে নিতে। যদিও লোভ হয়েছিল প্রচুর।

তারপরদিন থেকে তো দৈনন্দিন জীবনই শুরু হল।

হ্যাঁ, তারপর থেকে একটু একটু ক'রে সেই লোভ অন্য দিকে চালনা করছে নিরঞ্জন। চেষ্টা ক'রে।

করেছেই তো।

তাই এখন, আজ, প্রকাশ্য দিবালোকে তিক্ততম একটা ওষুধ গেলার মত মুখ বিকৃত ক'রে গ্লাশের শেষটুকু শেষ ক'রে নিরঞ্জন রুমাল দিয়ে

মুখ মুছল আর বলল, 'ইচ্ছা হয় বৈকি।' কথার শেষে হাসল যদিও।

নিরঞ্জনকে ভারি করুণ দেখাচ্ছিল।

পপি মুখ ফেরাল।

'তবে আর চেপে যাচ্ছ কেন।' বলল ও, ব'লে পায়চারী করতে ঘুরে দাঁড়াল, আর সেই অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'পুরী কি শিলংএ থাকতে মন খারাপ হ'লে তুমি বাইরে বার-এ চলে গেছ, এখন ওসব বাড়িতেই আমদানী হচ্ছে। তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম আনুসঙ্গিক বাকিটা বাংলোয় আনছ কবে। ট্র্যাডিশন রাখবে না?'

'নিশানাথ—'

'আবার সেই নাম।' পপির দুই চোখ জলছিল। 'তোমার ইচ্ছা তোমার টাকা। গরীবের ছেলে খেটে খেতে এসেছে। খামোকা ওর দোষ দিয়ে লাভ কি।' কুঞ্চিত ভুরু, রক্তাভ কপোল স্ত্রীর। 'না হয় টাকা দিয়ে নিশানাথ ওসব কিনে এনেছে। কিন্তু আজ সকালে কে এসেছিলেন দিব্যি হেসে চলে কথা বললে, উনিও বললেন?'

'কমলা খাস্তগীর। মহিলা সমিতির চাঁদা চাইছিল।' আস্তে আস্তে উত্তর দিল নিরঞ্জন।

'তাই বলো।' শুনে পপি প্রীত হ'ল। 'ফরোয়ার্ড এ শহরের মেয়েরাও। প্রগতি এসে গেছে। সমিতি টমিতি হয়েছে।' নিরঞ্জন চুপ। দুই চোখে চেষ্টাকৃত হাসির আভা ধরে রেখেছে।

'তা আসুক, আসবেই' পপি হাত দিয়ে চুল ঠিক করল। 'টাকা থাকলেই সমিতির মেয়েরা ভিড় করে বেশি মোটা চাঁদার আশায়। বড় লোকদের মফঃস্বলবাসের সুবিধা এটা, মেয়েদের কাছে তোমরা এক এক-জন ঈশ্বর বিশেষ। কি বলো?'

যেন অনুমোদনের সুরে নিরঞ্জন মোটা গলায় হে হে ক'রে উঠল।

'হাসছ বটে, জিজ্ঞেস করলে পরিষ্কার বলবে নিশানাথের শহর, ওর পরিচিত কেউ,—ও ডেকে এনেছিল বলেই শ্রীমতীর সঙ্গে আমি বিশ্রম্ভালাপে মেতে গেছলাম। কি অজুহাত!'

'আরে না না।' নিরঞ্জন প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়ল। 'এ ব্যাপারে নিশানাথ কি, ও ডাকতে যাবে কেন। খাস্তগীর এসেছিল আপনা থেকে, নিজের গরজে।' যেন পপি শুনল না সেকথা।

'যা স্বভাব। নিজেদের প্রবৃত্তির রং ঢালতে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে তোমাদের জুড়ি নাই। বিশেষ, বিশ্বস্ত কর্মচারী হ'লে তো কথাই নেই।'

'না না, এ ব্যাপারে ওকে জড়াব না।' নিরঞ্জন মোলায়েম ক'রে হাসল।

যেন শেষ পর্যন্ত পপি শুনলই না। 'ভদ্রলোকের ছেলে,' তোমার চাকরি করছে, আর সুযোগ নিয়ে,—আল্‌পিন থেকে আরম্ভ ক'রে দরকার হ'লে সোনার আতাটির জন্যেও ফরমাস দিচ্ছ. তাই বলছিলাম, টাকা থাকলেই একজনকে ইচ্ছার চাকর খাটানো ঠিক নয়—'

শেষ করল না পপি বাক্য।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য হ'ল না নিরঞ্জন।

গরীবের ছেলের জন্যে গরীবের মেয়ের অপার মমত্ব।

বিয়ের আগে কুমারী অবস্থায় বড়লোক-পাড়ায়, মামাবাড়িতে গিয়ে নিরঞ্জনদের কেচ্ছাকাহিনী শুনেই পপির এমন হয়েছে, নিরঞ্জন ভাবে।

সর্বদা পপির সন্দেহ পাছে গরীবের ছেলের নম্রতা, সভ্যতা, কি প্রভুভক্তির সুযোগ নিয়ে নিরঞ্জন কিছু অন্যায় সুবিধা নেয়।

হ্যাঁ, গরীবদের ও ভালবাসে।

হাবেভাবে, চলা-বলায়, কাজে-কর্মে বিয়ের পরদিন থেকে পপি প্রতি মুহূর্তে স্বামীকে বোঝাতে চাইছে মানুষ হিসাবে বিত্তবান একটি পুরুষের চেয়ে হীন অবস্থাসম্পন্ন যে কোন লোক অনেক বেশি মহৎ।

নিরঞ্জন তর্ক করে না।

সত্যি তো, গড়পাড়ের গরীব কেরানী গোকুল দত্ত ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে দীর্ঘ ছ'মাস হাঁটাহাঁটির পর অর্থবান উপযুক্ত জামাতার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ ক'রে সন্তুষ্ট হয়েছিল বলেই যে পপিও আবেগ-আপ্লুত চোখে নিরঞ্জনের গাড়ি বাড়ির দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকবে, তার কি অর্থ আছে। মেয়ের মনের সন্ধান বাপ পায় নি।

বরং নিশানাথের জন্যে তার যত্ন-আদর আপ্যায়ন বেশি।

হ্যাঁ, নিরঞ্জনের দিকে তো সে চোখ বুজে আছেই। থাকবে। পপি এখন মুখ ফুটেই বলছে সে কথা।

খেটেখুটে যখনই নিশানাথ এ বাড়ি আসে, চা-জলখাবারের প্লেট সাজিয়ে পপি প্রস্তুত। চোখে অভিনন্দন, অধরে অনুরাগ।

কর্মচারী ব'লে একজনকে সে ঘৃণা বা অবহেলা করবে, তার মনের কাল্‌চার তা নয়। নিরঞ্জন ভাল ক'রে তা জেনে রাখুক।

নিরঞ্জন জানছে।

কাল্‌চারের চাকচিক্য তথা কর্মচারীর জন্যে মনিব-পত্নীর মমত্ববোধের মাত্রা দিন থেকে দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে নিরঞ্জন চোখের ওপর দেখছে।

পৃথিবীতে এমন কটি মনিবানী আছে যে, রাত আড়াইটে পর্যন্ত নিজে

জেগে দাঁড়িয়ে থেকে উপস্থিত অতিথি কর্মচারীর শয্যা রচনার ব্যবস্থা করবে। এতটা কষ্ট স্বীকার।

পপি নাক ডেকে ঘুমোতে পারত, অর্থাৎ নিরঞ্জন যখন প্রায় আড়াই সের একটা পাখির গরম মাংস উদরসাৎ ক'রে ইজিচেয়ারে পড়ে নাক ডাকছিল।

মনের রুচি সৌন্দর্য্যবোধ সব মাংসের চাপে থেঁৎলে গেছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, সকালে নিশানাথকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেই পপি কথাটা বলছিল।

গ্রীষ্ম—সকাল, তখনো পপির চুল এতটা লাল হয় নি, বারান্দার ও বাগানের রৌদ্রে ঘুরে এতটা ক্লান্ত হয়নি ও।

'তোমায় দেখলেই মনে হয় এমন চর্বি মাংস থলো থলো শরীরে কিছু নেই।' বলছিল ও। ছিপছিপে পাতলা শরীর, হাতে টাট্‌কা লাল একটা গোলাপ ছিল পপির।

'তোমায় দেখলে হঠাৎ মারোয়াড়ী মনে হয়। বড়বাজারের গদিয়ান মেড়ো। টাকার তাল নিয়েই বেঁচে আছো পৃথিবীতে সত্যিকারের বাঁচতে শিখলে না, কি ফাইন মর্নিংটা ছিল একটু আগে।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে পপি সুন্দর করে নিঃশ্বাস ফেলছিল।

সদ্য ঘুমভাঙা মোটা মোটা চোখে নিরঞ্জন যুগপৎ তাকিয়ে দেখছিল পপিকে, আর বাইরেটা।

সকালে, গাঁয়ের দিকে চলে যাওয়া দুদিকে সবুজ ঘাস-গজানো সুড়কি-ঢালা লাল রাস্তাটা নিরঞ্জনের চোখেও অপরূপ ঠেক্‌ছিল।

তারপর নিরঞ্জনের চোখ গেছে শূন্য গ্যারেজের দিকে। নিশানাথ রাত থাকতে উঠে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে গাঁয়ের পথে। সেই পথে বেড়িয়ে এসে ভোরাই হাওয়া খেয়ে তাজা হয়ে পপি এই মাত্র বাঙলোয় ফিরল

এসেই লোভী, অলস, মেদবহুল ধনাঢ্য নিরঞ্জনকে ঠাট্টা করছে। মারোয়াড়ী স্বামীকে। এত বেলা পর্যন্ত যে পুরুষ ঘুমোয়।

পপির শিশির টস্‌টসে কালো চোখ থেকে ঠাট্টা ঝরে পড়ছিল। রাত্রে খাওয়া দেখে যেমন হাসছিল। তখনো পপির মেজাজ ভাল ছিল। বেশ হাসি হাসি ভাব।

তারপর বেলা চড়েছে আর ও আগুন হয়ে গেছে। ছটফট্ করছে।

নিশানাথের সঙ্গে গাঁয়ে বেড়াতে যাবার ইঙ্গিতমাত্র পপি জ্বলে উঠবে নিরঞ্জন জানত।

কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথাও আজ নিরঞ্জন প্রথম শুনল। অত্যন্ত প্রাঞ্জল এর ভাষা, অর্থ সুস্পষ্ট।

নিরঞ্জন রায়ের অর্থের উত্তরাধিকারিণী তো হচ্ছেই না গড়পাড়ের তেজস্বিনী—বড়লোক স্বামীকে একটি উত্তরাধিকারী উপহার দিতেও অপ্রস্তুত। যা ফ্যাক্ট, সেখানে কোন চালাকি চলছে না।

চর্বিপুষ্ট মাংসের চাপে হাতের প্রাণটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল না যদিও।

বরং টেবিলের বনাতের ওপর চোখ রেখে নিরঞ্জন হাসল।

হ্যাঁ, অভাব—অভাববোধে পাঁকের মধ্যে সে পা ডোবাচ্ছে। 'কিন্তু তুমি—তুমি অভাববোধে কি তা হলে সুইসাইড করছ, না সন্ন্যাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ?' অদৃশ্য পপিকে ডেকে নিরঞ্জন প্রশ্ন করল। নিপাড় মুগার সাড়ি ও লাল এলোমেলো চুলে সন্ন্যাসিনীর মতই লাগছিল বটে। ঘাড়ে গলায় প্রচুর ট্যালকমের ছোপ ও গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের খরতাপ রোধ করতে ভুরুতে রুমালে এবং হয়ত আরও কোথাও কোথাও যেন অনেকখানি অডিকোলন ঢেলেছিল পপি। শিশি উপুড় করে।

সেই সুন্দর গন্ধ, বিলাস বাসনের সুরভি মৃদু নিঃশ্বাস ঘরের বাতাসে

রেখে না গেলে বাস্তবিক মনে করতে পারত নিরঞ্জন তার সামনে থেকে এই মাত্র এক আশ্রমকন্যা বেরিয়ে গেল, এক মঠবাসিনী যোগিনী।

সত্যি তো পপির স্বল্প আহার, ঘুম আশ্চর্য কম। মেদলেশহীন পাতলা ছিপছিপে বাতাসের মতন শরীর। আছে কি নেই। একটু পর নিরঞ্জন ভাবল, হয়ত স্বাস্থ্যও তার একটা কারণ।

উত্তরাধিকারী দিতে না চাওয়ার। পপির অবিশ্বাস্য রকম ক্ষীণ দেহ।

কিন্তু তবু যেন অদৃশ্য পপিকে নিরঞ্জনের ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হ'ল, 'বেশ তো, অর্থে বিদ্বেষ কি কেবল আমার বেলায়, স্থূলদেহ মেড়ো স্বামীকে পরিত্যাগ করার এই কারণ? কৃষ্ণকায়, প্রিয়দর্শন শক্ত ঋজু সুঠাম নিশানাথের যে অর্থের ওপর একেবারেই লিপ্সা নেই, তুমি কি ক'রে টের পেলে? অর্থগৃধ্নু ও-ও তো হতে পারে।' নিরঞ্জন ডেকে জিজ্ঞেস করতে চায় সময় সময়। করে না। 'তুমি জলকে ফেরাত পার, মেয়েকে নয়।' না মিশুক নিরঞ্জন কারো সঙ্গে, তাই বলে কি আর এক আধজনও বন্ধু ছিল না ব্যাচেলার আমলে।

বন্ধুরা হাসত, আর বলত।

নিরঞ্জন বুঝত না তখন।

একটি মেয়ের মন যে লোহার মতন শক্ত, তা তুমি পাখীর পালকের মতন হাল্কা ফুলের মত নরম, ঘাসের মত ক্ষীণ পপিকে দেখে কি ক'রে বুঝবে।

নিরঞ্জন এখন বুঝছে।

এক কণা ঘাস দাবানল সৃষ্টি করতে পারে? পারে বৈকি।

ক'টা দিন বেশ শান্তিতে কাটছিল।

পপি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে এখানে।

হয়ত আবার রাগারাগি শুরু হবে। অশান্তি! ভয়ে চেয়েও ভয়ের

দেখতে না দেখতে মিসেস গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বে। তারপর? ছুটোছুটি, ডাক্তার ডাক, এটা কর, ওটা চাই।

কিছুই করতে পারবে না নিরঞ্জন। করলেও পপির মনঃপূত হবে না। কেন তার অর্থ নেই। সুতরাং সেই আবার নিশানাথ।

হ্যাঁ, তুমি এটায় ওটায়। সবত্র। তোমার উপস্থিতি সর্বকালে চাই।

এড়াতে পারছে কই নিরঞ্জন তাকে।

খোড়বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি খোড়।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে হাসল। বেকার নিঃস্ব দরিদ্র একটি যুবককে প্রথম দিনের সাক্ষাতেই মহানুভব নিরঞ্জন নিজের অফিসে চাকুরী দিয়েছিল।

অতিশয় গরীব গোকুলবাবুর অহরহ কান্না দেখে শেষটায় নিরঞ্জনের মনটা গলে গিছল। মহানুভব হয়েছিল সে কপর্দ্দকহীন বিপন্ন ভদ্র-লোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করে। কো-ইন্সিডেন্স। ভাবল নিরঞ্জন।

না, জানত না সে গরীব ছেলেটির মধ্যে এত প্রতিভা লুকিয়ে। এমন যোগ্যতা।

আর মেয়ে, গরীবের মেয়েটি ধ'রে রেখেছে জীবনে এতবড় ফিলজফি। টাকার কথা শুনলে গা বমি করে।

নিরঞ্জন বোকা হয়ে গেছে কি?

মুচকি হাসল সে।

আ, যদি জানত পপি কালও নিরঞ্জন মোটা অঙ্কের একটা চেক কেটে দিয়েছে নিশানাথকে, দেবে, জিদ করে দিচ্ছে। টাকা বনাম মন। পপির ভাষায় হৃদয়। রীতিমত টাগ-অব-ওয়ার চলছে যেখানে। সুতরাং টাকার যখন অপ্রতুল নেই নিরঞ্জনের তখন সে হেরে যাবে কেন যুদ্ধে, কোন্ দুঃখে?

শেয়ারের বাজারে গরম হয়ে আগে মাঝে মাঝে কোনও রসিক বন্ধুর

পাল্লায় পড়ে বার-এ গিয়ে নিরঞ্জন বসেছে বৈকি। বসত। তখনও সে অকৃতদার।

পৃথিবীটা সোনার আপেলের মত তার চোখের সামনে ঝুলছিল। সুন্দর সুস্থ পরিপূর্ণ রূপ।

আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের ধনকুবের লাট্টুরাম এক চোখ ছোট ক'রে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসত।

'A dog, a woman and a wal-nut tree, the more you beat them the better they be'.

বলত হেসে চেম্বার অব কমার্সের ঝানু অফিসার এক কিশোরীলাল। 'বুঝলে ব্রদার। বড্ড ঝকমারী, বহুৎ পেরাসানি বিয়ে-করা বৌয়ের।

It's better if you can do without a.........'.

বার-এ বসে বন্ধুরা লোহা, তুলো, চা, সিমেন্টের আলোচনা করে না, জানত যদিও নিরঞ্জন, জানত না সে স্ত্রী সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের এই অবস্থা কেন। আর তারা সবাই আইবুড়ো নিরঞ্জনকে গায়ে পড়ে নানারকম সদুপদেশ দিত। নিরঞ্জন একতরফা শুনে গেছে। হেসেছে। কথা কয়নি। একমাত্র সে-ই ব্যাচেলার ছিল ব'লে টার্গেট ছিল নিরঞ্জন।

. আজ কিশোরীলালের কথাটা নিরঞ্জনের বড় বেশি মনে পড়ছে। 'সহধর্মিনী। কী শব্দ! ননসেন্স!' মাথায় রাখ, বুকে রাখ, কোনো-কালেই তোমার ধর্মের সঙ্গে ওঁর ধর্মের মিলন হবে না। তার চেয়ে বাবা, বেঁচে থাক আমার সহমর্মিনীরা।' চিৎকার করে বলত কিশোরী মুৎসুদ্দী টেবিল কাঁপিয়ে। পানপাত্রগুলো ঝন্‌ঝন করে উঠত। ঘন ঘন তাকাত সে ঘড়ির দিকে তারপর দরজায় গাড়ির শব্দ হতে তাড়াতাড়ি উঠে হেসে বিদায় নিয়েছে। 'চলি ব্রাদর।' লাট্টুরাম থেকে আরম্ভ

ক'রে নিরঞ্জন সবাই ঘাড় নেড়ে বলত, 'বাই—বাই।' আর উজ্জ্বল উৎসুক ঈর্ষার চোখে সব চেয়ে থাকতো কিশোরী যে-পথে বেরিয়ে যাচ্ছে।

স্ক্রীণের ওপারে কিশোরীলালের এক আধজন সহমর্মিনীকে যে নিরঞ্জন না দেখেছে এমন নয়।

কিন্তু সে দিন তার মনে প্রশ্ন জাগেনি যদিও, শুধু ভাবত বিয়ের পরও ওসব নিয়ে ঘোরাফিরি করা কি বড়লোকের ফ্যাশান। না স্বভাব?

আজ নিরঞ্জনের মন বলছে, ফ্যাশন নয়,—কিশোরী সবটাই স্ফূর্তির খাতিরে করত এ কথা হয়ত সত্যি নয়। হয়ত অভাব ছিল যেমন অভাববোধ করছে নিরঞ্জন,—কার জীবনে কি ঘট্‌ছে তুমি জান কি? কিন্তু নিরঞ্জনের বেলায় তার চেয়েও বড়—জিদ্। ধন ও মনের দুরন্ত 'টাগ্-অব-ওঅর।' এমন মনসর্বস্ব জীব যে পপি যদি একবার বিয়ের আগে জানত। সুন্দর শব্দটা মনে মনে খুঁজে পেয়েছে নিরঞ্জন। হ্যাঁ, দেখবে, সে দেখতে চায় তার অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠার দিকে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় কতটা কুঞ্চিত হতে পারে তেজস্বিনীর নাসিকা চক্ষু—এবং কতদিন। বড় দম্ভ!

না, তার চেয়ে গরীবের ছেলে নিশানাথ অনেক ভাল। টাকার যে কত মূল্য, পৃথিবীতে টাকার কি ভয়ঙ্কর কদর, উঠ্‌তে বসতে প্রত্যেকটি পা ফেলতে ছেলেটি বুঝিয়ে দিচ্ছে নিরঞ্জনকে। টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হয় বৈকি,—টাকায় বড় বড় ক্ষত শুকোয়। কথাটা নিশানাথের মুখেই যেন কবে শুনেছিল নিরঞ্জন।

বাইরে আবার একটি মেয়ের গলা শুনল সে এখন। তাড়াতাড়ি গ্লাশটা সরিয়ে রেখে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়।

দরজায় না গিয়ে সে যায় জানলার কাছে।

বস্তুত শিলং কি পুরী বা রাঁচী এবং ওয়াল্টায়ারে থাকতে যা সম্ভব হয়নি এখানে তা হচ্ছে, দেখছে নিরঞ্জন। বাঙলাদেশের আধপাড়াগাঁ একটা শহর, অথচ,—না বয়স্কা মেয়ের সংখ্যাই যে কেবল বেশি তা নয়, ধরনধারন, সাজগোজ, চলাফিরার কায়দায়ও একটু বেশি রকম এগিয়ে গেছে এরা। বেশ সপ্রতিভ। ভারি মিশুক। নিরঞ্জন এতটা আশা করেনি।

'আমার শহর।'

গর্বিত চোখে নিশানাথ নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়েছিল কাল। শিকারে বেরেবোর সময় নিরঞ্জন গাড়ির বাইরে দু'একবার মুখ বাড়িয়ে পরে নিশানাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিশব্দে ঠোঁট টিপে হাসছিল।

পপির চোখ ছিল তখন অন্যদিকে।

অবশ্য তাকালেও মনিব ও কর্মচারীর মধ্যে এই নিশব্দ হাসি ও দৃষ্টি-বিনিময় এত সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী ছিল যে, গোকুলবাবুর মেয়ের পক্ষে তা টের পাওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রায় বলতে গেলে এই পরিবারভুক্ত একটি লোকের মতন ছেলেটি সম্পর্কে পপির আইডিয়া ভয়ানক অন্যরকম।

সময় সময় ঠাট্টার ছলে (অবশ্য যখন পপির মেজাজ ভাল থাকে, যা প্রায় কোন সময়েই থাকে না।) নিশানাথঘটিত ব্যাপারে নিরঞ্জন যদি এক-আধটু ঠাট্টা করে কালচারপ্রিয় পপি বেশ অনুকম্পার চোখে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ভাল ভাল শব্দ জুড়ে বড় রকমের বক্তৃতা দেয়। এই যেমন একটুক্ষণ আগে একবার হয়ে গেছে।

'ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। কালো বাজারে ঘুরে ঘুরে মনও তোমার কালো হয়ে গেছে'। পপি বলে, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে সহজ সুন্দর স্বাভাবিক হতে পারে—কথাটা ভুলে গেছ। টাকা হাতড়ে হাতড়ে চোখ হয়ে গেছে বাঁকা, মন গেছে ছোট হয়ে, স্বার্থপর, চিন্তাধারাও তেমনি হয়েছে জঘন্য নীচ। তুমি এসব বলবে না তো বলবে কে, তোমাদের আমি চিনি না?' পপি বিয়ের আগে ভবানীপুরে বেড়াতে যাবার কথাটা এক্ষেত্রে আর একবার বেশ জোর দিয়ে বলে। আর, যেন সর্বাঙ্গে ও শিউরে ওঠে অকথিত ঘৃণায়।

'চেষ্টা ও লোভ থাকলে নিশানাথও তোমার মতন, কি তারও বেশি টাকা করতে পারে, তুমি জান?'

কবে জানি পপি একদিন প্রশ্ন করেছিল।

যেন জানে না, এমন চোখে নিরঞ্জন তাকিয়েছিল গৃহিণীর দিকে। রূপোর বাটিতে করে পপি ডিম মেশানো গরম দুধ খাচ্ছিল সেদিন। একটু একটু মনে আছে নিরঞ্জনের। বেণীতে বাঁধা ছিল রূপালী রিবন। কুমারী বেণী নয়। বিয়ের পরের খোঁপা-খুলে-বাঁধা আর এক ধাঁজের বেণী। একটু বেশি কড়া, অতিরিক্ত পাক খাওয়ানো।

আজকের মত সেদিন অবশ্য ওর এতটা উদাসীন এলোমেলো ভাব ছিল না, কি এমন ছটফটানি।

মাত্র ক'দিন হল পপি এ-সংসারে এসেছে তখন। নিশানাথ বৈঠকখানায় থাকছে, বড়-জোর ভিতরের বারান্দায়।

অবশ্য, বেশির ভাগ সময়ই পপি ওকে ডাকিয়ে ডাকিয়ে নিচ্ছিল ভিতরে। সাবান পাউডার নতুন ডিজাইনের গয়না যা নিরঞ্জন কিনতে পারেনি, পারলেও মনঃপূত হয়নি গৃহিণীর এবং আবার কেনার দরকার হয়েছে।

তখন থেকেই নিশানাথ।

এবং সেদিনও পপি বলছিল লোভ, স্বার্থপরতা, নীচতা, আর জঘন্য সব মনোবৃত্তির কথা বড়লোকদের।

'নিশ্চয়ই ছেলেটি তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান।' পপি ওর ব্যাঙ্কের কাজকর্মের কথা বলল। 'তোমার চেয়ে বিদ্বান।' ম্যাট্রিক পাশ করেই নিরঞ্জন ব্যবসার লাইনে পা বাড়িয়েছিল। নিশানাথ দস্তুরমত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। গরম দুধের বাটিতে চুমুক দিয়ে ভুরু কুঁচকে পপি বলছিল, 'গরীবের ছেলে অবস্থার ফেরে পড়ে তোমার কাছে নয় চাকরি করছে। দরকার মত বাড়িতে ডাকিয়ে তুমি ফাইফরমাস খাটাচ্ছ। হ্যাঁ, নিশানাথকে আমার ভাল লাগে। আমিও পার্সোনাল দুটো-একটা কাজ করাব।'

দুধ গিলে পপি বলছিল, 'নম্র বিনয়ী। তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভদ্র, সংযত, এমন একটি ছেলের প্রেমে যদি পড়ে যাই, দোষের হবে না কিছু।'

প্রথম থেকেই পপি জানিয়ে আসছিল।

নিরঞ্জনও বিশেষ অগ্রসর হয় নি আর।

অর্থাৎ, অন্তত একটি কর্মচারীর সততা, নম্র স্বভাব, সংযত, ভদ্র ব্যবহার ও কাজকর্মে মুগ্ধ হয়েও যদি পপি এ-সংসারে টিকে থাকে, নেহাৎ খারাপ হবে না। নিরঞ্জন ভেবেছিল গোড়ায়।

তারপর তো সে দেখলেই, দেখছে।

মন না গড়াক, জল গড়াচ্ছে যেদিকে গড়াবার।

জানালার ওপারে চোখ রাখতে গিয়ে উপমাটার পুনরাবৃত্তি করল সে মনে মনে।

মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করল মফঃস্বল শহরের মেয়েরা এদিনে কত নিখুঁত সাজতে জানে, কত উজ্জ্বল। অপরূপ অঙ্গরাগ বিকশিত কেশকলাপ।

সকালের মিসেস খাস্তগীরের হাতে লাল চামড়াব ব্যাগ ছিল, এর হাতে কোমল পশমের থলে।

কমলার গায়ের রং রৌদ্রের মত না হলেও মোটামুটি রকম মন্দ উজ্জ্বল ছিল না।

কিন্তু এ সুপার্ব।

কিশোরী মুৎসদ্দীর একটা বহু-ব্যবহৃত শব্দ যেন জীবনে এই প্রথম নিজের জায়গায় প্রয়োগ করতে পেরে নিরঞ্জনের বেশ ভাল লাগল। মনে মনে হেসে সে লক্ষ্য করছিল পপিকেও।

কমলা খাস্তগীর ভেটারেন বলে দেখা-সাক্ষাতের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গৃহকর্ত্রীর প্রায়-বলতে-গেলে আক্রমণসূচক প্রশ্নবাণগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পেরেছিল।

তাই ভিতরে ঢুকবার পাসপোর্ট পেয়েছিল।

কিন্তু এ, আপাত দৃষ্টিতে মনে হল নিরঞ্জনের, নেহাৎ নাবালিকা, মৃগশিশু।

ইংরেজীতে তো বটেই। মাঝে মাঝে বাঙলা শব্দও সুন্দর সুন্দর প্রয়োগ করত কিশোরী। বাছা বাছা ক্ষেত্রে।

নিরঞ্জন পপির প্রশ্নবাণে জর্জরিত ভীতা একটি হরিণীকে দেখল অদূরে বাদাম গাছের ছায়ায়।

অদ্ভুত লাগল নিরঞ্জনের।

'অদ্ভুত সুন্দর।'

বীয়ারের হাল্কা সুরভি নিঃশ্বাস ফেলে রেলিংয়ের এপারে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠল নিরঞ্জন। 'তুমি এস, চলে এস ভিতরে। ও কেউ না, ও কিছু না। ছায়ারূপিণী, প্রেতিনী এ-সংসারের, সত্যিকারের গৃহিণী তো নয়ই। সন্ন্যাসিনী বলতে পার।' পপির পরিচয় দিয়ে নিরঞ্জন এখান

থেকে যেন নবাগতা রূপসীর কানে অভয়বাণী ঢালল। 'অর্থে আপত্তি, বিত্তে বিতৃষ্ণা নিয়ে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন স্ত্রী। তাঁর কথার দাম নেই, নিষেধের মূল্য নেই বস্তুগত ব্যাপারে।'

নিরঞ্জন যেন দূরে থেকে থুতনী নেড়ে ডাকল মেয়েটিকে। 'তোমার টাকার দরকার, টাকা না হলে সমিতি বাঁচবে না। সুতরাং—'

নিরঞ্জনের চোখ ছিল ওর বেগ্নী সবুজ রঙের ফুল-তোলা পশমের থলের দিকে। থলেটা কাঁপছে, নড়ছে, দুলছে বাতাসে। একটা আঙুল সোনার বঁড়শীর মত বেঁকে ধরে আছে থলের গোলাপী লাল ফিতে। মুখ দেখে যতটা কচি মনে করেছিল, আঙুল দেখে আর ততটা কচি মনে হল না নিরঞ্জনের। বেশ শক্ত সমর্থ মেয়ে। নিরঞ্জন যেন আশ্বস্তই হ'ল।

কান পেতে কথা শুনছিল সে দুজনের। কাটা কাটা প্রশ্নের নরম মসৃণ উত্তর।

'আমি সমিতি ভালবাসি না।'

'তবে মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিন।'

'মিঃ রায়ের সমিতি করার সময় নেই।'

'আছে। আমি জানি, তিনি নারী সমিতি অপছন্দ করেন না। কমলা মাসীর কাছে তাঁর উদার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেছে। মাসী মারফৎ তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে সমিতি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় জানবার জন্যে। মোটের ওপর, তিনি ইণ্টারেস্টেড।'

'আপনি সমিতির কে?'

পপির দুই চোখ ছোট হয়ে গিছল।

'সেক্রেটারি।'

'আপনার নাম।'

শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে পপি তাকিয়ে দেখছিল মেয়েটিকে। চকচকে জুতো, ঝকঝকে দাঁত। হাতঘড়ি, ডায়মণ্ডকাটা ব্লাউজের হাতা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেক্রেটারি একটু পর নিজের নাম বলল, 'লিলি, লিলি নন্দী।' আর হাসল। জলতরঙ্গের মত হাসির শব্দ। তারপর আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে শক্ত দৃঢ় পায়ে সবেগে এগিয়ে এল নিরঞ্জনের দরজার দিকে। প্রথম দেখতে মেয়েদের কত অসহায়ই না মনে হয়। ভাবল নিরঞ্জন। তারপর হাসল।

নিরঞ্জন চেক্‌বই খুলে রেখেছে।

নিরঞ্জন দেখল না লিলি যখন তার ঘরের সিঁড়ির কাছে এসে গেছে—পিছন থেকে পপি তপ্ত অস্থির নিঃশ্বাস ফেলছিল। 'ককেট!' বলছিল ও মনে মনে। মেয়েরাই মেয়েদের বেশি চেনে। মফঃস্বলের মেয়ে। কিন্তু বলার কি আছে। ওদের টাকার দরকার। পপি টাকা চায় না। আপাতত সে নেমে গেল ফুলবাগানের কাছে। ইমামবক্সের সামনে।

'নিশানাথ ঠিক কখন ফিরবে বলে তোর মনে হয়।'

'হুঁ, চার-ছয়টা বাজবে।'

'চারটে আর ছয়টা কি এক কথা, বোকা।'

পপি অল্প হাসল।

ইমামবক্স মনিবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে। হাতে নিড়ানি, কপালে ঘাম। ফর্সা একটা গেঞ্জি গায়ে—হাঁটুর ওপর গুটানো রঙিন লুঙ্গি। মাথায় চকচক করছে চুল। সাহেবের বাগানের মালী ইমামবক্স। রাম্‌-কাম্‌র চেয়ে অনেক বেশি কেতাদুরস্ত; কথবার্তা মাজাঘসা তো বটেই।

'ম্যানেজারবাবুর আজ আবার শিকারে যাবার কথা বুঝি?'

পপি কথা বলল না

'ম্যানেজারবাবুর বেলা তিনটে-চারটে নাগাদও ফিরতে পারেন।' বলল ইমামবক্স। অর্থাৎ এ-কথায় মনিবানী সন্তুষ্ট হবেন। জানে সে।

মফঃস্বলের চাকর-বাকরগুলো কত চালাক-চতুর—আড়চোখে মালীটাকে দেখতে দেখতে পপি একবার ভাবল।

'তোদের সাহেবকে ম্যানেজার রোজ বড বড় বালিহাঁস শিকার করে খাওয়াচ্ছে।'

'সাহেব মাংস জোর ভালবাসে।'

ইমামবক্স শাদা পরিষ্কার দাঁত বার করে হাসল। 'ম্যানেজারের সেই জন্তেই মাইনে বাড়ছে সাঁই সাঁই করে।'

'তুই-ও মাংস খাওয়া না।'

পপি রসিকতা করল মালীর সঙ্গে।

'আমি খাওয়াব তিতির। সাহেবরে একদিন তিতিরের মাংস খাওয়ানো ইচ্ছা।'

বলছিল ইমামবক্স বোতাম ফুলের গোড়ার মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে। ওর মুখ নীচের দিকে।

পপি শুনল। কিছু বলল না। পায়চারী করতে করতে নিজের মনে চলে গেল অন্তদিকে, বেড়ার ধারে। না, এই যে মেয়েটার সঙ্গে বসে গল্প করছে নিরঞ্জন, তাতে ওর রাগ নেই। ভাবল পপি। সবচেয়ে তার রাগ হয়, ঘৃণা হয় শুনলে, কি ভাবলে যে, চাকরবাকরদের সঙ্গেও আজকাল খাওয়ার কথা নিয়ে সাহেব খুব মেতে যাচ্ছে। এখানে কি কি পাখী পাওয়া যায়, কোন্ পশু। মোটা রুচির পুরুষগুলোকে দেখলে পপির চিরদিন কেমন গা জ্বালা করে, মরে যেতে ইচ্ছা হয় ওর। এবং এই মাংস খাওয়ার কথায় কাল রাত্রে নিশানাথ সেজন্তেই ঠাট্টা করছিল

বার বার। 'মিঃ রায়, চান তো আমি আপনাকে নধর হরিণের মাংস খাওয়াতে পারি।'

'তাই নাকি।'

স্থূল গোল চোখ দুটো দিয়ে নিরঞ্জন কথা গিলছিল নিশানাথের প্রভুভক্ত কর্মচারীর।

যেন হাঁসের সঙ্গে সেই রাত্রেই সে পেলে হরিণ খায়।

ফিসারীর কথা চাপা পড়ে গেছে, নিশানাথের শহরে প্লট কিনে মিল্ করার প্রোজেক্ট আপাতত স্থগিত, কি এই শহরে একটা মোটরকারের গ্যারেজ খোলার স্কীম। বা এখানে আরো ইলেকট্রিক আনার মতলব। যেন ছুটির আলস্য এসেছে মনিব ও কর্মচারী দুজনের চোখে।

তবু নিশানাথের ছেলেমানুষী, শিকার নিয়ে হৈ-চৈ, ছুটোছুটি মন্দ লাগছিল না পপির।

কিন্তু এই বয়সে তোমার কেন।

নিরঞ্জনের এই চাপল্য অমার্জনীয়। পপি মনে মনে বলল Reaction. কোনদিন যদি একটি ছেলে কলেজে না পড়ে, কি জীবনে একছত্র রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি না করে থাকে তো অর্থের অধিকারী হয়েও তারা এই হয়ে যায়—শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি। এত স্থূলত্ব।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ পপির, বেচারা নিশানাথবাবু খেটে মরছে। একদিকে ব্যাঙ্কের কাজ। তার ওপর আজ আমার এটা চাই, কাল ওটা দিও। এবং এর প্রত্যেকটিই রসনাসংক্রান্ত। স্থূল ইন্দ্রিয়গত।

তিক্তকর, তিক্তকর এই পুরুষ-সঙ্গ। তাই পপি অন্তত যতক্ষণে না নিশানাথ ফেরে, ভাবতে ভাবতে লাশকাটা ঘরের দিকে চলে গেল। এমনি হাঁটতে হাঁটতে। সময় কাটুক।

দুজনের দেখা হয়ে গেল।

যেন ওরা মনে মনে জানত একদিন দেখা হতেই হবে।

সময় অপরাহ্ণ। স্থান শহর ও গ্রামের সঙ্গমস্থল। পীচের রাস্তা যেখানটায় এসে হাত মিলিয়েছে মেটে ধূলো-ভরা পথের সঙ্গে। জায়গাটাও নির্জন।

অল্প অল্প হাওয়া ছিল।

হাওয়ায় শাদা ধূলো উড়িয়ে আনছিল নিশানাথের গাড়ির উইণ্ড-সীল্ডের ওপর।

সেখানে একরকমের বুনো ফুল ফুটে ছিল রাস্তার একদিকে। অন্য-দিকে ছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রকাণ্ড পিলার। মাইলের অঙ্ক খোদাই করা শ্যাওলাপড়া পুরোনো পাথর। তেরছা ক'রে বসানো। বেশ ছায়া ছায়া ছিল জায়গাটায়।

পিলারের ওপর দিয়ে, হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছিল রাস্তার ওপর ছড়ানো ছাতিম ফুলের গাছ।

কখনো ফুল ঝরে পড়েছিল নিশানাথের গাড়ির ওপর, কখনো পাতা।

একটা ফুল এসে পড়ল লিলির খোঁপার ওপর। আজ লিলি খোঁপা ক'রে এসেছিল এখানে। এতদূর। শহরের শেষ সীমানায়। পপি-লজে জীবনে তার এই প্রথম আসা। পুলিশ সাহেবের বাংলোর এপারেও কোনদিন আসেনি।

লিলির কপালে কুঙ্কুম ছিল। চোখে ছিল গাঢ় কাজল।

নিশানাথ লক্ষ্য করল ওর নোখের চম্‌কা রং। লিলি দুল ছেড়ে রিং পরেছে।

তাই হঠাৎ যেন, এত বছর পরেও লিলিকে কেমন ছোট লাগছিল—নিশানাথের চোখে।

'ডন্ জোয়ান ! ডন্ জোয়ান ।'

ঠাট্টা করছিল লিলি নিশানাথের মুখের দিয়ে চেয়ে।

'ফুরফুরে প্রজাপতিটি সেজে কদ্দূর আসা হয়েছিল ?'

একটা চোখ ছোট করল নিশানাথ, ঠোঁটে বাঁকা ক'রে গোঁজা গোল্ড ফ্লেক্—পুরু কব্জিতে সোনার বেণ্ড-পরানো দামী ওয়েস্ট এণ্ড। চুড়ি-হাতা আদ্দীর তলা থেকে উঁকি দিচ্ছিল।

'তারপর ? খবর কি ?' নিশানাথ প্রশ্ন করে।

'খুব বড়লোক হয়ে গেছ শুন্‌ছি'। লিলি উত্তর দেয়। 'অনেক টাকা রোজগার করছ নাকি ?'

'তোমার বিশ্বাস তাই ?' নিশানাথ শব্দ করে নয়, মৃদুমন্দ হাসল। 'তুমি যে একেবারে উর্বশী হয়ে গেছ। ব্যাপার কি।'

'আমারা তো আর স্টুডিবেকার নিয়ে চলাফেরা করি না।'

লিলি নিঃশ্বাস ফেলল।

'আমার নয়, মিঃ রায়ের গাড়ি।'

'স্ত্রীটিও তো মিঃ রায়ের।'

লিলি তেরছা চোখে তাকাল।

নিশানাথ এবার ক্ষীণ শব্দ ক'রে হাসল। 'ডন্‌জোয়ান, ডন্‌জোয়ান।'

বলল লিলি তারপর পিছনের দিকে ঘাড় হেলিয়ে আকাশের দিকে থুঁতনি তুলে গাছের ঘনসন্নিবদ্ধ পাতা দেখতে লাগল।

'কালকে বুঝি একসঙ্গে গাড়িতে দেখেছিলে ? হ্যাঁ, মনিবের জন্যে হাঁস শিকার ক'রে ফিরছিলাম। বড্ড ভালবাসে ভদ্রলোক মাংস।'

'কাল কেন, সর্বদাই দেখা যায়।' লিলি চোখ নামাল। 'এ পাড়ায় আমাকে রোজ আসতে হচ্ছে সমিতির কাজে।'

নিশানাথ চোখ বড় করল।

'তাই বলো। আমিও মাঝে মাঝে দেখছি দলবল নিয়ে বেশ সেজেগুজে রাস্তায় প্রায় ঘোরাঘুরি হচ্ছে।' একটু থেমে ঢোক গিলে নিশানাথ প্রশ্ন করল 'কি, তুমি কি সমিতির সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট কোষাধ্যক্ষ না শুধুই সাদামাটা সদস্যা ?'

শেষ পর্যন্ত নিশানাথ আর গম্ভীর থাকতে পারল না। প্রকাণ্ড সিল্কের রুমাল দিয়ে সে ঘাড় মুছল।

'হাসছ যে ?' লিলি একটা ভুরু তুলল। 'কি নিয়ে ঠাট্টা করছ।' একটা পা রাখল ও গাড়ির ফুটবোর্ডে আল্‌গোছে।

'তোমার যেমন জীবনের দাম আছে তেমনি আমারও আছে। মেয়ে ব'লে ভেঙে পড়িনি।' লিলির কথাগুলো বেশ শক্ত।

'আমি সেকথা বলছি নাকি ?' নিশানাথ আবার একটু একটু ঘামছিল। সারাটা দুপুরের রৌদ্রে গাড়ি চালিয়ে গায়ের রং আরো বেশি কালো দেখাচ্ছিল। 'আমি সেকথা বলছি না।' সিগারেট শেষ ক'রে নিশানাথ নতুন সিগারেট ধরায়। একটা হাত লিলির হাতের ওপর রাখে। যদিও ইচ্ছা হয় খুব, লিলি হাত সরায় না।

দু'জনের কথা থেমে গেছে, কেন না সেই রাস্তা দিয়ে তখন পিতম মুচি ফিরছে গাঁয়ে, শহরের বাজারে নিজের হাতের তৈরী পাকা চামড়া বিক্রী ক'রে। ডাকহরকরা চলে যাচ্ছে স্টুডিবেকারের পাশ ঘেঁসে। আর কেউ না। মাথার ওপর একসঙ্গে অনেকগুলো পাখি ডেকে উঠল

একটা কাঠঠোক্‌রা নেমে গেল দূরে মাঠের ওপর প্রায় নিঃসঙ্গ একটা তালগাছের শুক্‌নো কাণ্ড বেয়ে।

'যাক্ গে, মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল তাহলে ?'

লিলি মাথা নাড়ল।

'মিসেস কিছু বলল না ?'

'অদ্ভুত টাইপের মেয়ে।' লিলি বাঁ হাতের ভাঁজ করা রুমাল গলায় গালে চাপড়ে নেয়। 'প্রথম তো আমায় ভিতরে ঢুকতে দিতেই ওর আপত্তি।'

'এমন!' যেন নিশানাথ মজার গল্প শুনছে। 'কি বলে?'

'কি আবার বলবে। চোখের সামনে কার্ড তুলে দেখালাম। সেক্রেটারি—নারী কল্যাণ সমিতি।'

'তারপরেই কল্যাণী বুঝি পাসপোর্ট পেল?'

'কল্যাণী।' ঠোঁটের অদ্ভুত ভঙ্গি করল লিলি। 'কমলা মাসীর সঙ্গেও সকাল বেলা খচাখচি হয়েছিল। মাসী এক কথায় দমিয়ে দিয়েছে।'

'কি বলছিল খাস্তগীর?' কৌতূহলে নিশানাথের দু'চোখ বড় হয়ে গিছল। 'কদ্দিন আমি এ শহরে নেই। কমলা বুঝি তোমাদের সমিতির—'

'ক্যাশিয়ার।' লিলি বলল, 'মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইতে আপত্তি করাতে কমলা রেগে আগুন হয়ে তোমাদের মিসেসকে বলেছে মফঃস্বল এটা, এখানে তুমি নবাগতা, অসামাজিক, বিশেষ ক'রে মেয়েদের সম্পর্কে কোনো কাজ করতে গেলেই তোমাকে ভয়ঙ্কর অপমানিত হতে হবে, অপদস্থ।' লিলি দুই পায়ের ওর সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'সুখে খাচ্ছ দাচ্ছ আর আমরা রৌদ্রে খাঁ খাঁ হয়ে ঘুরছি, জলে ভিজছি, ঝড়ে আছাড় খাচ্ছি—'

'বললে বুঝি কমলা?'

'না, যা ফ্যাক্ট, আমিও বলেছি, বলছি।' নিশানাথের চোখে চোখ রাখল লিলি, 'অনেক কষ্টে গড়া আমাদের এ সমিতি, অনেক যত্নে তৈরী।'

'সে তো ঠিকই।' অল্প অল্প মাথা নাড়ল নিশানাথ।

'কাজেই—যাক্‌গে, না আমি জিজ্ঞেস করছিলাম how he can stand a wife like her ভেবে অবাক হই—'

'মিঃ রায়—'

নিশানাথ কথা শেষ করার আগেই লিলি বলল, 'পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান। কি চমৎকার ব্যবহার, কত সুন্দর মিষ্টি তাঁর হাসি, কথা। আমি অভিভূত হয়ে গেছি।'

'কত চাঁদা দিলেন?'

নিশানাথ আবার চোখ বড় করল।

'তা আমি এখন বলছি নাকি তোমায়।' লিলি হাতের থলেটা দোলাতে থাকে। 'বললেন,—বলেছেন সমিতির জন্য তিনি সব করবেন, সমিতির নামে একটা বড় রকমের প্রোপার্টি লিখে রেখে যাবেন যাবার আগে।'

নিশানাথ চুপ ক'রে ছিল।

'কি হিংসা হচ্ছে নাকি তোমার?'

'আমার? কেন।' নিশানাথ এবার চাকা চাকা ধোঁয়া ছাড়ল লিলির মুখের ওপর। 'আমি হিংসা করবার কে, তোমরা মেয়েরা যাচ্ছ, তাঁর কাছে সম্পত্তি আদায় করবে—'

'পুরুষের চেয়ে এযুগে মেয়েদের জোর বেশি বোঝ তো?'

'একশ বার।' নিশানাথ হাত বাড়িয়ে লিলির একটা হাত ধরতে চেয়েছিল—লিলি সরে দাঁড়াল। 'এখানকার পালা যে অনেকদিন ফুরিয়েছে। শুক্‌নো কাঠের বুকে ছুরি চালাতে যাচ্ছ তাই করো।' বলল লিলি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

ক্ষীণাঙ্গী পপি সম্পর্কে শ্লেষবাক্য বুঝল নিশানাথ, শব্দ ক'রে সে হাসল। 'তোমার ভুল, তোমাদের ভুল ধারণা, লিলি।'

'জন্‌জোয়ান।' বিড়বিড় করছিল । 'বয়েস অনেক হয়েছে, সংযত হও এবার। একটু সুস্থির—'

'সত্যি এবার আমি তাই হতে যাচ্ছি, তাই হয়েছি।'

ছুঁচের আগার মতন ধারালো হয়ে উঠেছিল লিলির চোখ। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'খুব মন দিয়ে চাকরি করছি মিঃ রায়ের।'

'সেটা তো উপলক্ষ—না হ'লে মিসেস্‌টির সঙ্গ লাভের—'

'ভুল, সবটাই ভুল তোমার লিলি।' নিশানাথ গাড়ির গর্ভে বসে কেমন অদ্ভুত শব্দ ক'রে হাসল।

লিলি ঠিক চমকাল না।

এক পা এগিয়ে এল গাড়ির কাছে।

'টাকা, স্রেফ্‌ টাকার জন্যে—'

যেন বুঝল কথাটা লিলি,—নিশানাথের বলিষ্ঠ ঠোঁটের প্রান্তের ধারালো চিকন হাসি ধরতে না পারার মতন অনাধুনিকা মেয়ে সে নয়।

'আমি তাঁর একটা ব্যবসার পার্টনার হচ্ছি—' হেসে হেসে বলছিল নিশানাথ।

'কি সে ব্যবসা।' হেসে জিজ্ঞেস করছিল লিলি।

'তুমি তোমার চাঁদার অঙ্ক গোপন রেখেছ, আমি, আমার ব্যবসার কথা ফাঁস করি কেন।' নিশানাথ ছেলেমানুষের মত ঘাড় নাড়ল আর শাদা দাঁত বার ক'রে হাসল। শাদা দাঁতের পাশে সোনার দাঁত ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠল। গাড়ির ভিতরটা কেমন অন্ধকার হয়ে গিছল সিগারেটের ধোঁয়ায়, তা ছাড়াও দিনের আলো নিভে গেছে, পৃথিবী কালো হয়ে এসেছে। লিলির চোখে নতুন দাঁত এড়ালো না।

'তাই বলো, লিলি ফের হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল গাড়ির জানালার গায়ে। আধুনিক ছেলে এই বয়সে আবার নূতন করে কি—'

'সেই রাস্তায়ই নেই শর্মা।' এক চোখ ছোট করল নিশানাথ আর ডান হাতে লিলির হাতের ওপর শক্ত চাপ দিল। 'চাক্‌তি, চাকৃতি,— রূপোর চাকতির কাছে রূপোলি হাসির—'

'যাক্‌ সব মামুলি কথা।' অজস্র পরিতৃপ্তিতে লিলি বড় ক'রে ঢোক গিলল। 'মিসেস কি এখনো বুঝছে না তোমায় ?'

'বুঝবে একদিন।' নিশানাথ সিগারেটের ছাই ঝাড়ল।

'তাই বলো, ফলে কামড় না দিলে তেতো কি মিষ্টি বুঝবে কি করে।' লিলি সুন্দর ক'রে হাসল। ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল। আর ঝরে ঝরে পড়ছিল ছাতিম ফুলের পাপড়ি আর শুকনোমতন একটি দুটি পাতা। 'তাই বলো, এবয়সে কি আর প্রেম-টেম পোষায় আমাদের।'

'সমিতির প্রেসিডেণ্ট হয়েছ বুঝি ?'

'না, সেক্রেটারি।'

নিশানাথের গাড়ি আস্তে আস্তে নড়ে ওঠল। ফুটবোর্ড থেকে পা নামিয়ে লিলি সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'চললে।'

'হুঁ।'

'দেখা হবে নিশ্চয় ?'

'আশা করি, মিস নন্দী।' নিশানাথ বক্র হাসল।

মিস নন্দী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলে থলে দোলাতে দোলাতে বাড়ির দিকে চলল। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল লিলিকে কালো জর্জেটে। হোক না অপরাহ্ণের স্তিমিত আলো। কালো জর্জেট, শাদা জুতো, কালো ব্লাউজ আর অদ্ভুত ফর্সা রং।

ঝড় উঠেছে। সেদিন এমন সুন্দর ঝকঝকে এক বিকেলে, যখন পেপে পাতাগুলো নিশানের মতন হয়ে টিচার্স কোয়ার্টারের ছোট্ট আকাশে দুলছিল, পড়ন্ত মিষ্টি আলো লেগে দেবদারু পাতাগুলো ছোট্ট মেয়েদের মাথার সবুজ রিবনের মতন নড়ে নড়ে উঠছিল আলতো হাওয়ায়, অরুণা শেষ করে এনেছিল ওর ডাকঘরের রিহার্সাল। তখন।

প্রায় সশব্দে ছিটকে এসে পড়ল উঠোনের ওপর ভদ্রমহোদয়গণ।

শহরের গণ্যমান্য সব।

অরুণা চেয়ে চেয়ে দেখল সাবরেজিস্ট্রারবাবু আছেন, দুইজন নবীন উকিল, মোক্তার, কমিটির প্রেসিডেন্ট হরদয়াল চক্রবর্তী। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী। অটলবাবু। প্রোফেসার হিরণ্ময় ঘোষাল।

এঁরা মেয়ে স্কুলের সমর্থক, সহায়ক, রক্ষক ও পরিচালকমণ্ডলী।

বোঝা গেল কমিটি জরুরী মিটিং ডাকিয়েছিল। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এসেছে লিলি নন্দী, ইন্সপেক্টরের স্ত্রী, পুলিশ সাহেবের মিসেস ও দুই উকিল গিন্নী জ্ঞানদা আইচ ও মানদা রাহা। কমলা খাস্তগীর এরা তো আছেই।

অর্থাৎ এঁদের অনেকেরই মেয়েরা এই স্কুলে পড়ছে। মেয়েদের শুভ-অশুভ ব্যাপারে গার্ডিয়ানরা কত বেশি সজাগ ও সতর্ক, কি সন্দিগ্ধ বা নিশ্চিত ক'ঘণ্টার জন্যে একটু ইংরেজি-বাংলা পড়িয়ে মিস সেন তার গুরুত্ব কতটুকু উপলব্ধি করতে পারবে।

বলাবলি করলেন জ্ঞানদা মানদা।

সাবরেজিস্ট্রারের শাদা পাকা চুল-সম্বলিত মাথা সকলের আগে নড়ছে কি না সকলের চোখ গেল সেদিকে। অর্থাৎ বর্তমান হেড মিস্ট্রেসকে স্কুলে আনানো সম্পর্কে সাবরেজিস্ট্রারবাবুই গোড়ায় উৎসাহ

দেখিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। মোহিনীবাবু বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। মুখে হাসির খোঁচা। সুতরাং মুরারি হাজরাকেই অপ্রীতিকর নোটিশটা পড়ে শোনাতে হ'ল হেডমিসট্রেস অরুণা সেনকে ডেকে, সামনে দাঁড় করিয়ে।

এক পক্ষকালের সময় দেওয়া হচ্ছে কমিটি থেকে অরুণাকে যেন টিচার্স কোয়ার্টার ছেড়ে সে চলে যায়, কেননা তখন থেকে তাঁর এই স্কুলের চাকরিও খতম।

কারণ পাবলিক তাঁর উপর অসন্তুষ্ট।

এখানকার সামাজিক কায়দা-কানুন, নিয়ম ও শৃঙ্খলা এবং রুচি-অরুচি-গুলো তিনি ধরতে পারেননি। পারছেন না।

শিক্ষিতা যদিও।

জনমানসের শিক্ষা ও রুচির সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে চল্‌তে তিনি অপারগ।

অফিসিয়াল ভাষায় হেডমিসট্রেস ইনএফিসিয়েণ্ট।

একটা ইনষ্টিটিউটের শিরে বসে ছেলেমানুষী করা শোভন নয়।

তিনি নলিনী মোক্তারকে চটিয়েছেন তাঁর মেয়ের 'কনে দেখা' ছুটির দরখাস্তের তলায় মোটা লাল পেন্সিল বুলিয়ে। এক নম্বর অভিযোগ।

তিনি আজ পর্যন্ত স্থানীয় উইমেন্‌স এসোসিয়েশনের সভ্যপদভুক্তা হননি। দুই নম্বর অপরাধ। এর কারণ কি।

এটাই চরম জিজ্ঞাস্য গার্লস স্কুল কমিটির কাছে সাধারণ নয়, জনসাধারণও কেবল নয়, এলাইট ক্লাশের। যে শ্রেণীর মন বুদ্ধিতে মুকুরের মতন ঝকঝক করছে, রুচি ও সৌকর্যবোধে চকচক করছে শহরটির মেটাল-করা সড়কটির মতন। অর্থাৎ এতটা আধুনিক প্রগতিসম্পন্ন এখানকার শিক্ষিত সমাজ।

এই শহরে ইলেকট্রিসিটি এসেছে, ওয়াটার ওয়ার্কস হয়েছে। ক্লাব ঘর, টাউন হল, বারলাইব্রেরী, চেরিটেব্‌ল হস্‌পিট্যাল, মডেল ফার্ম, একটা রাইস মিল, কলেজ, গেস্ট হাউস, কুটির শিল্পের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। দুটো ডেয়ারী ফার্ম। কি নেই। শিল্পে, সম্পদে, ধনে-জনে আধুনিক সভ্যতার কলা-লক্ষ্মীর মতন ছোট শহরটা বাড়ছে। এর অগ্রগমনের জন্যে স্থানীয় মুরুব্বিদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ববোধকে অবজ্ঞা করে স্থানীয় গার্লস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অরুণা সেন। এখানকার মাননীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দীর নবম শ্রেণীতে পাঠরতা দুই কন্যা ইরা-মীরার পিক্‌নিকের ছুটির দরখাস্ত আজ না-মঞ্জুর করতে পারল হেডমিস্ট্রেস কোন্ সাহসে।

মেয়েদের পিক্‌নিকে যাওয়া সম্বন্ধে মোহিনীবাবুর মত ছিল না শুধু, নির্দেশই ছিল। যেতেই হবে। কেননা এর পিছনে তাঁর বড় মেয়ে লিলি আছে। পুলিশ সাহেবের স্ত্রী আছেন। শহরের অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের মেয়ে ও স্ত্রীরা প্রত্যেকে আছেন। অর্থাৎ এককথায় এ শহরের গোটা নারী-সমাজ এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট।

তাও একটা শনিবারের জন্যে ছুটি চাওয়া।

ইরা মীরাও যাচ্ছে সেদিন নদীর ওপারে পিক্‌নিক করতে বড়দের সঙ্গে।

ইরা মীরার এই দরখাস্ত বাতিল করার অর্থই হল শহরের মহিলা সমিতিকে জেনে শুনে অবজ্ঞা করা। না হলে এক শনিবার মেয়েদের ছুটি না দিতে চাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে।

ওরা যথেষ্ট বড় হয়নি।

ভালর কাছে, আদর্শের সামনে ছোট-বড়র কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? বা নির্দোষ আনন্দের কাছে? সাব-রেজিস্ট্রার শুধু নোটিশই পড়ে

শুনিয়েছিলেন। মোহিনীবাবু রীতিমত একটা বক্তৃতা দিলেন উপস্থিত সভার সামনে।

অরুণা চুপ করে রইল।

হেডমিস্ট্রেসের কণ্ডাক্ট সম্বন্ধে সভায় প্রশ্ন উঠল এবং এর জন্যে কলিগ্ তো বটেই কো-রেসিডেণ্ট হিসাবেও কমলা খাস্তগীরকে আগে প্রশ্ন করা হ'ল।

কমলা প্রেসিডেণ্টের চোখের দিকে চেয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, 'অতশত তো বোঝা যায় না। অতিরিক্ত রিজার্ভ তিনি। অন্ততঃ এটুকু বলতে পারি, এবং—' ঢোক গিলে খাস্তগীর কমিটিকে বলল, 'আন-সোস্যাল।'

জ্ঞানদা মানদা ঘাড় নেড়ে বলল, এই স্কুলের পূর্বতন হেডমিসট্রেস এ রকম ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে শহরের প্রত্যেকটি অভিভাবিকার আত্মীয়তাবোধ জন্মে গিছল। সে জন্যে মেয়েদের প্রতিও আগের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্নেহের সীমা-পরিসীমা ছিল না। শিক্ষাদানের সঙ্গে স্নেহের যোগ না থাকলে সেই শিক্ষা মূল্যহীন।

অরুণা চুপ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আর কে কি বলে শুনছিল।

সুশী চুপ করে।

লিলি ও সুশী এই প্রথম পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করছে। সুশী দাঁড়িয়েছিল কমলার হাত ধরে।

অরুণা দেখল সভার একটু দূরে আলাদা ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেদিনের সেই দুই নবীন অভ্যাগত। পঙ্কজ গুপ্ত ও হীরেন পালিত। সাব-রেজিস্ট্রারের পাশে দাঁড়িয়ে যোগীন ডাক্তার। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো কথাই বলেননি।

যেন সাব-রেজিস্ট্রারের মতন তিনিও অরুণার জন্যে খুব দুঃখিত এবং লজ্জিত। টিচার্স কোয়ার্টারে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। বিদেশিনী মেয়েটির জন্যে তাঁর সিম্পেথিও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অরুণা যে একটার পর একটা ক্রমাগত অসংলগ্ন, অসামাজিক সব কাজ করে বসবে তা কে জানত।

সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞানদা মানদার সঙ্গে মোহিনীবাবু এবং প্রেসিডেণ্ট হরদয়াল চক্রবর্তী বেরিয়ে গেলেন। তারপরে বেরিয়ে যান ডাক্তার ও সাব-রেজিস্ট্রার, পিছনে স্কুল কমিটির অন্যান্য সদস্য, তারপরে লিলি, কমলা, সুশী, ইন্সপেক্টরের স্ত্রী,—এর পিছনে হীরেনবাবু, পঙ্কজবাবু, নলিনী মোক্তার। সকলের পিছনে,—অরুণা একটু অবাক হ'ল। তিনি যে এসেছিলেন তার আগে তার চোখে পড়েনি। প্রবীণ এবং স্কুল কমিটির প্রাক্তন সেক্রেটারি অটল দত্ত।

এখন তিনি অপাংক্তেয় হয়ে গেছেন।

আজকের দিনে তাঁর মতামতের কোনো দাম নেই।

আগের একটা সভাতেই দেখা গিছল তাঁর রুগ্ন শুকনো গলার প্রতিবাদ মোহিনী নন্দীর বিস্ফারিত সক্রোধ হুঙ্কারে থেমে গেছে। 'শাট্ আপ'—মোহিনীবাবু অটলবাবুকে বলছিলেন, 'আপনার এই কন্জারভেটিভ আইডিয়ার আমরা প্রশ্রয় দোব না।' সেদিন ছিল নলিনী মোক্তার আহূত সভার বিচারক। আজকের সভা স্বয়ং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের দুহিতাদের নিয়ে।

অটলবাবুকে দেখে অরুণার ফের মনে পড়ল কথাটা। চুপ করে সে চেয়ে রইল মাথার ওপর আতাগাছের ছোট্ট নরম একটা প্রশাখার দিকে। বৃদ্ধ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

অরুণার মনে পড়ল হঠাৎ সুশীর মুখ।

এতদিন ও ভয়ে ভয়ে ছিল, আড়ষ্ট হয়ে ছিল হেডমিসট্রেসের কড়াকড়ির জন্যে। এবং অসন্তুষ্ট। আজ প্রকাশ্য বিচারে ঠিক হয়ে গেছে কমিটি কোন্ দিকে। কি চাইছে একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে। সভ্যা হতেই হবে তাকে মহিলা সমিতির। নয়তো চাক্‌রি খতম। এই ভয়ে, এই দুশ্চিন্তায় ও সভা শেষ হতে না হতে বেরিয়ে গেল লিলির হাত ধরে? আজ সুশীর ফিরতে রাত হবে, অরুণা ভাবল।

'আপনি আমায় বল্‌তে পারতেন, আমায় বলছেন না কেন—' সাব-রেজিস্ট্রার অসন্তুষ্ট। ঠিক বৃষ্টি না হলেও হাওয়া জলো হয়ে আসছে বিকেলের দিকে। শীগ্‌গীরই মনসুন শুরু হবে। মুরারি হাজরা গলায় কমফর্টার জড়িয়েছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে না অসুখ-বিসুখ হয় ভয়। কফের ধাত।

ডাক্তার মফঃস্বলে গেছে। কাছেরই কোন গাঁয়ে। হঠাৎ জরুরী কল এসেছিল।

বাড়িটা চুপচাপ। চেরী আজ আবার গেছে বাইরে। নীহারই পাঠিয়েছে রাসুকে দিয়ে। শেয়ালের মত দেখতে হ'লে হবে কি ভারি চটপটে, মজুর হলে হবে কি মগজে জিনিস রাখে খোঁড়া, বলল নীহার মনে মনে। এক বেলার মধ্যে চেরীকে সব ক'টা সিনেমা অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসের নাম শিখিয়ে এনেছে!

কাল রাত্রে এ সম্পর্কে যতগুলো প্রশ্ন করেছিল নীহার সব ক'টার উত্তর দিতে পেরেছে চেরী। এক কথায় যাকে বলে ফুল মার্ক পাওয়া। 'সে জন্যেই, বলি বাহিরে যেতে টেতে হয়।' নীহার অনেকদিন পর

বুকের মধ্যে শান্তিবোধ করেছিল, কাল রাত্রে সে ঘুমিয়েছে ভাল। এটা নিশ্চয়ই খোঁড়ার উৎসাহ। নীহার এখন আবার অনুমান করল। কাল সিনেমার ছবিগুলো দেখার পর নাকি রাসু চেরীকে বেড়াতে নিয়ে গিছল একেবারে প্যারাডাইজ রেস্টুরেণ্ট অবধি।

রেস্টুরেণ্টে তখন রাজ্যের মেয়ে খাচ্ছিল। সন্ধ্যা সবে। দলে দলে ছেলেরা ঢুকছে। দরজার বাইরে থেকেই দেখা গেছে এসব। চেরী দেখছিল। রাসু দেখিয়েছিল।

এবং নিজে দেখে-শুনে এলে ওই বয়সে যা ইচ্ছা হয়। যা স্বাভাবিক।

নিজের মুখে চেরী আজ সকালে বলছিল, 'একদিন রেস্টুরেণ্টে ফাউলকারী খাব, মা।'

'যাও না।' গম্ভীর মুখে নীহার প্রশ্ন করছিল, 'আর কি পাওয়া যায়, আর কি তৈরী করছে ওরা ?'

'অম্‌লেট, গ্রীল, পুডিং, চপ্, মোগলাই পরোটা, চিংড়ি কটলেট্, এগ্ অন্ ব্রেড্……'

চেরীর মুখে নীহার একসঙ্গে এতগুলো নাম শুনবে আশা করত না।

যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

'কত মাইয়াসেলে রুজ সইন্ধ্যায় রেইস্টুরেণ্ট মারসে।' দাঁত বের করে অল্প অল্প হাসছিল রাসু। 'আমি তো রুজ দেহি।'

'যাবেই তো, এটা শহর।' নীহার বলছিল আড়চোখে চেরীর দিকে চেয়ে। 'লিলিরা তো বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েই একবার রেস্টুরেণ্টে ঢুঁ মারে। যখনকার যা ফ্যাসান।'

'আমি বল্‌ছি, আমিও বলছিলাম দিদিমণিরে কাইল, আইজকাল শহরে মাইয়্যাসেলে কত চালাকচতুর অইছে, দিদিমণি অখনো যেন দুধের খুকী।'

চেরী সম্পর্কে ছোক্‌রার মন্তব্য নীহার সহ্য করল। করতেই হবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কাজ হবে না।' তৎক্ষণাৎ ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিয়েছিল ও মেয়ের হাতে।

'যাও, আজ বিকেলেই ও দিকটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখে এসো।' বলছিল ও, 'পাহাড় ছাড়াও যে দেশ আছে, জঙ্গল ছাড়াও যে জমি আছে, চারদিক ঘুরে-টুরে দেখতে হয়। তোমার বয়সের আর দশটি মেয়ে কি করছে, কতটা এগিয়ে গেল তারা বাইরে গিয়ে একটিবার তাকাও। রেস্টুরেণ্টে খাবে কথাটা কি তোমার অনেকদিন আগেই বলা উচিত ছিল না, কি আগেই বোঝা।' এখন আবার নীহার নিজের মনের কথাগুলো বলল।

বিকেল পাঁচটার পর বেরিয়ে গেছে ওরা।

এখন ছ'টা ত্রিশ।

ইচ্ছা করেই নীহার রাস্থটাকে সঙ্গে পাঠিয়েছে। খোড়া খুশী।

'বেড়া বড় হোক, বাড়ুক মেহেদীর মাথা। বেড়া দিয়ে আর কাজ নেই। গাছের গুড়িশুদ্ধ আমি কেটে ফেলব এবার, তোকেই দিয়েই, যাক্‌ না দু'দিন।' রাস্থকে তখন নীহার বলছিল, 'বিকেলে বিকেলে ওকে এটা ওটা দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আয়। শহরের উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম।'

অর্থাৎ চেরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে নীহার একটু খোচা দিচ্ছিল।

অবশ্য এখন নীহারের কষ্ট হচ্ছে,—ভাবতে গেলে, এসবের জন্যে, ঠিক ও তো দায়ী নয়, ওর পরিবেশ।

'কোথায় ও বড় হয়ে এসেছে।' নীহার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

'সাত পাহাড় খুঁজলে রেস্টুরেণ্ট পাওয়া গেছে নাকি।'

'সেখানেই ব্রাণ্ডার হয়েছে আপনাদের মিসেস সেন।'

কম্‌ফর্টারের ভাঁজ একটু ঢিলে ক'রে দিয়ে সাবরেজিস্ট্রার বললেন,

'তা নিশানাথ সংক্রান্ত ইচ্ছাটা আপনি আমায় বললেন না কেন, এ্যাদ্দিনে আমায় একবার বললে পারতেন।'

'কি ক'রে বলি। এই তো বিদ্যা এই তো বুদ্ধি।'

'আরে ধ্যেৎ ধ্যেৎ।' মুরারি হাজরা ডাক্তারগিন্নীর চোখে চোখে চেয়ে ভুরু কুঁচকোয়, 'আপনার মতন একজন আধুনিকা মা,—একটা জিনিস ভুল করছেন, মিসেস সেন! অবশ্য যদিও অ্যার্লি ম্যারেজ সাপোর্ট করা আমার পক্ষে ঠিক নয়, তবু বলব, যদি ইচ্ছা থাকে, যদি বোঝেন মেয়েকে পড়িয়ে লিখিয়ে শিখিয়ে তেমন কাজ হবে না তার চেয়ে বরং,—হ্যাঁ, এই তো প্রপার এজ্ বিয়ের। আর অই যে বল্লেন, কি,—বিদ্যাবুদ্ধি।' সাবরেজিস্ট্রার পাথরের দাঁতে এবার অন্তরঙ্গ হাসলেন। 'যুগ যতই আধুনিক হোক্ একটি জায়গায় ও ঠিক দাঁড়িয়ে আছে,—মিসেস সেন।' নীহারনলিনী ও মুরারিবাবু ছাড়া বারান্দায় আর কেউ নেই, তখন। বিকেলের রোদ মিলিয়ে এসেছে। নতুন পাতা গজানো নেবু গাছের মাথায় একটা নাম-না জানা পাখি রি রি শব্দ ক'রে ডাকছিল। ডাক্তারের ডিস্পেনসারীর পাশের বাদাম গাছ থেকে হঠাৎ ঠুক্ ক'রে একটা বাদুড়-চিবানো থেত্লানোমতন বাদাম পড়ল নীচে ঘাসের জমিতে।

সাবরেজিস্ট্রার সেদিকে চোখ রেখে কথা বলেন। 'ঘি আর আগুন। ও পেলেই খায়। বুঝছেন না, বিদ্যাবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে কম।'

নীহার চুপ ক'রে রইল।

'মেয়েদের যে জিনিস দেখে ছেলেরা আজকাল ঝোঁকে বেশি। রং। তাতে আপনার মেয়ের সকলের ওপর নম্বর আছে, সুতরাং ভয় কি।'

নীহার একটা ঢোক গিলল।

'আজকে কোথায় পাঠালেন?'

'রেস্টুরেন্টে, গেছে।'

'সঙ্গে কেউ আছে কি, একলা ?'

'হ্যাঁ, ওই একলাই একরকম,' নীহার কুশনের ওপর পা তুলে বসল। 'একটা চাকর গেছে সঙ্গে। তা ও না থাকারই মতন।'

সাবরেজিস্ট্রার একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন।

'আজ তিন দিনের মধ্যে ডাক্তারকে ব'লে ব'লে আমি পারলাম না কথাটা তোলাতে—'

'বিশেষ কাজ হয় না ওসবে।' সাবরেজিস্ট্রার ডাক্তার-গিন্নীর চোখের দিকে তাকান। 'ক'টা কেস্ আর আজকাল দেখছেন—বাপ কি, মা'র ইচ্ছায় কোনো ছেলে একটি মেয়েকে পছন্দ করেছে। উঁহু।' সাব-রেজিস্ট্রারের ছোট মাথা দুলে উঠল। 'ও বাবা ঢালুর দিকে জল আপনা থেকে ধেয়ে যায়। মেয়েকে ছেড়ে দিন। আপনা থেকে হয়ে যাবে। আসল কথাটা হ'ল চোখে পড়া, চোখে লাগা।' মুরারি হাজরা নিজের চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে আরো কতক্ষণের জন্যে পাকা হয়ে বসেন। 'ওর গায়ের রং ভাল যখন তখন আর পায় কে।'

নীহার একটা ঘন নিঃশ্বাস ফেলল।

'নিশানাথ নাকি প্যারাডাইজে মাঝে মাঝে আসে ?'

'আসুক।' সাবরেজিস্ট্রার ঘাড় বাঁকালেন। 'তা ছাড়াও আমি আপনাকে পরামর্শ দিই একদিন কমলাকে ডাকুন। চা খাবার একটু নেমন্তন্নই করুন না কেন আপনার এখানে। কমলা খুশি হবে। খুশি হবে, ওকে খুশি রাখা এই জন্যে বল্‌ছি যে রায়ের বাংলোয় ওর আজকাল বেশ আসা যাওয়া আছে,—যদি ও—'

'ও বুঝেছি।' যেন অন্ধকারে হঠাৎ আলো দেখতে পেল নীহারের দুই চোখ। 'শুনছি নিরঞ্জন রায়ের খুব সুনজরে আছে নিশানাথ। যদি

কমলাকে দিয়ে রায়ের কাছে কথাটা তোলাতে পারি, মিঃ রায় যদি নিশানাথকে বলে—'

'মোটেই না। অত ঘুরপথে যাচ্ছেন কেন।' সাবরেজিস্ট্রার চোখ ছোট করলেন। 'কারোর কাছে প্রস্তাব তুল্‌তে হবে না। যেদিকে গড়াবার জল ঠিক সেদিকে গড়িয়ে যাবেই। কমলা 'বিয়ে কর' বলতে যাবে কেন! চেরীকে শুধু সঙ্গে নিয়ে নিরঞ্জন রায়ের বাংলোয় দিনকতক খুব যাবে আসবে সমিতির কাজে।'

'চেরীকে এখনো মেম্বার করাইনি।'

'না করানোটাই তো আপনাদের ভুল।' যেন সাবরেজিস্ট্রার রাগ হয়ে কথা বললেন, 'এসমস্ত ব্যাপারে এদিনে শৈথিল্য দেখাবার কোনো মানে হয় না, মিসেস সেন।'

নীহার চুপ ক'রে থেকে প্রবীণ নাগরিকের ভৎ‍সনা সহ্য করল।

'দেখছেন না লিলি কি ওপাড়ার অই যে কার মেয়ে বেশ লম্বা-মতন, শর্মিষ্ঠা নাম, শহরের যুবকদের চোখে প্রায় সোনা হয়ে ওঠল। তাই বলছিলাম ক্রমাগত চোখে লেগে থাকা, পড়ে থাকা।'

'যুবকরা কেন।' নীহার গলা টান ক'রে বলল, 'আমি তো শুনছি ডিপ্‌টি মুন্সেফ পুলিশ সাহেব এস-ডি-ও'র বাংলোর রাস্তা ছাড়া লিলি পথ হাঁটে না।'

'খুব হাঁটুক।'

সাবরেজিস্ট্রার ঠোঁট বাঁকা করলেন। 'মাই সাজেশন আপনি চেরীকে কমলার সঙ্গে সোজা রায়ের বাংলায় পাঠান। নিশানাথ রাতদিন ওখানে আছে।'

'আইডিয়াটা আমার মাথায় আসেনি এ্যাদ্দিন।' সহাস্য কৃতজ্ঞতায় নীহারনলিনীর সুন্দর চোখ ঝল্‌মল করছিল। 'সত্যি আপনি সময় সময়

এমন সাজেশন্ দেন অবাক লাগে। আমি কালই টিচার্স কোয়ার্টারে চাকরটাকে দিয়ে চিঠি পাঠাব।'

'বুঝলেন,' নীহারের সুন্দর চোখের দিকে চোখ রেখে বুড়ো হাজরা হঠাৎ মিটি মিটি হাসেন। 'যদিও মোহিনী আমার বন্ধু, আমার ছেলেবেলা থেকে বন্ধু তবু, মাঝে মাঝে এখন আমি লক্ষ্য করি এবার ইলেকৃশন জিতেছে পর থেকে ওর যেন কেমন একটা ভ্যানিটি দেখা দিয়েছে যা আমি, মিসেস সেন, বলতে কি, মোটেই স্ট্যাণ্ড্ করতে পারি না।'

একটু থেমে মুরারি হাজরা মৃদু মস্তক সঞ্চালন করলেন, 'ঐ আমি যে রাস্তা বাৎলে দিলাম সেই রাস্তায় অগ্রসর হ'ন। নির্ঘাৎ জয় হবে। ইলেকৃশনে জিতেছে বটে মেয়ের বর সিলেকৃশনে যেন ওকে আর জিততে না হয়। লিলির চেয়ে চেরী বয়সে অনেক ছোট, তাই নয় কি?'

নীহার চিবুক নাড়ল।-

'না, না, ঐ যা বললাম। ছেলেরা প্রোগ্রেসিভ হয়েছে বটে এবং বিয়ে-না হওয়া বড় বড় মেয়েদের সঙ্গে ফুরফুর করে ঘুরছেও বটে, আসলে বিয়ে করার সময় ওরা টেণ্ডার এজ্ই খোঁজে। মিথ্যা বললাম কি।' কথার শেষে সাব-রেজিস্ট্রার শব্দ করে হাসেন।

নীহারও অল্প হাসল: হাসল কিন্তু তার বুকের ভিতর পর্যন্ত সে হাসি গেল না। ওপর থেকেই নিভে গেল।

নীহারের মনে এখন আর এক দুশ্চিন্তা।

'লিলির জন্যে মোহিনীবাবু চেষ্টা করছেন বুঝি?'

'না, সেদিন বলছিল ছোট সময়ে দু'জনের ভাব ছিল।'

'তা সে ভাব আর এখন থাকে নাকি। ছেলে এখন গাড়ি চড়ে এতবড় একটা মনিব-মনিবানীর জন্যে শিকার করে বেড়ায়। ভাল মাইনে

পাচ্ছে। চেরীর চেয়ে লিলি বয়সে কম সাত বছরের বড় হবে, কেমন একটা বুড়োটে ভাব, চোখের কিনারে দেখেননি ?'

যেন একদমে বলে ফেলল নীহার।

'তা আপনি ভাবছেন কেন।'

পঞ্চমবার অভয় দিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার উঠে দাঁড়ালেন।

'ও কি চললেন নাকি।' আর্তনাদের মত শোনাল নীহারের গলার সুর। 'একটু বসুন। আমি বড় একলা। অসহায় মেয়েকে নিয়ে। ডাক্তার তো মেয়ের জন্যে কিছু করল না। সব দুশ্চিন্তা আমার ঘাড়ে।'

'কিছু না। মেয়েকে যখন একবার বাইরে পাঠিয়েছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি খামোকা ভাবছেন।' সাব-রেজিস্ট্রার উঠে আস্তে আস্তে বারান্দা পার হয়ে নীচে নেমে গেলেন।

কিন্তু নীহারের ভাবনা দূর হল না।

অন্ধকার হয়ে গেছে। মেনকা-মীনার-এর গায়ে আগুনের ফুল হয়ে আলোর মালা জ্বলছে। আজ আর সেখানে নয়। সিনেমা ছেড়ে নীহারের মন একটু এগিয়ে গেছে শহরের গভীরে। প্যারাডাইজের ভিতরে সে যায়নি। তবু এখানে, এই ইজিচেয়ারে শুয়েই নীহার কল্পনার চোখে দেখছিল ঘরের কোন্ কোণায় কোন্ টেবিলটিতে চেরী বসবে। জায়গায়টায় যথেষ্ট আলো আছে কি।

নীহারের বুকের ভিতর দুরদুর করছিল।

ময়ূরপেখম রঙের জামা রাত্রের আলোয় জ্বলে বেশি।

যেন নীহার চেরীর ব্লাউজটা চোখের ওপর দেখছিল। রেস্টুরেন্টে বেরোবার সময় নীহার আজ নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল মেয়েকে।

তারপর রামুকে মনে পড়ল নীহারের! যদি রামু ওকে চালিয়ে নেয়।

আজ প্রথম দিন চটপট্ কথা বলতে না পারুক, না মিশুক কারোর সঙ্গে, খেতে গেছে খেয়ে আসুক।

কিন্তু কাল থেকে নীহার প্রশ্ন করবে। রুটিন। রুটিনের মত যদি মেয়েকে বাইরে না চালানো হয়, কি না দেখানো হয় আধুনিক আলো, এ জন্মে আর ও কিছু শিখতে পারবে না।

নীহার দুই চোখ স্তিমিত করে বেড়ার এপারের একটুকরো অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। টুপ্ টুপ্ বাদুড়ে চিবানো বাদাম পড়ছিল ওপর থেকে।

নীহার উঠল না নড়ল না।

সে মানুষ ডাক্তার।

বাড়িতে থাকলে এখনি হয়ত রিভলবার টেনে বাদাম গাছের বাদুড় চড়ুই শিকারে লেগে যেত। কেবল হৈ চৈ। পাহাড়ী ধরণ-ধারণ পুরোপুরি কাটছে না লোকটার। আশ্চর্য।

ডাক্তার যতক্ষণ বাইরে থাকে, সেজন্যেই সে নিশ্চিন্ত।

বরং নীহার ততক্ষণ চুপ করে চেয়ারে শুয়ে তার দায়িত্বের কথা ভাবে।

নীহার ভাবছিল আজ রেস্টুরেন্টের দরজায় ধোঁয়াটে রঙের গাড়িটা যদি একবার দাঁড়ায়। থাক না সঙ্গে মিঃ রায়, কি রায়গিন্নী। অত ফর্সা রং। চেরীর উপর নিশানাথের নজর একবার পড়বেই। ঘি আর আগুন। সাব-রেজিস্ট্রার বলে ভাল।

কাল সকালেই নীহার কমলাকে ডেকে পাঠাবে। দিনের প্রথম কাজ।

একলা অন্ধকারে চুপ করে বসে বসে নীহার ঠিক করতে লাগল আগামী দিনের প্রোগ্রাম। এখানে কেবল মেয়ের বিয়ের প্রশ্ন নয়। মোহিনীকে আর এগুতে না দেওয়া। সত্যি, নীহারের কেবল দুঃখ চেরী যদি একটু চলনসই রকমেরও চালাকচতুর হ'ত।

অন্ধকারে আবার একটি বাদাম টিব্ করে নীচে পড়ল। নীহার সোজা হয়ে বসল ভোলাকে ডাকতে—আবার একটু চায়ের জল বসাক।

চেরী যতক্ষণ না ফেরে এখানে বসে বার বার চা খাবে ঠিক করল নীহার। মেয়ে তাড়াহুড়ো করে ঘরে না ফিরুক, মা মনেপ্রাণে এই চাইছিল। মোটে তো সন্ধ্যা। আজ যখন চেরী প্রথম বেরিয়েছে বেড়াতে, হ্যাঁ, প্রায় একলাই বলা চলে, নীহার নীজে, কি স্কুলের ঝি, কি ডাক্তার, কেউ ওর সঙ্গে নেই। একটা খোঁড়া।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামল। গ্রীষ্মের পর শহরে এই প্রথম বর্ষণ।

প্যারাডাইজ আজ ভিড় শূন্য। মেঘ-সজ্জার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর দল ডুব মেরেছে। ছেলে ছোকরা কি মেয়ের সংখ্যাও কম।

অনেকে এসে বেলাবেলি খেয়ে বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনে কেমন যেন তেমন আড্ডা জমল না। জমছিল না।

না কি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রেঁস্তোরার 'মেনু' পরিবর্তন ঠিক মত ছিল না? তাই খদ্দেরের সংখ্যা আজ কম? অনেকেই আসেনি, অনেকের বন্ধুরা, বান্ধবীরা অনুপস্থিত। নতুন বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুচমুচে চিংড়ি-কাটলেট রাই আর পিঁয়াজ কুচি রেডি হয়েছে, তৈরী হচ্ছে মোগলাই পরোটা, ভেড়ার মাংস, চিকেন ফ্রাই। রেস্টরেণ্টও আধুনিক

শহরের মেজাজ বোঝে, ক্ষুধা ও জিহ্বার তার। আসবে, খাইয়ে লোক যারা তারা ঠিক আসে। তারা আসে একটু অন্ধকার হলে—একটু রাতে। বিকেলে কি সন্ধ্যায় আসে কলেজের ছেলেরা মেয়েরা, একটি দুটি স্কুলের ছেলে, স্কুলের মেয়েও দেখা যায়। আর বুড়োরা আসে তখন।

স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ের হাতে কত পয়সা থাকে যে রেস্টুরেন্টে রোজ এসে কারী কাটলেট খাবে। বুড়োরা ভেজিটেবল চপ কি ডিমের বড়ার ওদিকে বড় একটা যায় না।

সে জন্যেই সন্ধ্যার আগে প্যারাডাইজের উনুনের ধারে দেখা যায় সেদ্ধ আলু আর ফেটানো ডিম। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় হাঁড়িতে মাংস আর গাদা গাদা পরোটা তৈরী শুরু হয়।

প্যারাডাইজের এক কোণার ঘরে একটা টেবিলে আজ দেখা যায় দুই বন্ধুকে।

কামরায় অন্য লোক নেই।

কাটলেট সাবার করে তারা মাংস রুটি ধরেছে।

অন্তরঙ্গ গলায় হীরেন পালিত হো হো করে হেসে ওঠল। একটা গ্রীলে কামড় দিতে দিতে বলল, 'সূর্যমুখী না ঊর্ধ্বমুখী।'

পঙ্কজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'হলদে শাড়িতে সত্যি মনে হচ্ছিল সূর্যমুখী' বলল পঙ্কজ।

হীরেন বলল, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু শহর ছেড়ে চলল যে। চাকরিটি এবারে গেল।'

'ইস কি সাংঘাতিক আমাদের এ শহর হয়েছে একবার চিন্তা কর ছিরু।' বলে পঙ্কজ ভুরু কুঁচকোয়। তার ফ্রেঞ্চকাট গোঁফ রাগে ঘন ঘন কাঁপছে, গোটা শহরটার প্রতি অকথিত বিদ্বেষ। 'শালা ওই মোহিনীই উঠে পড়ে মিস সেনের চাকরিটা খেলে।'

হীরেন গরম পরোটায় কামড় বসিয়ে বলল, 'খাবে না ? তোমার সূর্যমুখী শহরের পুরুষ তো দূরে থাক্—মেয়েদেরই পাল্‌স বুঝছে না। এই করে কখনো মেয়ে স্কুলের হেডমিসস্ট্রেস হওয়া চলে ? অহঙ্কার বেশি, সাধে কি বলি উর্ধ্বমুখী।'

পঙ্কজ চুপ করে রইল।

'কোনো গেদারিং-এ গেলাম না, সোসাইটি চিনলাম না, পার্টিতে খেলাম না,—ও বাবা, পাব্লিক এ সমস্ত ক্ষমা করবে কেন।' হীরেন বলেই চলল।

পঙ্কজ কাঁটাচামোচটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল।

বড় এক টুকরা পুডিং ভেঙ্গে জিভের ডগায় তুলে হীরেন বলল, 'এখন উইমেনস এসোসিয়েশনের ভয়েস বেশি। বারো থেকে বাষট্টি বয়স হয়েছে এমন প্রত্যেকটি মেয়ে ও মহিলা 'সমিতি' ঘেঁসে চলছে। যা ন্যাচারেল।'

'লিলিটা কি রকম সাজপোষাক করে রাস্তায় বেরোয় লক্ষ্য করেছ ?' পঙ্কজ বলছিল।

'করবেই, এখন বড় বড় দরবারে ওর গতায়ত।'

পঙ্কজ চুপ।

'শুনছি নিরঞ্জন রায় নাকি সমিতিতে খুব টাকা ঢালছে। কমলা কাল বলছিল, রায় সমিতির জন্যে আলাদা 'বাড়ি তৈরী করে দেবে।' কথার শেষে হীরেন পালিত গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে গুজগুজ হাসতে লাগল। 'সে জন্যেই তো লিলি কমলার এমন বড় পা হয়েছে, সজ্জায় এত বাহার।'

'যাক্ গে বাবা।' পঙ্কজ মস্তক সঞ্চালন করল, একটা নিঃশ্বাস ফেলল লম্বা রকম। 'ওসব হাতী ঘোড়ার পিছনে তো যাই নি, লোভও নেই।

বলছি,—বলছিলাম দিব্যি মাস্টারী করছিল মেয়েটা, ছিল নিরিবিলি টিচার্স-কোয়ার্টারে পড়ে। খামোকা কেন শহরশুদ্ধ লোক ওর পিছনে লেগে—'

হীরেন চুপ করে রইল।

পঙ্কজ বলল, 'মাইরি, ভারি লাভলি চেহারা অরুণার, এটা তো অস্বীকার করতে পারছ না।'

হীরেন অল্প মাথা নাড়ল। এবং হাসলও একটু।

'সবে পা বাড়িয়েছিলাম, সবে জমাতে শুরু করেছিলাম শিক্ষয়িত্রী কোয়ার্টারের,—'বলছিল পঙ্কজ। 'অমনি বিধি বাদ সাধল' পঙ্কজ শেষ করবার আগে হীরেন শব্দ করে হাসল। 'সূর্যমুখীর গোড়াশুদ্ধ কেটে দিলে লিলির দল।'

'সত্যি, ব্রাদার, এ দুঃখু আর ভুলতে পারছি না।'

'ভয় কি, সিংহাসন খালি থাকছে না। একজন গেলে আর একজন আসবেই।'

'আর আসবে।' সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে বিক্ষোভের রাশি রাশি নিঃশ্বাস নির্গত করল পঙ্কজ নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে। 'শরীরের এমন সুন্দর ছাঁদ আমি পৃথিবীতে আর দুটি মেয়েতে দেখব না। দেখতে চাই না।' বলে টেবিলের ওপর ছোট বড় প্লেট, ডিশ, জলের গ্লাস, কাঁটাচামোচের ওপর দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে মাথাকুটে পঙ্কজ ডুকরে কেঁদে ওঠল। ভাগ্যিস সেটা ছিল রেস্টুরেন্টের কামরা। বন্ধু হীরেন, উকিল হীরেন পালিত অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। চতুর ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন। 'নে, ওঠ', পঙ্কজের পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'একদিন একটু কথা কওয়ার পরই তুই যে অরুণা সেনের প্রেমে এমন হাবুডুবু খাবি, আমি আইডিয়া করতে পারি না। মাইরি।'

পঙ্কজ দুই হাতের ভিতর মুখ গুঁজে তেমনি পড়ে রইল।

'তুই বেজায় সেন্টিমেণ্টাল' হীরেন বলল।

যেন পঙ্কজের কান্নার ছঁসহাস শব্দই শোনা গেল এবার।

'তুই আরম্ভ করলি কি?' হীরেন আরেকটা খোঁচা দিল। 'না আমি সিরিয়সলি বলছি, এই পঙ্কা শোন্।'

পঙ্কজ নিথর নিস্পন্দ।

হীরেন রাগে গজ্‌গজ্ করতে লাগল। 'ম্যারেডম্যান তুই। কাল সকালে তোর বৌ আর একটা বাচ্চা নিয়ে মেটার্নিটি ওয়ার্ড থেকে খালাস পাচ্ছে। বাজার সওদা পড়ে আছে, এখনো এটা ওটা কেনা বাকি। আর রেস্ট্‌রেন্টে বসে এখন তুই কান্নার বাসর জমালি। তোদের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা বিপদ।'

যেন এবার পঙ্কজ গুপ্তর চেতনা হল। মুখ তুলল।

টেবিলের পাশে বয় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বিল। ছ'টাকা চৌদ্দ আনা দাঁড়িয়েছে মোট।

যেন পঙ্কজের মাথায় বজ্রাঘাত হল। কেননা বিল মেটানোর তারিখ আজ ওর। কাল খাইয়েছিল হীরেন।

'হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কি।' পিঠে খোঁচা দিল হীরেন। 'চট্ করে মিটিয়ে দে, বেরোনো যাক্। রাত হচ্ছে।'

রাত তেমন কিছু হয়নি। আসলে বিল মেটানোর জন্যে তাড়া। মনে মনে বলল পঙ্কজ। এবং নিজের অর্ধসমাপ্ত এক ডিস কাজু বাদাম ও হীরেনের সামনের স্তূপীকৃত বাসনকোসনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে সে টাকা ফেলল।

'নে চ, আর দাঁড়ায় না।'

অর্থাৎ সাত টাকা থেকে ফেরত দু' আনা আর কুড়িয়ে নিতে নেই,

ওটা বয়ের বখশীস, যেন হীরেন বলল পঙ্কজের দিকে চেয়ে, 'এসো এবার রাস্তায় নামা যাক্।'

হীরেন পালিতের পিছু পিছু পঙ্কজ গুপ্ত সুরসুর করে রাস্তায় নামল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

'মাইরি, এক পেগ্ টানলেই তোর কেন যে নেশা হয়ে যায়।' বলছিল হীরেন খোলা হাওয়ায় গলা ছেড়ে বকুনির স্বরে। ভেজা ফুরফুরে বাতাসে তার আদ্দির পাঞ্জাবি উড়ছিল। 'না হলে তুমি আজ এমন সর্বনাশটা করবে কেন।' বিড়বিড় করছিল পঙ্কজ অন্য দিকে চেয়ে। রুমালে কপালের ঘাম মুছছে সে। 'কি কুক্ষণে আজ হীরেনকে নিয়ে একটু ড্রিঙ্ক করতে গেছলাম। হসপিট্যাল রোডের দুপাশের বাদাম গাছের অন্ধকার দেখতে দেখতে আফসোস করছিল পঙ্কজ আর হাঁটছিল। সেখানে গেছে তার পনোরোটি তন্‌খা। 'কি করা, উপায় কি?' যেন নিরুপায়ের স্বরে পঙ্কজ বলল, শেষটায় নিজের মনে। 'খাবও এবং সঙ্গে হীরেন শালার মতন এক আধজন বন্ধুবান্ধবও থাকবে আর এমন সর্বনাশটি করবে আমার, তাই বলে আমি তো আর ওদের মত নেরোমাইণ্ডেড হতে পারি না।'

এই পরিতৃপ্তি এই সন্তোষ নিয়ে পঙ্কজ গুপ্ত হাঁটতে লাগল। যদিও সেই বিকেল থেকে হেডমিস্ট্রেসের খবর শোনার পর থেকে তার বুকের ভিতরটা খালি খালি ঠেকছিল।

'একটা রিক্সা ডাকলে কি ভাল হত না পঙ্কজ?' মোলায়েম গলায় হীরেন প্রস্তাবটা তুলল।

'ডাক।' বলল বন্ধু পঙ্কজ দীর্ণ ভাঙ্গা গলায়। এই প্রথম সে সিগারেট ধরাল নেশাভঙ্গ অবস্থার পর। 'কোথায়, ডাক না একটার জায়গায় তিনটে রিক্সা। ভাবনা কি।'

রাগ না নেশার ঝোঁক এটা ঠিক বুঝতে পারলে না হীরেন। যদিও একটা লাইট পোস্টের নীচে এসে গেছে দু'জন। পঙ্কজের মুখটা একটু ঘোরানো ছিল পাশের দিকে। আর সেদিকে দৃষ্টি যাওয়া মাত্র হীরেনও দেহে মনে এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করল।

লিলি, লিলির দুই বোন ইরা মীরা। শিউলি মজুমদার, রেখা বিশ্বাস, কনক সোম, মায়া ব্যানার্জি, অণু, রেণু, বীণা, সোমা। কমলা খাস্তগীর সুশীলা বোস, আভা চ্যাটার্জি। শহরের গুচ্ছের মেয়ে। এক রঙা শাড়ি, এক ধাঁজের খোঁপা। সকলের পায়ে আজ একরকম জুতো।

একধরণের ব্লাউজ গায়ে।

'কোথায় গিছল সব।' যেন রুদ্ধশ্বাসে হীরেন উকিল প্রশ্ন করল।

'পিক্‌নিক্। নদীর ওপারে চড়ুই ভাতি খেয়ে ফিরেছে সব।' রুদ্ধস্বরে উত্তর করল পঙ্কজ গুপ্ত।

'ওপাশের দু'জনকে চিনলাম না।' হীরেন।

'মোটে তো শহরে কাল আমদানী হয়েছে। ডিপ্‌টি বরুণ ব্যানার্জির দুই ভাগ্নী। রেবা সেবা।'

'কি অদ্ভুত হাঁটার স্টাইল লক্ষ্য করেছিস পঙ্কজ।' "হুঁ"।

'আমরা গেছি, আমরা মরেছি।' হায় হায় ক'রে উঠল হীরেন। 'এ থিং অব বিউটি ইজ্ জয় ফর্ এভার। কা'র লাইন পঙ্কজ?'

'জানি না, মনে নেই।' অপস্রিয়মানা ফুলের মিছিলের দিকে চোখ ছিল পঙ্কজের। প্রজাপতির ঝাঁক।

'মনে থাকার কথাও নয়, সাধে কি বলি, বলছিলাম তোকে তখন, বিয়ে টিয়ে ক'রে একেবারে কিম্ভুতকিমাকার বনে গেছি দু'জন। কি বলছিস গুপ্ত। সিগারেট বার কর্।' পঙ্কজ ভাবছিল কখন হীরেন একথা বলেছিল। নিঃশব্দে সে বন্ধুর হাতে ক্যাপ্‌স্টানের নতুন প্যাকেট

তুলে দিল। আর প্রায় মুদ্রিতচক্ষু হয়ে পিছনে-ফেলে-আসা দেবদারুর অন্ধকারে ঢাকা টিচার্স-কোয়ার্টারের ছবিটা মনে মনে আঁকছিল। শীগ্‌গীরই ও চলে যাবে। 'এই শহরে, আমাদের এমন ফিটফাট শহরে এত মেয়ে ধরল তোমার কেন ঠাঁই হ'ল না তা কি আমায় বলবে না অরুণা। একটিবার বলে যাবে না যাবার আগে।'

হীরেন সিগারেট ধরিয়ে তাড়া দিল। 'নে আয়, আবার দাঁড়িয়ে পড়লি যে। কাল কোর্ট ফোর্ট আছে কিনা, ডায়েরীতে ক'নম্বর মামলা।?'

'জানি না, খবর রাখি না,' শূন্যে হাত ঘুরিয়ে পঙ্কজ বলল।

সন্ধ্যার পর ঘরের পৈঠায় উবু হয়ে ব'সে আছে ফ্যাল্‌না।

যেন গালে হাত দিয়ে কি ও ভাবছে।

'আর কে সঙ্গে থাহে।' নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে ইমামবক্স সিগারেট খুলল একটা. দু'টো। 'ক'দিন ধইর‍্যা দেখছিস।'

চক্‌চক্ করছিল ইমামবক্সর চোখ। একটা সিগারেট তুলে দিল ফ্যাল্‌নার হাতে। 'খা, দামী পদ খাইয়্যা দেখ্।'

'কাঞ্চি।'

'শালা গোল্ড্ ফ্লেইক্।' ইমামবক্স ধমক দেয়। 'শালা তুই চিরকালের অজবুক।'

আচম্‌কা ধমক খেয়ে ফ্যাল্‌না নেতিয়ে যায়। দেশলাই জেলে ইমামবক্স নিজের সিগারেট ধরিয়ে ফ্যাল্‌নারটাও ধরিয়ে দেয়। তারপর স্বর মিঠা করে। 'বাংলোর এক নম্বরের চাকর কিনা আমি। বখ্‌শীস্ বখ্‌শীস্ মিলছে জোর। নিশাবাবু দিল একটা প্যাকেট।'

'মেন্‌জারবাবু তোমারে খাতির করে। আমাগো দ্যাশের ছাইল্যা নিশাবাবু।' ফ্যালনা একটু বিজ্ঞ হ'তে চেষ্টা করল। বুঝে অল্প অল্প হাসল ইমামবক্স। 'হুঁ, দ্যাশের ছাইল্যা না অইলে এমুন চালাক হয়,—সাহেব সাহেবনী নিশাবাবুর হাতের মুঠে। নিশা অখন ছ' আঙ্গুলে ছ'ডা আংটি পরে।' কথার শেষে ইমামবক্স লম্বা টান দেয় সিগারেটে।

'কাম কাইজ খুব ভাল করছে। সাহেব সাহেবনী পিয়ার করছে নিশাবাবুরে।' ফ্যালনা নিজের মনে কথা কয়।

চুপ থেকে ইমামবক্স একটুক্ষণ ভাবে।

'মন জুগাইলে ভূতে বাপ ডাকে।' এক চোখ ছোট ক'রে ইমামবক্স ফ্যালনার মুখের দিকে তাকায়।

'তুমি বুঝি নিশাবাবুর মন জুগাইছ।' বলছিল ফ্যালনা। ইমামবক্স হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। 'আদার বেপারী তোর জাজের খবরে কাম কি।'

পকেট থেকে গন্ধ মাখা রুমাল বার ক'রে ইমামবক্স মুখ মোছে। 'যে খবর জিগাইছি তার উত্তর দে। কোন্‌দিকে গেছে রাসু?'

ফ্যালনা চুপ ক'রে থাকে কতক্ষণ। ভুর্‌ ভুর্‌ করছে জায়গাটা মাথার তেলের গন্ধে আতরের গন্ধে। ফিন্‌ফিনে লুঙির ওপর চুড়িহাতা পাঞ্জাবি চড়িয়েছে ইমামবক্স। চাঁছা ঘাড় আবার যেন নতুন ক'রে চেঁছে এল সন্ধ্যার আগে। ইমামবক্সর পায়ে ফুল-তোলা পাম্পস্থ। ফ্যালনা লম্বা মতন একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বাবুর ফুলবাগানে কাজ ক'রে কেমন ফুলবাবুটি হয়ে গেছে ইমামবক্স হালে।

'নে।' আরো একটা তাজা সিগারেট ফ্যালনার হাতে তুলে দেয় ইমামবক্স। যেন অনেক খাতির করছে ও এই সন্ধ্যায় ফ্যালনাকে।

ইমামবক্স এদিকে এখন বড় একটা আসে না। বড়লোকের বাগানের মালী হয়ে বড়লোক বনে গেছে। আজ কি দরকারে ফ্যালনাদের দরজায়

ছুটে এসেছে। এসেই রাসুর কাণ্ডকারখানা শুনল সব। ফ্যালনা বলল পুরোনো দোস্তর কাছে।

যেন সেজন্যেই ইমামবক্স উঠোন ছেড়ে পৈঠায় উঠে বসে ফ্যালনার পাশে। আরো জানবে। রসের খবর।

'কি রকম বয়স?' ইমামবক্স এবার শুধায়।

'উনিশ বিশ।' গলা খাটো ক'রে আনে ফ্যালনা। 'ডালিমের ফুল। রাসু শালা রাইত ঘরে ফিরা মাইয়ার ব্যাখ্যা করে।'

'শালা, এক নম্বরের ঘুঘু।' বলে ইমাম। আবার একটা সিগারেট ধরায়। একটু একটু অন্ধকার হয়ে গেছে। তবু চকচক করে ইমামবক্সর দাঁত। 'কোন্‌দিকে বেশি যায়।'

'ইস্টিশনের দিকে নদীর ধারে।' ফ্যালনা কথা শেষ ক'রে এদিক ওদিক তাকায়।

কিত্‌কিতিয়ে হাসে ইমামবক্স।

'তাই কও। রাসু শালারে ক'দিন দেখছি না। শালা তলে তলে এই কর্ম করছে।'

ফ্যালনা চুপ। ফ্যালনা গম্ভীর।

যেন ফ্যালনার গলা থেকে একটা হিস্‌ হিস্‌ শব্দ ওঠল ঘৃণার, লজ্জার দুঃখের, রাগের।

'ভাল মানুষের সন্তান আমি। এমুন কাজ কাম করমু না। রাসু শালা ঠিক মারা পড়বে। দেইক্ষ।'

'না টাকা পয়সা নাই। ভাগাইয়্যা লইয়্যা যাইব কোনখানে।' ইমামবক্স অন্ধকারে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়ায়। 'রাসুর সাথে আমার পরামর্শ আছে।'

'কি পরামর্শ?'

'আদার বেপারী তোর জাজের খবরে কাম কি।' ইমাম হঠাৎ রুখে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। 'চললাম, দেখি দোস্তর দেখা পাই কি।'

'তোমারও মনে কুমতলব আছে ইমামবক্স।' ফ্যালনার মুখ দিয়ে বেরোয়।

'সরকার কোম্পানীর রুটি বানা গে তুই। তোর যে কাম। আমাগো মামলায় নাক ঢুকাইয়্যা করবি কি। আমরা আছি পয়সার ধান্ধায়।' বলল, তারপর শিষ দিয়ে রুমালের গন্ধ ছড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে ইমামবক্স অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ফ্যালনা রইল চুপ ক'রে ব'সে।

ডাক্তার এমন উপকার করছে। ডাক্তারের এই সর্বনাশ। ভাবল, আর তার সব রাগ গিয়ে পড়ল ডাক্তার গিন্নীর ওপর। 'তুমি চোখ খোল, তুমি চোখ খুইল্যা দেখ তোমার কি সর্বনাশ অইছে। রাস্কু শালারে বাড়ির সীমানায় ঘেঁসতে দিও না। কুচরিত্র লোক।' বিড়বিড় ক'রে ফ্যালনা উঠে দাঁড়াল।

সিনেমার শো ভেঙেছে।

দলে দলে বাবুদের মেয়েরা হলঘর থেকে বেরোচ্ছে। ফ্যালনা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

শহর কোন্ দিকে চলছে।

শহরে মানুষের মতিগতি কি। আলোর থামের পাশে দাঁড়িয়ে গেঁয়ো ফ্যালনা অনেকক্ষণ চিন্তা করল। ডাক্তারনী নিশ্চিন্তে আরামে টানা চেয়ারে পা তুলে বসে বুড়ো সাব-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে সারা সন্ধ্যা গল্প করছে। আজও দেখে এসেছে ফ্যালনা কারখানার কাজ সেরে ঘরে ফেরার মুখে।

ভেবে অবাক হচ্ছিল ফ্যালনা যোগীন ডাক্তারের মেয়ে চেরী রাস্কুর সঙ্গে পা মিলিয়ে কদ্দুর যায়। কতটা যেতে পারে।

সারাক্ষণ ফিটফাট, ধোয়ামোছা, সাজগোজ করে থাকা [মেয়ে তোমার মনে এই ছিল।

যেন চেরীকে ডেকে বলল ফেলনা।

ডাক্তারবাবুর মেয়েকে সে না চেনে, না দেখেছে এমন তো নয়।

রোজ সে ঘরে ফেরার পথে দেখে বেড়ার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে। এখন বেড়ার বাইরে গেল;

গেল তো রাস্থুর সঙ্গে কেন।

শহরে এই কাণ্ড প্রথম।

তারপর? সে কথা ভেবেই ফ্যালনার বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছে।

একটা ছিনিমিনি খেলা হবে, ছানাছানি। ফেলনা চোখের ওপর দেখতে পেল। 'রাস্থুর সাথে পরামর্শ আছে, আদার বেপারী জাজের খবরে তোর কাম কী, আছি আমরা রোজগারের ধান্ধায়।' ইমামের কথাগুলো ফ্যালনার কানে কানে বাজছিল।

ফ্যালনার তাই দুঃখ হচ্ছিল ভেবে। রাস্থু কি রাখতে পারবে, ভাল জিনিস কে কবে তারা হাত করে হাতে রাখতে পেরেছে। লুকিয়ে রেখেও নিস্তার নেই। মনে আছে ফ্যালনার, গত আশ্বিনে আনোয়ার, নাজীরবাবুর বাইরের চাকর আনোয়ার গাঁ থেকে ধরে এনেছিল টুকটুকে এক হীরামন্। একটা সকালও পার হ'ল না। টুকটুকে লাল ঠোঁট, দেখেই মাথা খারাপ হয়ে গিছল মদন চাপরাশীর, ডিপ্‌টি বাবুর চাপরাশীর। ন্যায্য মূল্যে যখন দিল না আনোয়ার, ডবল দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেল হীরামন মদন মণ্ডল। মণ্ডল দিয়ে দিল আরো চড়া দামে পুলিশ সাহেবের ড্রাইভার গোলাপ সিংকে, গোলাপের হাত থেকে হীরামন উড়ে গেল পুলিশ সাহেবনীর হাতে কোলে। খরগোস পেয়েছিল সেবার জঙ্গলে কুড়িয়ে

সনাতন মাঝি। হাত বদল হতে হতে পরে এখন সেই খরগোস মনের সুখে কুটুর কুটুর করে ঘাস খায় দারোগাবাবুর বাগানে আজও। সনাতনের হাতে রইল কি শেষ অবধি ?

জসিম গাড়োয়ানের সখের লোটন পায়রা একদিন উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে কেমন করে প্রথম নাজীরবাবুর পায়রা-খুপরী, তারপর সাব-রেজিস্ট্রারের, তারপর নাজীরবাবু সাব-রেজিস্ট্রারবাবুর চেয়ে উঁচুয় উঠেছেন চেয়ারম্যান মোহিনীবাবুর পায়রা-খুপ্রীতে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তা নাকি জসিম নিজেই বুঝতে পারছে না। আফ্শোষ করছিল সেদিন ফ্যাল্‌নার কাছে, তার লোটনের কথা তুলে। 'সখের চিজ্ সাধের মেওয়া আমরা হাতে রাখতে পারি কই, ক্ষেমতা নাই।'

জসিমের আস্তাবলে বসে চুপ করে শুনছিল ফ্যাল্‌না।

এখন, আজ, শহরে সন্ধ্যার ঝিল্‌মিলে আলোর নীচে ফুলের মত সিনেমা ঘরের সামনে ছড়িয়ে পড়া বাবুদের মেয়েদের দেখতে দেখতে রাসু সম্পর্কে কথাটা ভাবছিল ফ্যাল্‌না।

পায়রা খরগোস নয়।

কি টুকটুকে লাল ঠোঁট হীরামন।

শহরের ডাক্তারের উনিশ বছরের ফর্সা ধবধবে সমর্থ মেয়ে।

কিন্তু এতসব ভেঙ্গে ইমামবক্সকে বলাও বুঝি ভাল হয় নি, ভাবল ফ্যাল্‌না। তারপরেই তার মনে হ'ল বলাবলির আছে কি। বলার আগেই তো ইমামবক্স ছুটে এল রাসুদের ডেরায়। সাহেবের বাংলোর মালী হয়ে, যেদিন থেকে রুমালে এস্তার আতর মাখছে আর সেলুনে দশ আনা ছ'আনা চুল ছাঁটছে আর ম্যানেজারবাবুর বখ্শীস পাওয়া সিগারেট টানছে হরদম ইমামবক্স এ মুখো একদিন হয়নি। বড়লোক হয়েও ভুলে গিছল বেমালুম পুরোনো দোস্তদের।

যেন কি খুঁজতে খুঁজতে আজ সন্ধ্যায় চলে এসেছে হঠাৎ গরীবদের ডেরায়। দরকারী কাম।

ফ্যাল্‌নার চেয়ে অনেক বেশি চালাক রাসু। রাসুর চেয়েও ধারালো, বেশি ফন্দিবাজ ইমামবক্স। ইমামের পিছনেও আরো কত মতলববাজ ধড়িবাজ আছে এ শহরে।

ভাবল ফ্যাল্‌না।

তার বুকের ভিতর দুর্‌দুর্‌ করছিল।

এর শেষ কোথায়, এর সমাধান কিসে ভেবে ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিল না গেঁয়ো ফ্যাল্‌না। বোকাসোকা মানুষ।

চোখ বড় করে চেয়ে রইল সামনের দিকে। তার মাথার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছিল একরাশ সবুজ জোনাকী পোকা।

বৃষ্টি নামবে, বৃষ্টির গন্ধ পেয়ে সব ছুটে এসেছে। ভাবল ফ্যাল্‌না এক সময়।

ওরা ঘিরে বসেছিল একজনকে।

নিশানাথের দু'দিকে গোল হয়ে আছে মেয়েরা।

প্যারাডাইজের হল্‌-কামরা।

ছোট ছোট টেবিলকে একত্র জড়ো করে বড় করা হয়েছে। একটি করা হয়েছে। হল্‌-কামরায় আজ অন্য কেউ আসবে না। রাত সাড়ে ন'টা বাজে।

নিশানাথ একবার হাতঘড়ি দেখল। তারপর মুখ তুলে মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'আমরা ভয়ানক এক ব্যস্ততার যুগে

বাস করছি। রেস্টুরেণ্টে ব'সে আগের মত গল্পটল্প করা, এখন এদেশ কেন, বিলাতের কথাই ধর না, শুনলে তোমরা অবাক হবে মদ সে দেশে এক বছরে ভয়ানক রকম সস্তা হয়ে গেছে, কিন্তু, সময় নেই........'
নিশানাথ রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়ল লিলি কমলীর মুখে, ইরা-মীরার মুখে, সুশী সাবিত্রী শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর।

'রেস্টুরেণ্ট দূরের কথা, বার্-এ ব'সে দুদণ্ড লোকে আয়েস ক'রে পানটান করবে, তার ধৈর্য নেই। দাঁড়িয়ে থেকে এক ফোঁটা গলায় ঢেলেই আবার নেমে যায় রাস্তায়,—ঘুরছে কেবলই ছুটছে টাকার ধান্ধায়।'

'বুঝলুম তো' সর্বজ্যেষ্ঠা কমলা পুরুষের কথার উত্তর দিল। 'কিন্তু এত যে রোজগার করা হচ্ছে, বিয়ে-টিয়ে করা হ'ল না, কার জন্য টাকা শুনি ?' কথা শেষ ক'রে কমলা দলের দিকে তাকাল, অন্য মেয়েদের দিকে। মেয়েরা চুপ ক'রে আছে, শুনছে কমলা ও নিশানাথের কথোপকথন, দেখছে টেবিলের ওপরে থরে থরে সাজানো প্লেট ডিস, জলের গ্লাসের সারি, গরম কফির পেয়ালা, আজ স্পেশ্যাল অর্ডার হয়েছে রেস্টুরেণ্টে এই পার্টির জন্যে। সব খরচ বহন করেছেন নিরঞ্জন রায়। শহরের সবচেয়ে ধনী ভদ্রলোক।

তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি আছে মেয়েদের সমিতির ওপর।

তিনি আজ দিন কয়েক একটু অসুস্থ। নিজে বেরোতে পারছেন না। তা হলেও মেয়েদের যার যখন ইচ্ছা বাঙলোয় গিয়ে দেখা ক'রে আসছে, এ বিষয়ে তাঁর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অমায়িক সুমিষ্ট ব্যবহারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর সঙ্গে বাড়িতে দেখা ক'রে কথা ব'লে মেয়েরা প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট।

আজ দল বেঁধে সব পিক্‌নিকে গিছল। স্বয়ং পুলিশ সাহেবের গিন্নী লীড্ করেছিলেন। ফেরার পথে এইমাত্র তিনি বাঙলোয় উঠে গেছেন।

শত হলেও বিবাহিতা। বিধবা সুশী, কমলা এবং কুমারী মেয়েরা রেস্টুরেণ্টের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে বলাবলি করছিল তখন। অর্থাৎ অপরাজিতা, পুলিস সাহেবের গিন্নী। হঠাৎ কেটে পড়াতে অভিমান করল না কেউ। এসেই তারা এখানে রেস্টুরেণ্টে নিশানাথকে পেয়েছে।

অপ্রত্যাশিত আজ সকলের সঙ্গে নিশানাথের এই মিলন। সবাই খুশি। বাঙলোয় গিয়ে কতদিন তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, নিরঞ্জনের নবীন ম্যানেজারের। কোথায় থাকছে, কি করছে। বলছিল ঠাট্টা ক'রে কমলা। আর দুঃখ করছিল পরিচিত শহরের ছেলে পরিচিত এই শহরের মেয়েদের সঙ্গে পূর্বভাব কেন বজায় রাখছে না। নয় ভাল পয়সারই মুখ দেখেছে।

তাই ব'লে কি—নিশানাথ হেসে এ যুগের ব্যস্ততায় ব্যাখ্যা করল। রোববারের স্টেটসম্যানে পড়া বিলাতের বার-এর গল্পটা উদাহরণস্বরূপ তুলে দিল। মানুষ এখন কি ভীষণ ব্যস্ত। মুগ্ধ হয়ে শুনল ইরা-মীরা। ডলি, শর্মিষ্ঠা। ওরা আড্ডার তুলনায় একটু বেশী ছোট। তা হলেও সব বুঝল। সেল্‌ফ সাইকলজি সোসাইটি টাইম এ সমস্তরই 'কিছু না কিছু' রোজ তারা শিখছে অভিজ্ঞ কমলামাসী এবং সেক্রেটারি লিলির মুখে। তাই যে কোন আড্ডায়, যে কোন আলাপে বেশি টান ক'রে পাখির মত সরু স রু গলা তুলে ধ'রে ওরা বড়দের কথা শোনে বড়দের কথা গেলে। বুঝতে চেষ্টা করে। নিশানাথ ছোটদের মুখের দিকে তাকিয়েই বলছিল, 'পূর্বভাবের কথা বলছ মাসী। যুদ্ধের শুরু থেকে এই দশ বছরে মানুষ

কত মেকানিক হয়ে গেছে, কতো কমিয়ে দিয়েছে সেণ্টিমেণ্ট তুমি কি উপলব্ধি করতে পারছ না।

'নিশ্চয়ই পারছি, আমরাও পেরেছি।' লিলি উত্তর দিল। 'বৃহত্তর স্বার্থের কাছে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভাল লাগা না-লাগা বিলিয়ে দিয়েছি আমরা। না হ'লে আর সমিতি দেখছ কি।'

ইঙ্গিতে দুই চোখে হাসি টেনে নিশানাথ বলল, 'সত্যি, মিঃ রায় ফাইন্ জেণ্টলম্যান। তাঁর মত একজন পেট্রন পেয়েছো জেনে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।'

'তোমার মধ্যস্থতার জন্যে আমরা অপেক্ষা ক'রে থাকি নি।' মুচ্‌কি হাসল সুশী, 'অগ্রসরের রাস্তা জেনে নিয়েছি। পূর্বসুহৃদদের সাহায্য ছাড়াই মেয়েরা এখন এগিয়ে যায়।' কেন জানি আজ সুশীর সাহস বেড়ে গেছে, মুখ খুলে গেছে সামনে নিশানাথকে দেখে।

'তোমাদের কাছ থেকে আমি,—আমরা পুরুষরা এটাই আশা করছি যে।' কথা শেষ করে নিশানাথ ঝলকে ঝলকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। ইরা-মীরা, ডলি-শর্মিষ্ঠা মুচ্‌কি হাসছিল। নিশানাথের চোখে চোখে আট্‌কা পড়ে গেছে দু'জনের চোখ। অর্থাৎ বেশ একটু বড় হয়েছে পর নিশানাথও এদের প্রথম দেখছে, আর ঘন ঘন তাকাচ্ছে মেয়ে দু'টির দিকে।

'তোমার কোন্ ক্লাস?' নিশানাথ প্রশ্ন করল শর্মিষ্ঠাকে।

'থার্ড ক্লাস।' লাল হয়ে শর্মিষ্ঠা উত্তর দিল।

'তোমার?' ডলিকে জিজ্ঞেস করে নিশানাথ।

'সেকেণ্ড ক্লাস।' বলল ডলি পাত্‌লা ঠোঁটজোড়া বিস্ফারিত ক'রে। ডালিম বীচির মত ঝক ঝক্ করছে নতুন কুমারী মাড়ি উজ্জ্বলতায় নির্মলতায়।

'তোমাদের ?' নিশানাথ আর এক জোড়ার দিকে তাকাল। ইরা-মীরা হঠাৎ লিলির দিকে তাকাতে লিলি চোখ শানায়।

'আমার মুখে লেখা আছে নাকি,—যে প্রশ্ন করছে, তার দিকে তাকিয়ে বলো।'

'আহা, ধমক দিচ্ছ।' নিশানাথ বলল, আস্তে আস্তে শিখবে, এই তো শিখে উঠেছে পোনেরো আনা। নিশানাথের চোখে চোখে তাকিয়ে ঢোঁক গিলে এবার ইরা, মীরা সমস্বরে প্রশ্নের উত্তর দিল, 'সেকেণ্ড ক্লাস।'

'গুড্' অল্প মাথা নেড়ে নিশানাথ সিগারেটে লম্বা টান দিল।

'তা সেজন্যে ভাবতে হবে না, আমি শিখিয়ে এনেছি, শেখা হয়ে গেছে সব। আজ সন্ধ্যায় ডলি আধ ঘণ্টার ওপর মিঃ রায়ের ঘরে বসে কথা বলে এসেছে। একলা ছিল। ওদের কেউ দু'জনকে এক সঙ্গে পাঠাই না আমি। শিখুক ফর্ম্যালিটি নিজে থেকে আয়ত্ত করুক গিয়ে সোশ্যাল সেন্স,—প্রখর হোক সেন্সিবিলিটি,'—ব'লে কমলা লিলির দিকে তাকাল।

মাথা নেড়ে লিলি বলল, 'আমিও রাত-দিন বলছি ইরাকে মীরাকে। মিলিটাকে দিয়ে কিছুই হবে না অবশ্য। ও থাকুক ঘরে। সমিতি-টমিতি ঐ জাতের মেয়েদের দিয়ে কিছুই হয় না। ওরা সংসারে থাকবে, বিয়ে হবে, স্বামী সেবা করবে, সন্তানবতী হবে।'

লিলির কথায় কমলা ধীরে মস্তক সঞ্চালন ক'রল।

'কই, তোরা খা।' ছোটদের ঈষৎ ধমক দিয়ে কমলা আবাব লিলির দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ, আমরা তো আজ আছি, কাল বুড়ো হয়ে যাব। এ শহরের ভবিষ্যৎ গৌরব,—কামনা, আশা, স্বপ্ন সব তোরা। এখন থেকেই তোদের বুক বাঁধতে হবে। এই বয়স থেকে।'

কমলার দিকে চেয়ে ডলি একটা চোরা ঢোঁক গিলল। কমলা তা

উপেক্ষা করল। নিশানাথের চোখে চোখ রেখে পরে হেসে বলল, 'ভাবছিলাম মনিবের সঙ্গে সঙ্গে থেকে প্রিয় কর্মচারীটির সমিতিতে বিশেষ উৎসাহ-টুৎসাহ থাকবে।'

'সে-ও লোক আমিও লোক।'

কমলার দিকে চেয়ে নিশানাথ গূঢ় হাসল। 'তাঁর এখন ত্যাগের সময়, সেবার,—একলা দুই হাতে অবাধে জমিয়েছেন, তাই অকাতরে দশজনকে বিলিয়ে দিচ্ছেন, দিতে পারছেন।'

'তাঁর বিবাহিত জীবন অত্যন্ত Unhappy আমার তাই মনে হয়। কি বল নিশানাথ?' হঠাৎ প্রশ্ন করল লিলি।

'নিশ্চয়ই।'

'ও, মিসেসটির কথা হচ্ছে বুঝি?'

কমলা কাঁটা-চামচ তুলে ধরল। দাঁতের খাদ্য জিভ দিয়ে চেঁছে নিয়ে বলল, 'একটা স্নব। কি ওই মাগীর মতিগতি, চিন্তা-ধারণা, আমার মাথায় আজ পর্যন্ত এল না।'

'সেন্টিমেন্ট, সেন্টিমেন্ট্যাল জীব।' লিলি নাক কুঁচকে বলল, 'বললাম না তখন,—শ্রীমতী পপির মত মেয়েরা সমাজে এখনো আছে ব'লে আমাদের সমাজ উঠছে না। আমরা তলায় পড়ে আছি। বাঙালীরা আজ পৃথিবীর নারী-সমাজের পিছনে হাঁটছে। কেন?'

'তোমার নিরঞ্জন রায় ও পপিরাণীর ভিতরকার ব্যাপারটা আসলে কি আমি ধরতে পারছি না।' একটু মোটা চোখেই খাস্তগীর এবার নিশানাথের দিকে তাকায়। তারপর লিলির দিকে।

'বাইরে থেকে তোমরা যা দেখেছ, আমিও তাই দেখছি। বেশি ভিতরের ব্যাপার আমি আর কি ক'রে জানব?' নিশানাথ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসল। সামনের দিকে চোখ।

'চাল রাখো।' লিলি কাঁটা-চামোচটা হাতে থেকে ছেড়ে দিল। 'তুমি—তোমাকে কেন্দ্র ক'রেই তো সারাক্ষণ রায়গিন্নীর ছট্‌ফটানি, অনিদ্রা, অক্ষুধা। আমার অনুমান মিথ্যা নয়।'

'পারভার্ট। এমন সুন্দর স্বামী, এই অগাধ সম্পত্তি ছেড়ে শেষটায় আমার দিকে যদি,—' হাসির দোলায় নিশানাথের মাথাটা বেশ নড়ছিল। 'তোমার কি মনে হয়, মাসী, লিলির ধারণা সত্যি?' কমলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নিশানাথ ছোট মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়। 'তোমাদের কি মনে হয়? লিলির অনুমান সত্য? মানে মিসেস রায় আমার প্রেমে পড়ে গেছেন?'

'থাক্ কচিগুলোর আর মাথা পাকিয়ে লাভ নেই।' কমলা প্রসঙ্গটা চাপতে চাইল।

'প্রেম-টেমের যুগও নেই, কেবলই প্রেম নিয়ে মানুষ এখন বাঁচতে পারে না। মেয়েদের এখন বৃহতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ পায়ে দলে সমাজগত অসুখ অসুবিধার কথা ভাবতে শিখতে হবে। না হ'লে মেয়েদের মুক্তি নাই।'

কথার শেষে কমলা ডলি-ইরা-মীরা-শর্মিষ্ঠা প্রত্যেককে একবার ক'রে দেখল।

'পারিবারিক এই অশান্তির জন্যেই মিঃ রায় সমিতির দিকে হঠাৎ এত বেশি ঝুঁকেছেন।' যেন কমলার মধ্যস্থতার পরও লিলি নিশানাথকে খোঁচা দিতে ছাড়ল না। সুশীর চোখ দু'টোও একটু একটু জলছিল।

সব উপেক্ষা করে নিশানাথ চোখ বুজে সিগারেটে জোরে টান দিল। 'এতে ঝুঁকেছেন বলেই তো তোমাদের থলেও মোটা হচ্ছে। তোমরাই যে লাভবান হচ্ছ বেশি।'

'যাক্‌গে বাজে তর্কে কাজ কি।' কমলা চোখ ঠেরে লিলিকে চুপ

করতে বলল। 'তুমি তো তাঁর ম্যানেজার, আমাদের ঘর কবে উঠছে, ভিটি পাকা হবে না ওমনি মাটির? লাইব্রেরীর জন্য আলাদা বাজেট হয়েছে কি? সব কথা রোজ মিঃ রায়কে আমার জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে। এই তো আজ এতগুলো টাকা ঢাললেন সামান্য একটা পিক্‌নিকের জন্যে।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাবতে হবে না। পাকা ভিটে হবে সমিতির ঘরের। হচ্ছে বড় লাইব্রেরী, তার আবার ছোট ছোট স্টাডি। আমি যখন রয়েছি হিসাবের নড়চড় হবে না, মাসী। ব্যাঙ্কের মারফৎই তো টাকা যাবে।'

'তাই দেখো।' কমলা আড়চোখে ডলি, শর্মিষ্ঠা, সাবিত্রী কাঁটা-চামোচে খাওয়া শেষ করে নিজেদের রুমাল বার ক'রে ঠিক ঠিক মুখ মুছছে কিনা লক্ষ্য করেছিল, না কি গ্লাশের জলে কুলকুচি করছে যেমন বাড়িতে করে।

এই শহরের ছেলে তুমি,—এখানে তুমি বড় হয়েছ। এখানকার মেয়েরা তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ এটুকুনই আশা করে। যত মেটিরিয়্যালিষ্ট তুমি হ'তে চাও হও গে। সমিতির জন্য অন্ততঃ একটু দরদ রেখো।' কমলা নিশানাথের দিকে মুখ ফেরাল।

'তাই বলছিলাম মাসী, আমারও কি ইচ্ছা না মিঃ রায়ের মতন ভাল ক'রে সমিতি আকড়ে ধরি, সমিতিকেই বিলিয়ে দিই সব। কিন্তু ক্ষমতা কই। সামান্য কর্মচারী। হ্যাঁ আমাকেও আগে পয়সা জমাতে দাও,—ব্যাঙ্কে কয়েক লাখ জমুক। তারপর ছাখো, আমিও একটা মিঃ রায় হই কিনা। তখন—'

'থাক্।' লিলি গম্ভীর গলায় বলল, 'যখন হবে তখন দেখা যাবে।'

'না, তোমাদের মনের ভাব এই কিনা। আমি শ্রীমতী পপির প্রেমে হাবুডুবু।'

নিশানাথ মুহুর্মুহু ধোঁয়া ছাড়ছিল সিগারেটের। রিংগুলো পাক খেয়ে ঘুরছিল মেয়েদের খোঁপা, বেণী, চিবুক, বাহু, বুকের ধারে ধারে। গায়ে লেগে চাকাগুলো ভেঙে যায়।

নিশানাথ একটা রিং ছুঁড়ে মারল ইরার গলার কাছে। ব্লাউজের হাতার ধারে।

ইরা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

অর্থাৎ দিদিদের সঙ্গেই নিশানাথ এতকাল হাস্যালাপ বা রসিকতা যা করবার করেছে। এখন ইরাকে নিয়ে হঠাৎ তার এই উৎসাহে ইরা খুশি হবে জানা কথা। ইরা হাসল।

'না, এমন অনাধুনিক ছেলে তুমি নও, অন্ততঃ আমি তা মনে করি না। এই শহরের ছেলে। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েই চলবে।' নিশানাথের কথার উত্তর দিল কমলা।

'যা বলেছ মাসী।' নিশানাথ হাসতে গিয়ে গলার একটা শব্দ করল। 'টাকা, যথেষ্ট টাকা না থাকলে কে কাকে পোছে। একজনের সঙ্গে প্রেম ক'রে মরতে যাব কেন। অগাধ টাকা করছি, যাতে দল বেঁধে তোমরাই আবার আমার কাছে ছুটে আস। সেটাই কি পুরুষের কাম্য হওয়া উচিত নয়?'

'থাক্ আর ছোটগুলোর সামনে ব্যাখ্যা করতে হবে না।' ইরা হাসি থামাচ্ছে না দেখে লিলি রাগের ভাণ করল।

সুশী বলল, 'বেশ দুরাশা যাহোক্ তোমার।'

'দুরাশা হবে কেন।' খাস্তগীর সুশীর দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। বিজনেসের লাইনে আছে যখন ও ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।'

নিশানাথ চুপ ক'রে রইল।

অর্থাৎ নিরঞ্জন রায়ের দেওয়া সমিতির মোটা টাকা ব্যাঙ্ক মারফৎ বেরিয়ে আসছে কোষাধ্যক্ষা হিসাবে কমলারই বেশি কথাটা মনে থাকে বলে কমলা চাইছিল না বিগত প্রেমের প্রতিশোধ নিতে লিলি ও সুশী নিশানাথকে সারাক্ষণ খোঁচায়। খুঁচিয়ে কথা বলে। সন্ধ্যা থেকে তিনবার তুলেছে ওরা পপির কথা।

কমলা বলল, 'না তুমি মোটা হও'—নিরঞ্জনের মত তুমিও টাকায় মাংসে মোটা হও। তোমার কাছেও আমরা যাব রোজ সন্ধ্যায় দল বেঁধে।'

আবহাওয়া তরল করবার জন্যে এবং কিছুটা—বা—মনরক্ষায় মাসী নিশানাথের চেয়ে মিষ্টি হাসল। 'ভাল কথা, আজ যখন আমি ডলিকে নিয়ে সন্ধ্যায় দেখা করতে গেছি রায়ের সঙ্গে রায়গিন্নী অত মন খারাপ ক'রে বাগানের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?'

'রোজই তো মন খারাপ করছে, বিশেষ আমরা কেউ মিঃ রায়ের সঙ্গে যদি দেখা করতে যাই।' লিলি মুখ মোছা শেষ ক'রে রুমালটা থলেতে পুরল।

'আজ একটু বাড়াবাড়ি দেখলাম।' কমলা বলল।

'ঝড়ঝাপটা নিশ্চয় একটা কিছু হয়ে গেছে।' বলল সুশী।

'ঝড় রোজই হচ্ছে।' নিশানাথ গুন্ গুন্ ক'রে হাসে, নতুন সিগারেট ধরায়। 'একটা না একটা নিয়ে খটখটি বাঁধছেই।'

'Unhappy pain' কমলা মন্তব্য করল। ইংরেজী বলতে বলতে মাসী এখন সুন্দর সুন্দর ইংরেজী বলতে পারে বসাতে পারে জায়গামত সময়মত। অথচ লেখাপড়া যে খুব বেশি করেছে তাও নয়।

ক্ষমতা। দলের সবাই এটা স্বীকার করছে। পর্যন্ত লিলি, পুলিশ সাহেবের স্ত্রী অপরাজিতা তারাও বলাবলি করছে মাসীর আশ্চর্য ক্ষমতা আছে এক একটা বিষয়ে।

যেমন ছোট মেয়েদের ট্রেণিং দেওয়া, বেশি চাঁদা তুলতে পারা এবং প্রসঙ্গত বাছা বাছা ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করা। কোথা থেকে কার কাছ থেকে ও কবে কমলা এসব আয়ত্ত করেছিল কেউ জানে না। বলতে পারে না। আজ পনেরো বৎসর কাটল এই শহরে, আগের পনেরো বৎসর মাসী কোথায় ছিল, কোন্ দেশে ছিল তা মাসীর মনে নেই। মাসী এদেশকেই নিজের দেশ ব'লে মেনে নিয়েছে। এই শহর নিজের শহর।

মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং-এর সামনে সুন্দর চাঁপা গাছটার মতন, লেডিজ পার্কের সামনের (এ শহরের প্রধান পার্কের নাম) জুনিপারের চারাটির মতন কে কবে লাগিয়েছিল, কোথা থেকে আমদানী হয়েছে জানতে যেমন কারো উৎসাহ নেই, কেবল চেয়ে থাকে, দেখে ভাবে এটিও শহরের অঙ্গ, অন্যতম শোভা তেমনি কমলা খাস্তগীর সম্পর্কে সকলের এই ধারণা। শহরের সৌন্দর্য। মাসী চলে গেলে শহর বেশ শ্রীহীন হবে এবং তারপর এখানকার উইমেন্‌স্ এসোসিয়েশনও টেকে কিনা সন্দেহ। মিটিং শেষ ক'রে সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাব-রেজিস্ট্রার মোহিনী নন্দী অধ্যাপক অঘোরানন্দকে বলেছিলেন।

বয় বিল এনে দিতে বিল শোধ করল মাসী। মাসী ক্যাশিয়ার।

বলতে কি, রায় ও রায়-গিন্নীর দাম্পত্য-জীবনের আলোচনা এখানে বেশীক্ষণ হয়, কচি মেয়েদের সামনে, কমলার ইচ্ছা না। বিবাহিত জীবন বা এর গোপন তথ্যের কথা ওরা যত কম শুনতে পায়. তত বেশী মঙ্গল। ভাবে মাসী।

দাম্পত্য জীবনের শান্তি অশান্তি টেনে এনে ছোটদের মনের সাবলীল গতিকে বিভ্রান্ত করা ঠিক নয়। বড় কুটিল বড় তিক্তকর ভেজাল, বিষময় এখানকার প্রত্যেকটি মানুষের ম্যারেড লাইফ। কমলা খাস্তগীর নাক সিঁট্‌কায় এবং এখনও, এখানেও টাকার কুমীর নিরঞ্জন রায় ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে রোজ কি নিয়ে খট্‌খট বাধছে, লিলি নিশানাথকে প্রশ্ন করতে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা যাতে না হয়, চোখের ইঙ্গিতে কমলা তা লিলিকে জানাতে চেষ্টা করল এবং মুখ বিকৃত করে বলল, 'আনহ্যাপী পেয়ার' অর্থাৎ এক কথায় সে প্রসঙ্গের যবনিকা টানতে চেষ্টা করল।

কিন্তু কেন, কারণ কি।

লিলি সুশীর চোখে অগাধ ঔৎসুক্য।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিল ওরা নিশানাথের দিকে। যেন রায় ও রায়-গিন্নীর জীবনের আরো ভিতরে প্রবেশ করতে চাইছিল দু'জন।

'সেক্স' কমলা বিরক্ত হয়ে মনে মনে বল্‌ল এবং দ্বিতীয়বার চোখের ইঙ্গিতে লিলি ও সুশীকে থামাতে চেষ্টা করল।

'শুনি, শুনি না।' বলছিল সমিতির অবিবাহিত ও বিধবা দুটি বড় মেয়ে।

হাতের থলে দোলাতে দোলাতে লিলি বলে, 'শুনতে বাধা আছে কিছু।'

সুশী বলল, 'আমাদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে অভাবে, দারিদ্র্যে, না-পাওয়ার নানা দুশ্চিন্তায়, বড়লোকদের কি নিয়ে হাহাকার, তা কি জানতে ইচ্ছা করে না, মাসী।'

অল্প হেসে নিশানাথ বলল 'খুব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে।'

'কি রকম, শুনি না!' লিলির জিহ্বা আরো সরস শোনাল। গলার-স্বর গাঢ়।

'এই যেমন ভদ্রলোক একটু বেশী খান বলে পপির রাগের সীমা নেই। ওর গা ঘিন্ ঘিন্ করে বেশি খাওয়া দেখলে।'

'স্নব।'

ছোট মেয়ে ইরা, মীরা, ডলি এবার কল্‌কলিয়ে বলল।

কমলা এতে অবশ্য সন্তুষ্ট হ'ল। খুকিরা জায়গামত সুন্দর শব্দটি প্রয়োগ করতে পেরেছে, তাই প্রসঙ্গ একটু ঢিলে হলেও তার গতিপথে কমলা আর বাধা দিল না। ইরা, মীরার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে শহরের সবচেয়ে বড় মেয়ে লিলি ও শহরের সবচেয়ে প্রতিভাবান, সুযোগ্য কর্মঠ নিশানাথের কথাবার্তা শুনতে লাগল। নিরঞ্জন রায় ও তাঁর স্ত্রী সংক্রান্ত আলোচনা।

'মাথায় ছিট্ আছে পপির। না হ'লে সাধারণ খাওয়া নিয়ে এমন করে।' সুশী বলল।

'বোকা।' লিলি মন্তব্য করল।

'ভদ্রলোক ভয়ঙ্কর অসহায় হয়ে পড়েছেন ছিটগ্রস্তা বোকা স্নব নিয়ে।' বলল নিশানাথ।

'হবেনই তো।' কমলা গলায় আক্ষেপের সুর ভাঁজল।

ছোট মেয়েরা চুপ ক'রে শুনল।

'ভাগ্যিস আমি ছিলাম, আমার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে মিঃ রায় চুপ ক'রে বসে আছেন। না হলে—'

'তাঁর ব্যাঙ্ক ফেল্ পড়ত প্রপার্টি ডুবত।' লিলি বলল। 'চা-বাগান বিকিয়ে যেত। তাই না?' সুশী মন্তব্য করল।

'যাকগে, ঘরোয়া কথা যখন উঠেছে, তাই হোক্, বাজে কথায় কাজ কি।' লিলি সুশী নিশানাথকে আবার খোঁচাতে আরম্ভ করবে লক্ষ্য করল কমলা। হেসে গলার সুর অধিকতর মিষ্টি ক'রে নিশানাথের

চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল ও, 'তোমার রায় কি খেতে বেশি ভালবাসেন ?'

'মাংস।'

'তাই বুঝি রোজ পাখি শিকার ক'রে খাওয়াচ্ছ ?'

অল্প অল্প হাসল নিশানাথ। 'এই নিয়ে পপি মিঃ রায়ের সঙ্গে অবিরাম কোন্দল করছে।'

'কি নিয়ে, ওর মাংস খাওয়া নিয়ে না তোমার শিকারে যাওয়া নিয়ে ?'

লিলি তেরছা প্রশ্ন করল।

কমলা তা গ্রাহ্য করল না। আড়চোখে একবার ছোটগুলোকে দেখে নিয়ে নিশানাথের দিকে চোখ তুলল। 'অই একই কথা। উনি খাচ্ছেন বলেই তো নিশানাথ শিকার এনে দিচ্ছে। উনি খেতে ভালবাসেন। তা নিশানাথ শিকার না এনে দিলেই বা কি। ওঁর অগাধ পয়সা, পয়সা খরচ করলে নিরঞ্জন রাজ্যশুদ্ধ পাখি পেতে পারেন। পাবেন আর খাবেন-ই বা না, কেন, বেশ শক্ত সমর্থ শরীর। এই সামান্য ব্যাপারে স্ত্রী ওঁর বাদ সাধছেন কেন বুঝতে পারি না। কি প্রকৃতির মেয়ে মানুষ, কোন্ ঘরে ও বড় হয়েছিল ?'

'আজ শিকারে যাওয়া হ'ল না কেন ?' সুশী আচমকা প্রশ্ন করল।

নিশানাথের গলায় আর এক ভাঁজ হাসি খুলল।

'সেজন্যেই তো ঝগড়াটা আজ পাকিয়েছে বেশি, যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম।'

'শুনি, কি হয়েছে, শুনি না তোমার বড়লোকদের ঘরের খবর ?' টেবিলের ওপর আরো ঘন হয়ে ঝুঁকে পড়ল লিলি, সুশী নিশানাথের মুখের সামনে।

'পাখি খেয়ে খেয়ে মিঃ রায়ের অরুচি ধ'রে গেছে। এখন, আজ দু'তিন দিন ধ'রে হরিণের মাংস খেতে চাইছেন ভদ্রলোক।'

'তারপর? না হয় খেতে চাইলেন-ই, তাতে—' রুদ্ধস্বরে কমলা বলল, খুঁজে পাওয়া গেছে কি হরিণ? কোথাও খোঁজ করেছিলে?'

নিশানাথ মাথা নাড়ল।

'সেজন্যেই তো কাল মফঃস্বলে গেছি, আজও, ঘুরে এলাম আশপাশের গাঁয়ে।'

'তুমি না ওঁর ব্যাঙ্কের কাজে খুব ছুটোছুটি করছ, ব্যস্ত, বললে তখন?'

'অই একই কথা।' কমলা আবার অপ্রসন্ন চোখে লিলির দিকে তাকায়। 'তাঁর তুষ্টির জন্য কাজ করা, তাঁর ব্যাঙ্কের জন্যে খাটা একই। নিশানাথ যখন কর্মচারী ওর পক্ষে দু'টোই সমান বড়।'

'আমারও সেকথা।' মাসীর চোখের দিকে চেয়ে নিশানাথ একগাল ধোঁয়া ছাড়ল। 'মনিবানী রাগারাগি করছে ব'লে কি আমি চুপ ক'রে বসে থাকব—না আছি?'

'না না সে একটা কথা নাকি।' কমলা মৃদুমন্থর মস্তক সঞ্চালন করল, আড়চোখে ডলি শর্মিষ্ঠার দিকে তাকাল একবার। 'রায়ের যখন সখ হয়েছে হরিণ খেতে, যে ক'রে হোক্ জোগাড় ক'রে দিতেই হবে।'

'অলরেডি জোগাড় ক'রে এনেছি মাসী।'

নিশানাথ হি হি হাসল। ধোঁয়ার একটা বল্ ছুঁড়ে মারল ওপরের দিকে।

'করিৎকর্মা ছেলে, তোমার অসাধ্য আছে কিছু?' কমলা নাড়ল। 'না, বলছিলাম শীতকালে এ অঞ্চলে হরিণ টরিন আসে বটে,—তা বেশ, সন্ধান যখন পেয়েছ আর কথা কি। যাক্‌গে দেখা, হ'ল।

চললাম আমি, আয় তোরা।' কমলা, ইরা, মীরা ও ডলি শর্মিষ্ঠাকে ডাকল।

ছোটদের নিয়ে মাসী বেরিয়ে গেল।

'তা হ'লে বাংলোয় বড়রকমের একটা ভোজ হচ্ছে শীগ্‌গীর ?' প্রশ্ন করল সুশী। বেশ ঠাট্টার সুর।

'হুঁ।' গলার একটা অদ্ভুত শব্দ করে নিশানাথ চেয়ারের পিঠে মাথা রাখল। নিশানাথ যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। চোয়াল দু'টো কঠিন দেখাচ্ছে। সুশীর কথার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পর নিশানাথ ঘাড় সোজা করল।

'সুবিধা হলে আজ রাত্রেই মন্দ কি। এখনও ভোজের ব্যবস্থা করা যায়।'

'এত রাত্রে হরিণ কাটবে কে ?'

'আমি।'

নিশানাথ লিলির চোখে চোখে তাকাল।

'রসুই কে ?'

'আমি।'

সুশীর চোখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায় নিশানাথ।

'most obedient servant'. লিলি সুশী সমস্বরে বলল।

'তা'লেই বোঝ মিঃ রায়ের জন্যে আমি কত করি, করছি,। মনিবানীর চেয়ে মনিবের প্রিয় হওয়াই লাভজনক আমি বেশি মনে করি।'

লিলি ও সুশীর আর যেন সন্দেহ রইল না। পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করল। অধরে বিদ্যুচ্চপল হাসি। নিশানাথের ওপর বেশ খুশি হয়ে দু'জন প্রশ্ন করল, 'পপিরাণী করবেন কি, বাংলোয় যখন তুমি হরিণ নিয়ে যাবে ? গোঁসা ঘরে গিয়ে দোরে খিল দিয়ে রাত কাটাবে ?'.

'ওসব আরম্ভ হয়েছে শিলং-এ থাকতে।'

লিলি ও সুশীর সামনে নিশানাথের মুখ-থেকে-বেরিয়ে-আসা ধোঁয়ার একটা চক্র সুন্দরভাবে ঘুরতে লাগল।

'দরকার হ'লে মরফিয়া ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে স্ত্রীকে, কি হাত-পা বেঁধে চালান দিতে হবে লাশকাটা ঘরে। উপায় কি। তার জন্যে তো আমি মিঃ রায়ের হরিণ খাওয়া বন্ধ করতে পারি না। অই যে মাসী বললে, নয় তো আমার চাকরি যাবে।'

নিশানাথের সঙ্গে সঙ্গে সুশী হাসল।

'কি সাংঘাতিক প্রভুভক্ত তুমি।'

'না হ'লে আমি টাকা করব কি ক'রে?'

'ডেভিল ডেভিল।' লিলি আজ আর 'ডন্‌জুয়ান' বলল না। বলল, 'যাক্‌গে, যা ইচ্ছা তুমি করগে, তোমার মনিবের সঙ্গে, কি মনিবানীর সঙ্গে। মিঃ রায়কে দিয়ে আমাদের সমিতির টাকাটা শীগ্‌গীর সেংশন করিয়ে দিয়ো। তাঁর পারিবারিক খাওয়া খাওয়ির ঝগড়ায় আমাদের সমিতি চাপা না পড়ে যায়।'

'পাগল।' নিশানাথ সোনার দাঁতে সুন্দর হাসল। 'রাত্রে তিনি পাখি খাওয়া নিয়ে কি হরিণ খাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন ব'লে সমিতির মেয়েদের একদম ভুলে যাবেন?—মিঃ রায় সেই প্রকৃতিরই নন। সোশ্যাল সেন্স তাঁর খুব বেশি জাগ্রত। বিত্তবান তিনি কিন্তু স্বার্থপর নন।'

লিলি সুশী মাথা নাড়ল।

'সত্যিকারের ভদ্রলোক, সুজন।' নিশানাথ মন্তব্য করল। 'তাই বলছিলাম এইমাত্র রাগ হয়ে ভদ্রলোককে এমনি জ্বালাতন ক'রে মারছে পপি অহরহ। তার ওপর যদি তাঁর সাধারণ খাওয়া মানে বেঁচে থাকার

দৈনন্দিন নিয়মগুলোর ওপর শ্রীমতী মুহুর্মুহু হাত বাড়ায় তো সে কি intolerable হয় না এক এক সময়।'

লিলি সুশী মাথা নাড়ল।

'তাই বলছিলাম।' নিশানাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ধোঁয়াটা নাক দিয়ে বার করল, জলন্ত টুকরোটা ছুঁড়ে মারল রূপোলী অ্যাস-ট্রে'র জলে। ছ্যাৎ করে শব্দ হল। 'তাই বলি যদি এমন কোনো নিষ্ঠুর কাজ আমি করে বসি, মনিবানী সম্পর্কে, মনিবের নিষ্ঠুর আদেশ পালন করি তো তোমরা আমায় ডেভিল বলে গালাগাল দিও না।'

'না, এমনিতে ঠাট্টা করছিলাম।' লিলি ও সুশীর চোখে সমবেদনা ঝরে পড়ল।

'কেন করছি, কার জন্যে করছি?'

'সত্যি তো।'

'একটি মূল্যবান জীবন নষ্ট হতে দিতে পারি না।' নিশানাথ লিলি ও সুশীর চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল।

'তাই তাই।' অল্প অল্প হাসল নিশানাথ। 'সেকথাই বলছিলাম। মাসী বলছিল, যতক্ষণ তোমরা সেখানে থাক, কি যখনই ইরা মীরা ডলি শমিকে নিয়ে ও বাংলোয় যাচ্ছে মিঃ রায় যেন নতুন করে বেঁচে ওঠেন, সুন্দর হয় তাঁর মুখ, উজ্জ্বল হয় হাসি, আর অফুরন্ত গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটিয়ে দেন।'

'তাঁর কাজকর্ম ইদানীং কমেছে?—লিলি প্রশ্ন করল।

'আমিই কমিয়ে দিয়েছি।' নিশানাথ স্বচ্ছতর গলায় হাসল। 'ফুর্তি পাক, একটু ছাড়া পাক তাঁর জর্জরিত বিবন্ন দেহ মন। অন্তত এই শহরে আমাদের মধ্যে তিনি যতদিন আছেন একটু সুখে থাকুন মিঃ রায়।'

'এই শহরে আধুনিক ছেলেমেয়েরা আছে বুঝুক পপি।' লিলি বলল,

'সত্যি ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই যে মিঃ রায় একেবারে মরে গেছেন তা আজকে মেয়ে সমিতির সেক্রেটারি হয়ে আমি সহ্য করতে পারি না। কোনো স্ত্রীলোকই চিরকাল একটি পুরুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে পারে না। যেমন কোনো পুরুষ চিরকাল একটি মেয়ের জীবনে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে বেড়াবে সেটা এক যুগে সম্ভব ছিল, আজ নয়।'

একটু বক্তৃতার মত হ'য়ে পড়েছিল লিলির শেষের ক'টা কথা। তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও শেষ করল। 'আমরা দল বেঁধে যাব মিঃ রায়ের কাছে। তাঁর বাংলোয়।'

'তাই তাই।' আর সিগারেট ধরাল না নিশানাথ। বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, তর্জনিটা টেবিলের ধারে ঠুকতে লাগল। বাঁ কব্জি তুলে ঘড়িটা দেখল একবার। 'তোমরা দল বেঁধে যাও তাঁর কাছে, বাইরে থেকে ঘিরে রেখে মিঃ রায়ের জীবনকে সজীব, সুন্দর ক'রে দাও। সূর্যমুখীর দল এ শহরের। মিঃ রায়ের কাছে আমি তোমাদের প্রত্যেকের সুখ্যাতি করেছি।'

'তা করবে,' সুশী বলল, 'ছোটবেলা থেকে তুমি সবাইকে জান।' নিশানাথের ওপর সুশী বাস্তবিকই সন্তুষ্ট।

'ইরা মীরার সঙ্গেও তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করেন।' লিলি বলল।

'শিশু।' নিশানাথ বলল, 'শিশুর মত মন, অথচ একটা বিজ্‌নেস ম্যাগনেট। তাঁর দু'টো টি-গার্ডেন, একটা অয়েল মিল, ব্যাঙ্ক, গোটা চারছয় হওয়া না হওয়া বাড়ি রয়েছে কলকাতা, পুরী, দেরাদুনে, রাঁচীতে। রাগ নেই একটু,—হিংসা নেই মনে।'

'অথচ তিনি উঠতে পারছেন না, পরিপূর্ণ হ'তে পারছেন না। একটি বাধা এক অশান্তি।'

'বিয়ে করা ভুল হয়েছে।' সুশী বলল।

'স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই বা ঘুরছেন কেন।' লিলির ভুরু কুঞ্চিত হল।

'বললাম তো। ঠিক ম্যানেজ করতে পারছেন না নিজেকে। তাঁর এত আছে অথচ তিনি অসহায়। সব পেয়েও তিনি কিছুরই অধিকারী নন।'

'এক স্ত্রীর জন্যে ?' রিং দুলিয়ে লিলি মাথা নাড়ল। 'না না এখন তা হয় না। স্ত্রীদের সম্পর্কে নারী সমিতির ফরমুলায় আজ আর তা লেখে না। আমরা তাঁকে হ'তে দেব পরিপূর্ণ হয়ে—উঠতে সাহায্য করব।'

'শিল্পপতি, ধনি। তাঁর বেঁচে থাকার, তাঁর অবস্থানের মূল্য আছে এই গরীব দেশে।' নিশানাথ বলল, 'তাঁর দানে, আন্তরিকতায়, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় একটি কেন দেশের আরও দশটি নারী-সমিতি বাড়বে, বড় হবে।'

'আশ্রম, স্কুল, কুটির-শিল্প না ক'রে হোক অন্তত দশটি অনাথ মেয়ের সংস্থানের তো ব্যবস্থা হবে।' লিলি বলল।

'সেই।' মুগ্ধ চোখে নিশানাথ লিলিকে দেখছিল। 'এক নাথ নিয়ে বিলাস করার কোনো অধিকার নেই শ্রীমতী পপির।'

'ভয় নেই। আমাদের মধ্যে যখন এসে গেছেন তাঁকে আমরা উজ্জ্বল ক'রে রাখব উজ্জীবিত করে তুলব, দল বেঁধে তার চারপাশে ঘিরে থাকব সারাক্ষণ। আজও অনেকক্ষণ কাটিয়ে এসেছি তাঁর বাংলোয়।'

'অন্তত এ শহরে যদ্দিন আছেন মিঃ রায়। আমারও তাই ইচ্ছা।' নিশানাথ, লিলি সুশীর চোখের দিকে নয়, নিজের হাতের ওপর চোখ রাখল। 'বাইরে থেকে গিয়ে তাঁর melancholy দূর করবার, যতটুকু তোমরা পার, যতটা সম্ভব কর, আমি দেখছি ভিতরের দিকটা, তাঁর খাওয়া তাঁর স্বাস্থ্য।'

'না এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে স্ত্রীকে হাত-পা বেঁধে ঘরে আটকে রাখতে হবে বৈকি।' সুশীর কথায় নিশানাথ আবার অল্প অল্প হাসল। 'তাই,—না তোমরা ভাবতে পার, মনে করা খুবই স্বাভাবিক, যেহেতু আমি কর্মচারী, বেতনবৃদ্ধি কি বখ্শীসের লোভে, মনিবকে, হরিণ খাওয়াচ্ছি, খুশী রাখছি…'

'পাগল। আধুনিক ছেলে হিসাবে এ তোমার কর্তব্য।' লিলি বলল, 'তেমনি আমাদেরও তো তুমি ঠাট্টা করতে পার তাঁর কাছে যাচ্ছি শুধুই চাঁদার আশায় থলে মোটা করার লোভে।'

'পাগল, এ আমি কখনো ভাবি না, মরে গেলেও মনে করব না। দিন দিনই আমাদের আদর্শের পরিবর্তন হচ্ছে,—আইডিয়া ডেভলপ্ করছে।'

'তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।' সুশীর হাত ধরে লিলি বলল। 'চললাম।'

ঝক্‌ঝকে হেসে নিশানাথ ঘাড় কাৎ করল। 'অনেকদিন পর তোমাদের সঙ্গে বসে গল্প করে সুখী হলাম।' লিলি সুশী নিশব্দে রাস্তায় নেমে গেল।

লিলিরা রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে যেতে নিশানাথ নতুন সিগারেট ধরায়।

'সূর্যমুখীর ঝাড়।' বলল সে মনে মনে।

মিঃ রায় নাম দিয়েছেন সমিতির মেয়েদের। না, নিরঞ্জন রায় সৌখিন, সৌন্দর্যপ্রিয়, সুরসিক সমাজপ্রিয় ও খোস মেজাজের। নিশানাথের জানতে বাকি নেই।

এক পপি, পপি তার জীবনে ধূসরতা আনছে। এতকাল একটি মনিবের সঙ্গে থেকে কর্মচারী নিশানাথের তা সহ্য করা উচিত নয়। কোনো ঘনিষ্ঠ কর্মচারীই করে না, যতক্ষণ তাঁর অর্থে তাকে পুষ্ট শ্রীসম্পদযুক্ত হতে হবে। মনিব ছাড়া কর্মচারীর আছে কে।

নিরঞ্জন রায় এই অঞ্চলের মর্তমান কলা খেজুড় গুড় কি বালি হাঁসের মাংসের যখন প্রশংসা করেন, তখন নিশানাথের সত্যি গর্ব হয়। তার দেশ, তার শহর।

কমলার মুখে এই মাত্র তেরো বছরের ইরা থেকে সুরু ক'রে লিলি সম্পর্কে মিঃ রায়ের অবিমিশ্র সুখ্যাতির গল্প শুনে নিশানাথের তেমন ভাল লাগল। লেগেছে। নিরঞ্জন রায় কদিন ধরেই নিশানাথের কাছে এদের প্রশংসা করছেন। গর্ববোধ করে নিশানাথ সমিতির জন্যেও।

'আঃ, পপি তোমার কি একটু লজ্জাও হয় না।' নিশানাথ মনে মনে মনিবপত্নীকে ডেকে শুধোয়, 'মিঃ রায় সজ্জন, নম্র, সদালাপী। দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে এই শহরের মেয়েরা যাচ্ছে তাঁর কাছে। যাবেই। বড় শহরের মেয়ে তুমি। কিন্তু এই ছোট শহরের লিলিরা কত পরিচ্ছন্ন প্রগতিপরায়ণা হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত প্রেম অপ্রেমের বিলাস নিয়ে মত্ত থাকবার দিন অতিক্রান্ত, গণতন্ত্রের যুগে এত বড় সত্যটা যদি তুমি না বুঝে থাক তো কার দোষ।' নিশানাথ জানে, এখনও সে দেখল তার সঙ্গে দেখা হবার পর এমন যে সেন্টিমেন্টাল সুশী, অঝোরে যে কাঁদতে পারত, লিলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে কি অদ্ভুত সুন্দর শক্ত অপরূপ প্রভায় ভ'রে উঠেছে। প্রখর হয়েছে চাউনি, ধার এসেছে কথায়। সুশী তো বয়স্কা। সমিতির নিয়মকানুন শৃঙ্খলা রাতারাতি আয়ত্ত করতে ওর কষ্ট হয়নি। এত ছোট ইরা মীরা ডলি শর্মিষ্ঠাও কমলার কড়া ট্রেনিংএ থেকে সমিতির নামে ওঠছে বসছে। অথচ এই বয়েস। এই বয়েস কৈশোর অতিক্রম

করে চোখে চোখে যখন যৌবনের ফুল ফুটল, সমিতির ডাকে দিদি মাসীর হাত ধরে সবে রাস্তায় নামল। আশ্চর্য। মন দেয়া-নেয়ার ফেনিল উচ্ছ্বাস নেই, চাওয়া না চাওয়ার কঠিন কোমল ক্লান্তিকর অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারো মুখে তার ছাপ নেই।

নিশানাথের ভাল লাগল।

'কত ডিসিপ্লিন্‌ড, সুসংবদ্ধ হয়েছে এখানকার মেয়ে সমাজ। একের স্বার্থকে পায়ে দলে বৃহতের স্বার্থে তনুমন বিলিয়ে দেওয়ার ডাক শুনেছে এরা।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে নিশানাথ ভাবল। বলল মনে মনে, 'কেপিটেলিস্ট নিরঞ্জন রায়। কিন্তু গণতন্ত্রের ধ্বনি সামাজিকতার সুরে তিনি সাড়া দিয়েছেন। দেবেন তিনি, আমি জানতাম। শিলংএ পপি যখন বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল মনিবকে নামিয়ে আনলাম নিচে, আমার শহরে। মিঃ রায়ের মন একটু ছাড়া পাক মুক্তি পাক। স্ত্রী নিয়ে রাত-দিন মাথা ঘামাঘামি না করে সমিতির মেয়েদের নিয়ে কিছুদিন মেতে থাকুন তিনি। এতে তাঁর লুপ্তপ্রায় কর্মশক্তির পুনরুজ্জীবন হবে, ধ্বংসপ্রায় স্নায়ুতে জাগবে সাবলীল জীবন স্পন্দন।'

অথচ লিলিদেরও উপকার হচ্ছে। সমিতি বাড়ছে, বড় হচ্ছে।

'তোমরা বড় ক'রে দাও তাঁকে,—শিল্পহীন দেশের শিল্পপতি। তিনি বাঁচলে দেশে আরো দু'টো ইণ্ডাস্ট্রির গোড়াপত্তন হবে, আরো অনেক লোক খেয়ে বাঁচবে। তাঁর জীবনের মূল্য বেশী।' প্যারাডাইজের যে দরজা দিয়ে লিলিরা বেরিয়ে গেছে, সেই দরজার দিকে চোখ রেখে নিশানাথ নিজের মনে বিড়বিড় করল, 'মনে রেখো, চাঁদা হিসেবে যে টাকা তিনি তোমাদের থলেতে তুলে দিচ্ছেন, তা তাঁর বিত্তের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।'

'বরং', একটু একটু হেসে নিশানাথ অদৃশ্য লিলি কি সুশীকে ডেকে

যেন বলল, বরং তার বিনিময়ে ইরা মীরা কি ডলি কি তুমি বা শর্মিষ্ঠা যে মিঃ রায়ের বাংলোয় গিয়ে তাঁর সঙ্গে ব'সে কতক্ষণ ক'রে গল্প-গুজব করছ তার দাম অনেক বেশি। এমন আনন্দঘন রসময় এক একটা দিনের জন্যে তিনি পিপাসিত, বড় কাতর হয়ে উঠেছেন।

সত্যি, এমন ভাল মানুষ হয় না। সোনার আতা মিঃ রায় চাননি, সোনার আতার দিকে ভুলেও তিনি হাত বাড়াননি,—অথচ সেই ক্ষমতা তার আছে। একটু বেশি বয়সে তিনি পপিকে বিয়ে করেছেন, এই তো এটা অপরাধ? এর জন্যে স্ত্রী তাঁর খাওয়াপরা নিয়েও যখন তখন নাক কুঁচকোবেন, ভুরু বাঁকাবেন? এ যুগে তা অচল।

কমলা মাসী ঠিকই ধরেছে। এ যুগে এই নিয়ে মাথা গরম ক'রে ব'সে থাকা কত বড় বোকামির পরিচয় পপির মাথায় যদি তা ধরত।

হলামই-বা বয়সে নবীন, আমি আধুনিক।

প্রবীণ মনিবের দিকে না তাকিয়ে নবীনা মনিবানীর দিকে তাকাব কি ঝুকব, সে ছেলে নিশানাথ নয়। এমন অনাধুনিক সে হ'তে যাবে কেন, লিলি, সুশী।

নিশানাথ লিলি সুশীকে সম্বোধন ক'রে বলল, তোমাদের মতন এই শহরের জল-হাওয়ায় আমিও মানুষ। তোমরা সমিতি চিনেছ, আমি চিনেছি টাকা, ব্যাঙ্ক আরও দু'চার রকম ব্যবসা বাণিজ্য।

মিঃ রায় আমাকে সঙ্গে রেখে শেখাচ্ছেন। তোমরা তাঁর কাছে প্রিয় মনের দিক থেকে, আদর্শের জন্যে।

আমি প্রিয় তাঁর প্রয়োজনে।

টাকা-কড়ির হিসাব ব্যবসাবাণিজ্য দেখা-শোনা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত অধিকাংশ কাজেই আমি না হলে চলে না।

পপি পারে উপেক্ষা করতে। আধুনিকমনা হয়ে আমি পারি না

উপেক্ষা করতে কি নষ্ট হতে দিতে সুন্দর সমৃদ্ধ প্রতিভামণ্ডিত একজন ইণ্ডাস্ট্রীয়ালিস্টের জীবন।

আর দশটি ধনীর মত তিনি তেমন কিছু একটা খামখেয়ালীও নন।

ব্যুইক, স্টুডিবেকার, পণ্টিয়াক্ মিলিয়ে তাঁর চার পাঁচখানা গাড়ি। আছে পড়ে শিলং কোলকাতা ডিহিরী-অন্-শোন রাঁচীর গ্যারেজে।

আরোহী নেই চড়বার। মিঃ রায়ের নিজেরও বেড়াবার সখ একেবারে নেই। এই বয়সে বেশ কটি ছেলেমেয়ে তাঁর থাকতে পারতো। কিন্তু সময়মত তিনি বিয়েই করেননি আর এখন তো……।

সাত আটখানা বাড়ি আছে পড়ে জায়গায় জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে। শূন্য সব। মিঃ রায় সে সব দিকে ফিরেও দেখছেন না। অত্যন্ত ভালমানুষ, সাদাসিধে।

বড় রকমের কিছু সাদ আহ্লাদও পোষণ করেন না। এখানকার বাংলোয় যেরকম বাগানের আমি প্ল্যান দিয়েছিলাম তা-ই মেনে নিয়েছেন, এখানকার নতুন বাড়ির জন্যে আমি যে নক্সাটি ক'রে দিয়েছি তা দেখেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

যদি—কিছু—বা তাঁর উৎসাহ থাকে, লোভ, আকাঙ্ক্ষা, যা-ই আখ্যা দেও তোমরা তা ওই ওঁর খাওয়ার।

মাংস টাংসটা হলেই রায়ের উৎসাহ যেনো বেশি। কিন্তু এটা কি দোষের। আমি ভাবি এক এক সময় আমার মনে হয় বাসনার সূক্ষ্ম তন্তুগুলো, ইচ্ছার সোনালী কারুকাজগুলো, ছবি স্বপ্ন সব পপি নির্মম হাতে ছিঁড়ে দিয়েছে বলেই স্থুল ভোগের দিকে নেমে এসেছেন মিঃ রায়।

কষ্ট হয়, অনুকম্পা হচ্ছিল মিঃ রায়কে দেখে। পরন্তু রাত্রে খাবার টেবিলে ব'সে হাসতে হাসতে তিনি যখন বলছিলেন, 'পাখিটাখি অনেক হ'ল নিশানাথ,—এবার—'

কটমট ক'রে শ্রীমতী পপি নিরঞ্জন রায়কে দেখছিল তখন। ভদ্রলোক কথাটা শেষ করেননি।

আমি গ্রাহ্য করিনি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, মিঃ রায় সত্যি এবার আপনাকে হরিণ খাওয়াব। আমি খুঁজছি, মনে মনে খোঁজ করছি নধর সুন্দর একটি হরিণের। খুসি হয়ে মিঃ রায় তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন কিন্তু পকেটে মনিব্যাগ নিয়ে তো আর তিনি খেতে বসেন না, কি চেক্‌বই নিয়ে। শূন্য বাঁ-হাতটা তাঁর পকেট থেকে ওঠে এল। আমি দেখছিলাম।

রাগ হয়ে পপি বিড়বিড় ক'রে আমার মুণ্ডপাত করছিল। Most obedient servant' দাঁতের মধ্যে কিড়মিড় করছিল ওর শুনলাম। আমি গ্রাহ্য করিনি। নারীর প্রেম কি ঘৃণা কোনো দিন আমাকে বিচলিত করে না তোমরা তো জান লিলি।

আমি ডেভিল? আমি ডেভিল নই লিলি।

বস্তুত একদিক থেকে আমি যে তোমাদেরই উপকার করছি। সূর্যমুখীর দল তোমরা যাঁর দানে করুণায় আন্তরিক সমর্থনে পরিপুষ্ট প্রসারিত হয়ে ওঠবে তাঁর স্বাস্থ্য যদি ভেঙ্গে পড়ল তো আর আশা রইল কি। তোমরা বাইরে থেকে গিয়ে বাংলোর ড্রয়িংরুমে চক্রাকারে বসে কতক্ষণ আর বর্ণাঢ্য হাসি বিচিত্র গল্প দিয়ে মিঃ রায়কে সজীব সরস রাখতে পার। হাসি গল্প ছাড়াও শরীর ও মনের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে মানুষের জীবনে অন্য কিছুর প্রয়োজন। এবং সেদিক থেকে মিঃ রায় খুবই প্র্যাক্‌টিক্যাল। পপি রাগ করছে বলে নিজের খাওদা-দাওয়া সম্পর্কে তিনি মোটেই উদাসীন নন এটাই আশার কথা।

বরং তোমরা কেউ যদি অগ্রণী হয়ে অন্তপুরে ঢুকে সুন্দর হাতে মাঝে মাঝে নিরঞ্জন রায়কে মাংস রেঁধে খাওয়াতে তো তিনি আরো বেশি সুখী

হতেন। না কি পপি বর্তমান থাকতে মিঃ রায়ের অন্তপুরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছ না, অতটা অগ্রসর অতটা আধুনিক তোমরা হওনি? হবে, আজ না হোক ছুদিন পর এ শহরেরই কোনো-না-কোনো মেয়ে হবে, আমি জানি। ইরা মীরা ডলি কি শর্মিষ্ঠা ছোটদের মধ্যে দু'একজন সাহসিক বেরোবেই। কমলা মাসী ছোটবেলা থেকে ওদের ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলছে, এর ফল কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

নিশানাথ হাতঘড়ি দেখল।

এগারটার কাছাকাছি এসে ধুকধুক করছে কাঁটা।

প্যারাডাইজের হল-কামরা একেবারে শূন্য। লিলিদের চলে যাওয়ার পর আর কেউ আসেনি। লিলিরা যেসব প্লেট ডিস্ কাঁটা-চামোচ মসলার কৌটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গিছল তার একটিও এখন টেবিলের কোথাও চোখে পড়বে না। পিঠে-তোলা চেয়ারগুলো আবার সার করে সাজিয়ে টেবিল ঘেঁসে বসানো হয়েছে যেমনটি আগে ছিল। ওধারে পার্টিশনের ওপারের উনোনের ধার থেকে নতুন চপকাট্‌লেট ভাজার গন্ধ ও শব্দ দুই-ই ভেসে আসছিল। অবশ্য রেস্টুরেন্টের সদরের চারটে দরজার তিনটেই রাত সাড়ে দশটার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। একটি দরজা খোলা থাকে। গভীর রাত্রে যারা রেস্টুরেন্টে খেতে আসে বা খেয়ে বেরিয়ে যায় তাদের জন্যে এই দরজা। এত ছোট শহরেও মধ্য রাত্রে গ্রীল কারী কাটলেট ফ্রাই খাবার মতন পয়সাওলা সৌখিন লোকের অভাব নেই, যেন প্যারাডাইজের কর্তা তা জেনে ফেলেছে, কেউ-না-কেউ আসবেই সেভাবে তৈরী হয় জিনিস।

খোলা দরজার ওপর চোখ বুলিয়ে নিশানাথ ফের ঘড়ি দেখল। কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা এখন। বেশ বোঝা গেল কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে নিশানাথ।

প্যারাডাইজের মালিক অতুল সুর। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। গায়ে হাতাকাটা ফতুয়া। দাঁতগুলো নোংরা। গলায় তুলসীর মালা। ক্যাশ নিয়ে এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকে। এবং মাঝে মাঝে খদ্দের কেউ—হাত—তুলে বসে আছে কিনা বা আরও কিছু চাই কিনা তত্ত্বতলাস করতে বাক্সের চাবি ঘুরিয়ে খড়মের ফট ফট আওয়াজ তুলে সোজা চলে আসে হল-কামরার মাঝখানে, দাঁড়িয়ে দেখে সব।

সেই অতুল সুরের চোখেও এখন ঢুল নেমেছে।

নিশানাথ আড়চোখে দেখল।

বাইরেটা একদম নীরব হয়ে গেছে। দূরে একটা রিক্সার ঘণ্টা শোনা যায়। কান পেতে রইল নিশানাথ একটুক্ষণ।

একটু পর ভিতরে এসে ঢুকল বাংলোর চাকর দিলবাহাদুর। নিশানাথ যাকে নিযুক্ত করেছে। নিশানাথ বাইরে থাকলে বাহাদুর যখন তখন তাকে বাংলোর খবর এনে দেবে। নিশানাথের কড়া নির্দেশ আছে নবনিযুক্ত পাহাড়ি ভৃত্যটির ওপর। আর দিলবাহাদুর জানে 'মেন্‌জার-বাবু'কে খুসি রাখাই মানে এই চাকরিতে পাকাপাকি বহাল হয়ে যাওয়া এবং পদোন্নতি।

মাইনে বেড়েছে দিল্‌বাহাদুরের, জোর বখ্‌সীশ মিলছে।

'মাঈজীর কথায় কান দিবিনে। সাহেব কখন কি চায় খেয়াল রাখবি।' নিশানাথ দিল্‌বাহাদুরকে বুঝিয়েছে পপির ব্যারাম আছে। রুগী। মাথায় ছিট্ আছে। সাদি করার পর থেকে সাহেবের মনে সুখ নেই।

পাহাড়ী বাচ্চা দিল্‌বাহাদুর বুঝেছে সেটা।

প্রকাশ্যে পপিকে সে সম্মান করেছে আড়ালে ঘৃণা করেছে।

'মেন্‌জারবাবু'র নির্দেশমত সে সাহেবের সুখসুবিধাই দেখছে বেশি। তার মনিবের মনিব নিরঞ্জন রায়। পপি কি চাইছে না চাইছে তা দেখবার তার দরকার নেই।

'ক্যা খবর?' নিশানাথ ভুরু কুচ্‌কোলো।

'সাহেব আভি জোর ড্রিঙ্ক করতা, মেন্‌জারবাবু।'

'করনে দেও।' নিশানাথ ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল। 'সোডা সব ঠিক ঠিকসে ভেজ দেও।'

'জরুর দেঙ্গে।'

পাহাড়ী বাচ্চার চোখ দুটো পিট্‌পিট্‌ করছিল। থেকে থেকে জ্বল্‌ছিল।

নিশানাথ টিন থেকে তুলে নতুন সিগারেট্‌ মুখে গুঁজল। নিশানাথের দুই চোখও জ্বল্‌ছিল।

'পপি?'

পপির কথা নিশানাথ জিজ্ঞেস করতে ভুলল না। কেননা শেষ পর্যন্ত পপিই বাধা দেয় ভণ্ডুল করে। শিলং-এ নিরঞ্জন রায়ের হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বনমোরগ খাবার সখ হয়েছিল, এই দিলবাহাদুরকে দিয়েই নিশানাথ জোগাড় করেছিল পাখি। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়।

দিলবাহাদুর গাঁও থেকে ধরে এনেছিল সুন্দর নধর মোরগ বাংলায় ঢুকতে পারল না।

গেট্‌ থেকে পপি ফিরিয়ে দিয়েছিল।

তখন পপির শরীর বেশি খারাপ ছিল। তাই মেজাজও বিগড়ে থাকত সারাক্ষণ।

'বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে পারো, যদি তোমার ওসব খেতে ইচ্ছা হয়' পপি বলত।

নিরঞ্জন রায় বার্-এ চলে গেছে পানীয়সহ মুরগী খেতে, কি হোটেলে।

অবশ্য দু'মাসে নিশানাথ নরম ক'রে এনেছে শ্রীমতীকে।

এখানে এসে শিলং কি পুরী কি নীলগিরির নিয়মকানুনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এটা বাঙলা দেশ। নিরঞ্জন রায় বাঙালী। এখানে তাঁর আভিজাত্যবোধ বেশি। সামাজিকতার প্রশ্ন বড়। ছোট যায়গা। বড়লোকেরা সবাই বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করেন। হোটেলে গিয়ে হৈ-চৈ ক'রে খাওয়াটা মিঃ রায়ের পক্ষে বেমানান হবে।

ভোগের সঙ্গে বিশ্রাম, শান্তি ও নীরবতা ভোগ এ দেশের চিরাচরিত ধর্ম।

নিশানাথ এখানে এসে প্রথমেই একথা বুঝিয়েছে পপিকে। এতে নিরঞ্জন রায়ের তো সম্মানে বাধবেই, স্থানীয় লোক বলে নিশানাথেরও এক কান কাটা যাবে।

যে দেশের যে রীতি, যে অঞ্চলের যে নিয়ম।

মিঃ রায় বাড়িতেই খাক। পপির এতে আপত্তি শুনলে লোকে নিন্দা করবে, দুয়ো দেবে।

তা ছাড়া ব্যবসায়ী জমিদারের আনাগোনা করার মত বড় হোটেল পপি এখনই এই শহরে আশা করতে পারে না।

তারপর নিশানাথ বলেছে তাঁর শহর সুন্দর জায়গা। শহরের পশ্চিমে নদী। নদীর ওপারে পদ্মপাতায় ঢাকা প্রকাণ্ড বিল আছে। সেই বিলে রাশি রাশি বালিহাঁস পড়ে থাকে। নিশানাথ ছোট বেলায় প্রচুর শিকার করেছে তার মামাবাবুর দেওয়া এয়ারগান দিয়ে।

এখন আবার তার সখ হয়েছে শিকার করতে। এবং ওস্তাদ শিকারীর সন্ধান পেয়েছে বলে মিঃ রায়েরও খাওয়ার লোভ বেড়ে গেছে।

যে ব্যাপারে দুইজন পুরুষ একত্র হয়, সেখানে একলা মেয়েমানুষ কিছু

করতে পারে না। পপি দুঃখিত হচ্ছে বলে নিশানাথ তো আর মিঃ রায়ের টেবিলে রোজ রাত্রে পাখি তুলে দিতে বন্ধ রাখতে পারছে না। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে দেবে না সে। অর্থাৎ আগে সে কর্মচারী, মনিবের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। পিছনে প্রেমিক। যদি মনিবানী তাই মনে করে থাকেন।

পপি আর সাহস পাচ্ছে না সন্ধ্যার পর নিরঞ্জনের রোজ মাংস খাওয়া নিয়ে আপত্তি করতে।

যেখানে নিশানাথ নিজে উৎসাহ দিচ্ছে।

নিজের হাতে সে শিকার ক'রে আনছে সুন্দর বালিহাঁস, খাওয়া-চলে —এমন ছোট বড় রং বেরঙের পাখি।

পপি রাগ করছে মুখ ফুটে কিছু বলছে না।

বললেই নিশানাথ উত্তর তৈরী করে রাখছে, বলে, 'তালে মিঃ রায়কে নিয়ে হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে যেতে হয়, যেখানে উকিল মোক্তার মাষ্টার কেরানী নাজীর পেস্কার গিস্‌গিস্ করছে। এতে তাঁর সম্মান যাবে আপনারও সম্মান ক্ষুন্ন হবে, মিসেস রায়।'

'আর যাই হোক, মিসেস রায় সম্মান হারাবেন না, সুনাম বড় জিনিস।' যেন নিশানাথ কি বলতে চাইছিল কাল, বলেনি। ভয়ে পপি চুপ ক'রে গেছে হঠাৎ।

অর্থাৎ এ্যাদ্দিন হাঁস পাখি বাংলোয় চালান দেওয়া হচ্ছিল। মিঃ রায়ের মেজাজ মাফিক, কাল দুপুর থেকে নিশানাথ যখন শহরে গাঁয়ে একটা হরিণের জন্যে ছুটোছুটি করছিল পপি পরিষ্কার বুঝতে পারছে, রাত দুপুরে কর্মচারীর বিছানা ঘেঁসে দাঁড়ালেও কর্মচারী কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

মনিবের মন রাখতেই তার আগ্রহ বেশি।

মনিবানীর মান-অভিমান সে কম বোঝে।

নিশ্চয়ই এ-যুগের ছেলে একটা চেক্-এর দাম দেয় বেশি, নারীর দীর্ঘশ্বাসকে বাতাসের মতই জ্ঞান করে।

সেই দীর্ঘশ্বাস শোনাতে পপি, কাল ভোরে উঠে গাড়ি নিয়ে যখন নিশানাথ হরিণ খুঁজতে গাঁয়ের দিকে বেরোচ্ছিল, গাড়ির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল।

'উদর সর্বস্ব জীব। ও যে খাচ্ছে সেজন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে না।' ঘাসের উপর নিরঞ্জন রায়ের দেওয়া জুতা ঘসতে ঘসতে পপি বেণী নেড়ে বলছিল, 'আপনি একটি পেটুককে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে আপনার খাটুনিও বাড়ছে, দুঃখ হচ্ছে সেজন্যে।'

পপি আরো একটা পা তুলেছিল গাড়ির ফুটবোর্ডে।

নিশানাথ প্রশ্রয় দেয়নি।

'আর যাই করুন মিসেস রায়,—মিঃ রায়ের খাওয়া টাওয়া নিয়ে খুব বেশি ঠাট্টা করবেন না।'

'কি রকম? খুব চটেছেন নাকি আপনার মিঃ রায় কাল রাত্রের হরিণের ব্যাপার নিয়ে?'

একটা পা পপি ফুটবোর্ডের থেকে নামিয়ে নিয়েছিল।

স্টীয়ারীং হুইলের উপর নিবদ্ধ নিজের হাত দু'টোর ওপর চোখ রেখে নিশানাথ বলছিল, 'জানেন তা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করলে পুরুষ এক এক সময়ে সত্যি চটে যায়।'

'কি রকম?' ঢোক গিলেছিল পপি একটু গম্ভীর হয়ে। 'ওমনিতে ঠাট্টা ক'রে এক এক সময় এসব ওঁকে বলি। সেটা এমন সিরিয়স ব'লে ধরে নিলে চলবে কেন। একথা কে না জানে নিরঞ্জন রায়ের টাকা আছে ইচ্ছা করলে হাঁস হরিণ তো বটেই হাতী হাঙরও খেতে পারেন, কার কি বলার আছে।'

'সেই,' নিশানাথ মাথা ঝেঁকে হুইলে মোচড় দিয়ে বলেছিল, 'এতে আপনারও বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে, আর আমার,—আমি বেতনভুক কর্মচারী, বুঝতেই পারছেন, তাঁর মন রাখতে তাঁকে খুশি করতে,—'

'থাক আর বলতে হবে না।'

গভীর দুঃখে পপি ডান পা'টাও সরিয়ে নিয়েছিল ফুটবোর্ড থেকে। নিশানাথ ভ্রূক্ষেপ করেনি।

আজ বিকেলে বাংলোয় ফিরে চাকরদের মুখে সব শুনেছে নিশানাথ। বেশ বড় রকমের ঝড় বয়ে গেছে রায় পরিবারে। কাল সকাল বেলা মফঃস্বলে বেরোবার সময় নিশানাথের মুখ থেকে মোক্ষম বাক্য ক'টি শোনার পর থেকে এমনি তো পপির মন-মেজাজ ভাল ছিল না, তার ওপর মিঃ রায় সারাদিন নাকি ড্রিঙ্ক করেছেন, ওদিকে আবার ঘণ্টায় ঘণ্টায় সমিতির মেয়েরা যাচ্ছে তাঁর কাছে। সন্ধ্যার দিকে ছোট সংস্করণ মানে ইরা, মীরা যায়, তারপর নিশানাথ ঠিক বুঝতে পারছেনা, কেননা মালী ইমামবক্স কি দিলবাহাদুর কেউ চেনে না, মেয়েটি রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই পপি দরজায় উঁকি দিয়ে বাঁকা মতন কি একটা মন্তব্য করেছিল। নিরঞ্জন রায় হাতের গ্লাশ ছুঁড়ে মারেন, পপির গায়ে যদিও তা লাগেনি। অর্থাৎ নিরঞ্জন রায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে।

এই ধরণের ঘটনা এই প্রথম। বিয়ে হয়েছে তাদের ঠিক এক বছর তিন মাস। পপি চীৎকার করে কতক্ষণ নাকি বারান্দায় বাগানে ছুটোছুটি করছিল, [তারপর নিজের কামরায় ঢুকে দরজায় খিল দিয়েছে।

সবচেয়ে মজার, বড়লোকদের গিন্নীরা বাড়ির চাকর-বাকরদের কাছ থেকে একফোঁটা সহানুভূতি পান না।

স্ত্রী যত-সুন্দরী যত তরুণী হোক।

কেননা, চাকররা জানে নিরঞ্জন রায় একজনের জায়গায় চারজন স্ত্রী ঘরে আনতে পারেন।

তারা সর্বদা দেখছে বাগানে যেমন করে ফুল ফোটে তেমনি দুপুরে সকালে বিকেলে সন্ধ্যায় মিঃ রায়ের ড্রয়িং-রুমে ঝাঁকে ঝাঁকে এই শহরের অনূঢ়া সুন্দরীরা আসছে। সমিতির পাখিরা।

বেশি বয়স বলে পপি নাক সিটকাচ্ছে, কিন্তু ওরা কি করে সাহেবের সঙ্গে অনর্গল গল্পে মাতছে, থার্ড ক্লাশে পড়ুয়া তেরো বছরের ডলি অবধি।

'মাঈজীর দিমাক খারাপ হো গিয়া', দিলবাহাদুর আজকাল আড়ালে হি হি করে হাসে। ইমামবক্স বলে, 'সাহেবনীর মাথায় ছিট আছে।'

'তোরা কাজ কর, চাকরি করতে এসেছিস সাহেবের, মন দিয়ে তাঁর কাজ করে যাবি। সাহেবনী কেমন ভেবে, মাথা ঘামিয়ে দরকার কি।' উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হাতে নিশানাথ সিকি-আধুলি গুঁজে দিচ্ছে, সুতরাং পপির জন্য পপি-লজের দারোয়ান মালি চাকর আর্দালি কেউ এতটকু মাথা ঘামাচ্ছে না।

নিশানাথও সাহেবের চাকর। ম্যানেজারবাবু।

চাকরীতে ম্যানেজারবাবু অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি করেছে, সুতরাং বাড়ির আবহাওয়া যেমন থাক, ম্যানেজারবাবুর কথামত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ চাকরেরা বেশ বুঝেছে। ম্যানেজারবাবুকে খুসি করবার জন্যে দিলবাহাদুর, ইমামবক্স, বটুক সিং এখন অতিমাত্রায় ব্যগ্র।

এই 'প্যারাডাইজে' বসেই নিশানাথ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর পাচ্ছে, দারোয়ান চাকররা ছুটে এসে বাংলোর ভিতরের অবস্থা জানাচ্ছে ম্যানেজারবাবুকে।

দিল্‌বাহাদুর আধা বাংলা ও হিন্দী মিশিয়ে 'পপি-লজের' মোটামুটি যা বর্ণনা দিল তার ভাবার্থ এই। গোঁশা-ঘর মানে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে মাঈজী দরজায় খিল এঁটে নিধ যাচ্ছে। সাহেব বসবার ঘরে আছে। দিলবাহাদুর অতিরিক্ত তিনটে সোডার বোতল ও আরো কিছু বরফ সাহেবের টেবিলে রেখে এসেছে। বাংলোর বারান্দার আলো নিভিয়ে দিয়ে এসেছে। আসবার সময় দারোয়ান ফুলসিংকে বলে এসেছে রাত সাড়ে এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে দিতে।

'হুঁ'। নিশানাথ মাথা নাড়ল, 'গাড়ি লিয়ে হাম্‌ একদম অন্দরমে চলা যা'গা।'

'সব ঠিক হ্যায়, মানজারবাবু।'

পাহাড়ি বাচ্চার চোখ পিট পিট করছিল। এসব কাজ তার ডিউটির অঙ্গ।

'আউর একটো কাম বাকি, বাহাদুর।' নিশানাথ আড়চোখে ঢুলন্ত অতুল স্থরকে দেখল। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল কপালের।

ম্যানেজারবাবুর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে চেপ্টামুখ দিল-বাহাদুর হুকুমের অপেক্ষায়।

ফিসফিসে গলায় শিশানাথ বুঝিয়ে দিল পপির ঘরের দরজায় বাইরে থেকে দুটো কড়া আছে। যদি হঠাৎ জেগে ওঠে, কি সাহেব খাচ্ছে টের পেয়ে রাতদুপুরে পপি চিল্লাচিল্লি করে তো দিলবাহাদুর যেন বাইরে থেকে ওর দরজায় তালা আটকে দেয়। নতুন কেনা মজবুত আমেরিকান তালা।

'জরুর দেংগা।'

দিলবাহাদুর মিলিটারী কায়দায় মাথা নাড়ল।

সাহেবের খানাপিনা নিয়ে মাঈজী হামেসা গণ্ডগোল করে গোঁসা করে এটা বাহাদুরের অসহ্য। এমন বেতরিবত ইস্ত্রী পাহাড়েও কোনো আদমীর আছে কিনা সে জানে না।

সাহেব হরিণ খাবে। ম্যানেজার তার ব্যবস্থা করছে এবং নিশা-নাথকে সন্ধ্যা থেকে প্যারাডাইজে বসে থাকতে দেখে (বাংলোর খবর দিতে এর আগে আরো দুবার তাকে এখানে আসতে হয়েছে) দিলবাহাদুর অনুমান করল হরিণের গোস্থ এই রেস্টুরেন্টেই পাক হচ্ছে। পাক হলে নিশানাথ নিজে সঙ্গে করে গাড়ি করে তা পৌঁছে দিয়ে আসবে বাংলোয়। সে জন্যেই দারোয়ানকে বলা যেন গেট খোলা থাকে, ডাকাডাকিতে পপি জেগে উঠতে পারে, আলো থাকলে পপি দেখতে পাবে রাতদুপুরে বাংলোয় হরিণ চালান হচ্ছে, সেজন্যেই সামনের বারান্দা বিলকুল আঁধার করে রাখা।

নিশ্চয়ই, যদি আজ পপি সাহেবের খাওয়া নিয়ে চিল্লাচিল্লি করে তো দিলবাহাদুর ঠিক ওর দরজায় তালা লাগাবে। শিলং-এর .বন মোরগের ঘটনা দিলবাহাদুর মন থেকে মুছতে পারছে না।

করকরে দুটো দশ টাকার নোট তার পেন্টুলনের পকেটে ঢুকত সেই রাত্রে।

ম্যানেজার দিত। নিশানাথ।

ইস্ত্রীর সাথে সাহেবের বনিবনা হচ্ছে না পর থেকে নিশানাথ সাহেবকে খাওয়ানোর ভার নিয়েছে। আজ হরিণের ব্যাপারটা সাহেব চুপিচুপি সারতে পারলে ম্যানেজারের পকেটে কি পরিমাণ উঠবে এবং তা থেকে চাকর দারোয়ানদের হাতে কত ছিটকে আসতে পারে চালাক দিল-বাহাদুর মনে মনে হিসাব করে ফেলেছে।

রোজগার করতে এসেছে সে দেশগাঁও ছেড়ে, রোজগারের দিকেই মন রাখবে।

তার চাচা টেগ বাহাদুর লামডিং এক বর্মির বাংলোয় ফি রাতে গিরগিটি কাছিম শামুক চালান দিয়ে ঢের উপরি রোজগার করত।

বর্মি সাহেবের ইস্ত্রীর গিরগিটি কাছিম দেখলেই গোঁসা উঠত। চিল্লাচিল্লি করত জোর। অথচ সাহেবের সে সব না হলে খাওয়াই চলত না।

এক রাতে শরাব খেয়ে সাহেব যখন বেহেড্ হয়ে বসে আছে টেগ্-বাহাদুর ধরে নিয়ে যায় এক সঙ্গে এক ডজন গিরগিটি। সাহেব চেয়ারে বসে টেগ্‌বাহাদুরের গিরগিটি কাটা দেখছিল, ছোলা দেখছিল। তখন বর্মিনী রাগ করে তেড়ে টেগবাহাদুরের কাজে বাধা দিতে যায় সাহেবের খাওয়া বন্ধ করতে। সাহেব খাড়া হুকুম করেছিল সাহেবনীর গলায় কুকরি বসাতে।

টেগবাহাদুর বসিয়ে দিয়েছিল।

খুনের মামলা হয়। বর্মি তিন থলে টাকা ঢেলেও টেগবাহাদুরকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে পারল না। নিশানাথ বুঝিয়েছে সেরকম কিছু 'পপি-লজে' দিলবাহাদুর যেন না ঠাওরায়। কেননা বাঙালী সাহেবেরা বর্মিদের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা, রাগ করলে বৌয়ের গলায় তাঁরা কুকরি বসাতে হুকুম করে না কি কুড়াল মারতে।

সাপ গিরগিটি খেয়ে বর্মিদের মেজাজ তিরিক্ষি থাকে। নিরঞ্জন রায়ের সে সব দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর লোভ সুন্দর পাখির দিকে হাঁস পায়রার দিকে নধর হরিণের দিকে। সেজন্যে সাহেবের স্বভাবও এত সুন্দর, মেজাজ এমন মোলায়েম। তা ছাড়া এটা লামডিং-এর জঙ্গল নয়, বাঙলা মুলুকের নয়া উঠতি শহর। এখানকার সবকিছুই মাজাঘষা পালিশ ঝক্‌ঝকে। সোনা বাঁধানো দাঁতে মসৃণ হেসে নিশানাথ বাচ্চা পাহাড়িকে

বুঝিয়েছে এখানে খানাপিনা নিয়ে পপি যদি তেমন কিছু বদমাসি করে তো মিঃ রায় বড়জোর রাগ করে ওকে ধরে আটকে রাখতে বলবেন কি আরো একটু বাড়াবাড়ি করলে হাত পা বেঁধে রাখতে। খুনখারাপি কিছু হবে না।

তা ছাড়া শাল সেগুনের কারবারী বর্মি সাহেবের কাছ থেকে টেগ-বাহাদুরের কত আর বকশিশ মিলত।

বর্মির গাড়ি ছিল? না বাড়ি ছিল? না এমন পাকাপোক্ত একজন ম্যানেজার?

বাংলোয় হরিণ পৌছবার আগেই (শুধু পাওয়া গেছে এই খবরের ওপর) ম্যানেজার মানে নিশানাথ মার্চেন্ট জমিদার নিরঞ্জন রায়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি চাকরকে পয়লা দফা বকসীশ দিয়ে খুশি করে রেখেছে।

যেন সব প্রস্তুত থাকে, কেউ এতটুকু শিথিলতা না দেখায় কাজে।

বাইরে থেকে পাক করিয়ে আনা হোক, আর এখানেই রান্না হোক, রাত্রে রায়ের টেবিলে যখন খানা ওঠবে তখন তিনি যেন হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্ল-মনে নিশ্চিন্ত আরামদায়ক পরিবেশের মধ্যে বসে তা খেতে পারেন। তার এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটে একতিল ব্যতিক্রম না হয় সেজন্যে চাকরদের পক্ষ থেকে নিশানাথের ব্যস্ততা, সতর্কতা ও উদ্বেগের সীমা নেই। নিশানাথও চাকর, মিঃ রায়ের বেতনভুক কর্ম্মচারী।

মনিব আগে মনিবানী পিছনে।

গণ্ডগোল হবে না, এখানে গোলমালের আশঙ্কা কম।

সেরকম কিছু ঘটবে বলেই তো নিশানাথ নিরঞ্জন রায়ের স্ত্রীকে এখন থেকে টেবিলের কাছেই ঘেঁষতে দেবে না, বিশেষ বিশেষ কিছু খাদ্যের আয়োজন যদি ঘটে কোনো রাত্রে।

লামডিং কি শিলং-এর জঙ্গল আর বাঙলা মুলুকের খানাপিনার ব্যবস্থায় এই তফাৎ।

এখানে কৌশলে কাজ সারা হয়, কায়দায় কাম ফতে হয়।

চতুর পাহাড়ি-শাবক বঙালী মানজারবাবুর বুদ্ধিমাখা হাসি ধরতে পারল, ইঙ্গিত বুঝল।

সাহেবকে খুশি করতে পারলে কাল সকালে আর এক দফা বকসীশ।

ঘাড় সোজা রেখে দিলবাহাদুর মিলিটারী কায়দায় হাত দিয়ে কুর্নিশ জানাল ম্যানেজারবাবুকে।

লক্ষ্য করল না সে ম্যানেজারবাবু তখুনি আবার গম্ভীর হয়ে হাতঘড়ি দেখছে। দাঁতে দাঁত ঘসে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। 'শালা ইমামবক্স এখনো এলো না, এগারোটা পঁচিশ।' বিড়বিড় করছে নিশানাথ।

ইমামবক্স হরিণ আনবে, কি হরিণ আনা হয়ে গেছে, রেস্টুরেন্টের পাকঘরের হাঁড়িতে টগবগ করছে ইমামবক্স বাইরে গেছে 'ম্যানেজারবাবুর' সিগারেট আনতে, আর বসে বসে নিশানাথ বিরক্ত হয়ে ইমামবক্সকে গালাগাল করছে এসব কিছুই ভাববার দরকার বোধ করল না দিলবাহাদুর। সে তার ডিউটি বুঝে নিয়েছে, ইমামবক্স ইমামবক্সের কাজ করবে, সে দেখবে তার ডিউটি ঠিকসে সারা হল কিনা। লম্বা পা ফেলে দিলবাহাদুর চলে গেল 'পপি-লজের' দিকে। নিশানাথের হাতঘড়িতে এগারোটা ছাব্বিশ।

রাত বারোটার কাছাকাছি এসে শহরের হৃদপিণ্ড ধুঁকতে থাকে। গভীর রাত্রে আকাশের তারার চোখে যখন ঝিমোনি আসে আর মাঝে

মাঝে একটি দুটি তারা অদ্ভুত দ্যুতি নিয়ে জ্বলতে থাকে তেমনি এই শহরের বারো আনি ঘরে যখন আলো নেভে, ঘুমে অন্ধকার হয়ে যায়, তখন থেকে থেকে মাঝে মাঝে একটি দুটি গৃহস্থ ঘরে বেশ তীব্র হয়ে আলো জ্বলে।

এক নম্বর ঘর বকুলবাগানের সাবরেজিস্ট্রারের। মুরারি হাজরার। শহরের অন্যতম প্রবীণ আধুনিক।

টেবিলে একটা ল্যাম্প্ জ্বলছে। পাশের চেয়ারে মুরারিবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

গলায় কম্ফর্টার একটু ঢিলে করে দিয়েছেন, বেশ কিছুক্ষণ হয় বেড়ানো শেষ ক'রে ঘরে ফিরেছেন। মুরারিবাবু অপেক্ষা করছেন, টেবিলের সুদৃশ্য 'বিগ্-বেন' টাইম্পিসের কাঁটার ওপর তাঁর বিনিদ্র চক্ষু।

হ্যাঁ, মুরারিবাবুর অন্তঃপুরের ছবি দেখার সৌভাগ্য আজ আমাদের এই প্রথম হ'ল।

মুরারি বাইরে আধুনিক।

এক এক সময় একটি কুড়ি বছরের ছেলের চেয়েও বেশি প্রগতি-পরায়ণ।

কিন্তু, কিন্তু—অবশ্য দোষ নেই, কেননা রীতিমত ফিফ্টির ঘর অতিক্রম ক'রে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন। শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভাকে ঘরে এনেছেন। এই সেদিন।

তাই মুরারিবাবু শিক্ষয়িত্রী কোয়ার্টারে, চেরীর মার সামনে, প্যারাডাইজে বসে, মোহিনীদের সামনে, পার্কে রাস্তায়, টাউনহলে যতই আধুনিকতার বক্তৃতা দিন ঘরে তিনি ভয়ঙ্কর রিজার্ভ।

এটা ওর দুর্বলতা, আড়ালে মোহিনী নন্দীরা হাসেন। সাবরেজিস্ট্রারের ভিতর কাঁচা। অর্থাৎ অন্দরের জীবটি এত বেশি কচি যে ওখানে বেশি প্রগতি টানতে গেলে সাবরেজিস্ট্রারের ঘরে রাখা মুশকিল হয়ে উঠবে;

বন্ধু মোহিনীরা খোঁচা দেন, স্নিগ্ধপ্রভা সমিতিতে নাম লেখাবেন, আসলে মুরারির নাকি ইচ্ছা ছিল না,—আসলে মুরারি হাজরা কনজার্ভেটিভ।

সত্যি তাই দেখা গেল।

এই যে তিনি, বেড়ানো শেষ ক'রে এসে চুপচাপ টেবিলের কাছে বসে অনর্গল ঘড়ি দেখছেন, তার কারণ এখন পর্যন্ত স্নিগ্ধপ্রভা ঘরে ফেরেন নি।

তার দরুণ এখন পর্যন্ত মুরারিবাবুর গরম জল করা হয়নি। গরম জল করা হবে, হাত-পা ধোয়া হবে, তার পরে তিনি খাবেন।

মুরারিবাবু বেশ বিরক্ত, চোখের ভাবে বোঝা গেল। কেননা, মুরারিবাবু চান না ঘরের কাজ নেগ্‌লেক্ট করে প্রভা বাইরে ঘুরে সমিতি করুক।

তর্ক আরম্ভ হলে মুরারি হাজরা মোহিনীদের বোঝান, নিজের স্বাস্থ্য, লন্‌জিভিটির দিকে নজর রেখেই তিনি নিয়মকানুনগুলো মানতে চাইছেন, ঠিক সময়ে খাওয়া, সময়মত শোয়া,—

'না হে অন্যরকম ভয়।' মোহিনীবাবুরা খোঁচান। স্বাস্থ্য ভাল রেখে লন্‌জিভিটি পেয়ে তুমি তো আর পার্লামেন্টের সদস্য হ'তে যাচ্ছ না, সুতরাং মরবার ভয়টা কি।'

মুরারি হাজরা প্রবলবেগে মাথা নাড়েন। অর্থাৎ মোহিনীদের অনুমান সর্বৈব মিথ্যা। এমন কি চেরীর মাকেও আজ, একটু আগে, ঘড়িতে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ডিস্পেন্সারি ছেড়ে যখন তিনি ঘরের দিকে রওনা হচ্ছিলেন এবং নীহার ঠাট্টা করছিল, হেসে ডাক্তারগিন্নীকে বুঝিয়েছেন, 'লন্‌জিভিটি পেলে আমি আরো বেশিদিন সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে পারব এই আশায় এই প্রেরণায়,—শোওয়া নাওয়াটা এ বয়সে একটু রুটিনমাফিক, বুঝতে তো পাচ্ছেন, মিসেস সেন, এমনিও আমার কফের ধাত।'

মিসেস সেন অর্থাৎ নীহারনলিনী যা-ই বুঝুন মোহিনীরা ধরে ফেলেছেন মুরারির চালাকি। আসলে ওর ঘর নিয়ে আতঙ্ক। অই বয়সে কেন যে ও—

অর্থাৎ সাবরেজিস্ট্রার মস্ত ভুল করল জীবনে।

মোহিনী গলা বড় ক'রে বলেন, 'সেজন্যেই তো ভুল, ভয় ও নিজের রক্ষণশীল মনের চেহারা ঢাকবার তাগিদে বাইরে ও প্রোগ্রেসিভ, প্রোগ্রে-সিভ ক'রে এমন গলা ফাটাচ্ছে। আরে বাবা, তা কি হয়, আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও। মিসেস হাজরা মুরারির জীবনের ট্র্যাজেডী, সেজন্যেই তো পলিটিক্যাল মাইণ্ডেড ও হ'তে পারল না, ভিতরে ভিতরে এত বেশি কন্‌জারভেটিব।'

মোহিনী নন্দী যতটা বলেন, ততটা রক্ষণশীল সাবরেজিস্ট্রার কিনা জানা যায় না, তবে রাত এগারোটার পরও ভার্যা ঘরে না ফেরাতে তিনি মনে মনে তিক্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেছেন, অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে। টেবিলের ঘড়ি দেখছেন মুহুর্মুহু, আর ঘরে ফিরলে শ্রীমতীকে ঘরের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্যে কি ধরণের বক্তৃতা দেবেন কি ক'রে বোঝাবেন যে, ঘর ও বাইর, দু'টোর ব্যালান্স রাখার মধ্যেই আধুনিক হাজিফের কৃতিত্ব, গুণপনা চারিত্রিক মাধুর্য নিহিত রয়েছে। একটিকে অবহেলা ক'রে কি আর একটি করা চলে?

সাবরেজিস্ট্রার ক'দিন ধ'রে বেশি রাত ক'রে স্নিগ্ধপ্রভার ঘরে ফেরা নিয়ে, অধৈর্য অসহিষ্ণু হ'ন, স্ত্রী যখন ঘরে ফিরবে তখন কিন্তু আর রাগ বা বিরক্তির ভাব চোখে-মুখে ধরে রাখবেন না, বরং একটু হেসে বেশ নরম গলায় সুন্দর শব্দ প্রয়োগ ক'রে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করবেন—বোঝাবেন তরুণী ভার্যাকে গৃহকর্মের মূল আদর্শ।

কড়া কথা তিনি স্নিগ্ধপ্রভাকে বলেন না।

বা কথা বলার সময় কোনোরকম উষ্মা বা চাঞ্চল্যও প্রকাশ করেন না।

বাইরের মুরারি হাজরা আর ঘরের ভিতরের মুরারির মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য তা যদি কেউ দেখতে চান তো এখন, এই বেলা, রাত যখন বারোটার কাছাকাছি, ডিট্‌জের নরম আলোয় উপবিষ্ট, স্ত্রীর জন্যে প্রতীক্ষারত, অভুক্ত ক্লান্ত সাবরেজিস্ট্রারকে একবার তাঁর পাকাভিটির টিনে ছাওয়া ঘরের আমকাঠের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখুন।

সাবরেজিস্ট্রার বিড়বিড় ক'রে রিহার্স্যাল দিচ্ছেন, শ্রীমতী সমিতির কাজ সেরে ঘরে ফিরে এলে যে কথা কয়টি তিনি বলবেন। এই মুরারিবাবু সন্ধ্যাবেলা সমিতিতে এখন পর্যন্ত মেয়েকে ভর্তি না করানোর দরুণ চেরীর মাকে কটুভাষণ শুনিয়ে এসেছেন যেন বিশ্বাস করা যায় না।

রিহার্সেলের সময় সাবরেজিস্ট্রারের কাঁচা-পাকা ভুরুতে কত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সন্দেহ ও আশঙ্কার কুটিল খেলা চলল তা তাঁর ঘরের দেয়ালের টিক্‌টিকিটা ছাড়া বুঝি আর কারোর নজরে পড়ল না।

সম্প্রতি স্নিগ্ধপ্রভা সমিতি উপলক্ষে অনেকের বাড়ি যাওয়া আসা করছে।

সাবরেজিস্ট্রার শোনেন। প্রভা বেড়িয়ে এসে নিজেই ফিরিস্তি দেয়।

মোহিনীর মেয়ে লিলির সঙ্গে হালে ভাব হয়েছে। বেশ মাখামাখি।

আর যেখানেই যাক প্রভা, মুরারি হাজরা মনেপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকছেন ক'দিন ধ'রে, স্ত্রী না লিলির সঙ্গে মোহিনীর বাড়িতে গিয়ে ঢোকেন।

নিশ্চয়ই। মোহিনীকে বাল্যবন্ধু মুরারি হাজরা ছাড়া আর কে বেশি জানেন। স্ত্রী-বিয়োগের পরও মোহিনী যে আর বিয়ে করল না, এটা অর বাড়াবাড়ি, সাবরেজিস্ট্রার মনে করেন, পলিটিক্‌স্-এর নেশায় এরকম হয়েছে।

কিন্তু সাবরেজিস্ট্রার তা ভাল চোখে নেননি, নিতে পারছেন না।

তাই, রিহার্সেলের সময় ভুরুর উদ্বেগ অশান্তি ছাড়াও মুরারিবাবুর শুক্‌নো চোয়াল ছুটো কাঠের টুক্‌রোর মত ছু'বার শক্ত হয়ে ওটল।

কতকটা বন্ধু মোহিনীর ওপর ঈর্ষায়, বাকিটা প্রভার ঘোরাফেরা মেলামেশার সার্কেল বাড়ানোয়।

এত রাত্রে আলো জলছিল বকুল বাগানের মোহিনী নন্দীর ঘরেও।

সাবরেজিস্ট্রারের টিম্‌টিমে হ্যারিকেন লণ্ঠন। এখানে একশ' পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে।

মেয়েরা গোল হয়ে বসেছে মোহিনীর সামনে, ছু'দিকে।

সাবরেজিস্ট্রারের আশঙ্কা অমূলক।

স্নিগ্ধপ্রভা এখানে আসেনি।

মেয়েদের সঙ্গে ব'সে মোহিনীবাবু নৈশ-ভোজন সমাধা করছেন। গল্প করছেন। আজ ইরা মীরা নিরঞ্জন রায়ের সঙ্গে পরিচয় শুধু নয়, বেশ কিছুক্ষণ তাঁর ড্রয়িং রুমে বসে গল্প ক'রে এসেছে। বড় রুইয়ের মুড়ো চিবোতে চিবোতে চেয়ারম্যান সেই কাহিনী শুনছেন। 'ব্যুইক স্টুডিবেকার পন্টিয়াক্‌ মিলিয়ে তাঁর চার পাঁচখানা গাড়ি আছে পড়ে শিলং কোলকাতা ডিহিরী-অন্‌-শোন রাঁচীর গ্যারেজে।' লিলি বাবাকে বোঝাচ্ছিল। 'আরোহী নেই চড়বার। নিঃসন্তান। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। সাত আটখানা বাড়ি, আছে পড়ে এখানে ওখানে। খাঁ খাঁ করছে। শূন্য সব।'

'হবেই তো, এই হয়।' বিপুলদেহ মোহিনীবাবু বড় মেয়ের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে আক্ষেপের নিঃশ্বাস ফেললেন। 'কার জীবনে কিভাবে ট্র্যাজেডি আসে কেউ কি বলতে পারে মা।'

'এমন ভালমানুষ উনি, বাবা।' বলল মীরা, 'নিজের হাতে টব থেকে

তুলে এই ফুল আমায় দিলেন।' মেয়ের বেণীর প্রান্তে গোঁজা সুন্দর সুবিশাল জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে আনন্দে চেয়ারম্যান দুই চোখ অর্ধমুদ্রিত করলেন।

'আমায় দিয়েছেন ডালিয়া।'

ইরা বুকের কাছে ফ্রকের সঙ্গে ফুলটা পিন দিয়ে আটকে রেখেছে।

'আশ্চর্য, তুমি জান না বাবা।' আড়চোখে ছোট দু'বোনকে এক পলক দেখে লিলি চেয়ারম্যানের চোখে চোখে চেয়ে অল্প হাসল। 'আমাদের, মানে বড় মেয়েদের তো ঈর্ষা করছেই, ইরা মীরাকেও মিঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেও পপির মুখ কালো হয়ে যায়। কি বিপদ।'

'করুক না, ওর মুখ কালোতে কি এসে যায়।' মোহিনীবাবু মাছের মুড়ো শেষ ক'রে অম্বলের বাটীতে চুমুক দেন। 'তোমরা যাবে, নিয়মিতভাবে দু'বেলা মিঃ রায়ের ওখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প-সল্প করবে। নাইস জেণ্টলম্যান। তোমাদের কথা থেকেই আমি টের পেলাম।'

ইরা মীরা খেয়ে উঠে যায়।

বাবার খাওয়া শেষ হ'লে এক সঙ্গে উঠবে ব'লে লিলি ব'সে থাকে। পরিবেশন করছিল মিলি। দু'জনের পাতের সামনে দুধের বাটী রেখে দিয়ে ও হাত ধুয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে।

নিভৃতি পেয়ে মোহিনীবাবু এবার নিচু গলায় নিরঞ্জন রায় সম্পর্কে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করলেন।

'না তেমন কি আর বয়েস হয়েছে।' আস্তে আস্তে লিলি বলল, 'এখনো শিশুর মত এক এক সময় হৈ হৈ ক'রে ওঠেন। বড্ড মিশুক। নতুন এসেছেন তো এখানে, আমরা গেলে কী যে খুশি হন।'

মোহিনীবাবু দুধ গিলবার আগে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বড়

একটা ঢোক দিলেন। আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। 'জিনিয়স, জিনিয়সগুলো এ রকমই হয়। বয়েস হলেও ছেলে মানুষ থেকে যায়, বড় হয়েও কাউকে বুঝতে দেয় না আমি বড়। ক্যাশ ক'লাখ টাকা আছে ওঁর বললে নিশানাথ?'

লিলি অঙ্কটা আবার বলল।

চেয়ারম্যান চুপ ক'রে রইলেন। লিলিও তাকিয়ে আছে সেই দিকে। সবুজ একটা পোকা আলোর চারদিকে অবিশ্রাম ঘুরছে।

লিলির সবচেয়ে ভাল লাগছিল রায়ের বাংলো থেকে ও ঘুরে আসার পর বাবা তাকে নিশানাথ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই জিজ্ঞেস করেননি।

লিলি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ক্ষীণ একটু হাসল। বাঁ হাতে খোপাটা একবার অনুভব করল।

চেয়ারম্যান চোখের দিকে তাকাতে হাত নামিয়ে ও ফের স্বাভাবিক হয়ে হসল।

'দেখি কোন একটা অকেশনে মিঃ রায়কে আমরা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে ভালমত একটা রিসেপশন দিতে পারি কি না।'

'তাই করো বাবা, তাই করা তোমাদের গার্ডিয়ানদের উচিত। আমরা, আমরা মেয়েরা অলরেডি তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছি, পেয়েছি মিঃ রায়কে।'

মোহিনী নন্দী উজ্জ্বল সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে শুধু মেয়েকে নয় উইমেন্‌স এসোসিয়েশনের সুযোগ্যা সপ্রতিভ সেক্রেটারিকে দেখছিলেন। গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠছিল।

ঘর অন্ধকার ক'রে দিয়ে দু'জন কথা বলছে। অরুণা আর জেগে নেই, টের পেয়ে বেশ স্পষ্ট গলায় বলছিল মাসী সুশীকে। হরিণ হরিণ

করছিল ও। কচিগুলোর সামনে তা আর বলতে পারলাম না। একটা দু'টো হরিণ আমি এই সন্ধ্যার মধ্যেই জোগাড় ক'রে দিতে পারতাম।'

'দরকার কি,' সুশী বলছিল, 'ওর লাইনে ও চলুক আমরা আমাদের রাস্তায় এগোব। পাছে তোমার ক্ষমতার কথা স্বীকার করতে হয় এই ভয়েই তো ও তোমার সাহায্য চাইলে না।'

'বটে।' মাসী ঠিক হাসল না, হাসির একটা কাঁপুনি গলার কাছাকাছি এক জায়গায় ধ'রে রাখল। 'সেয়ানা হয়ে উঠেছে, বেশি লায়েক হয়েছে নিশানাথ। ভাল।' কমলা পাশ ফিরল। 'তা নিজের বুদ্ধিতে কাজ করছে করুক, ওর মনিবকে ও খাইয়ে তুষ্ট রাখবে তাতে কার কি বলার আছে।' সুশী বলল। একটু থেমে মাসী আবার আরম্ভ করল। ঘরের চালায় গাছের শুকনো পাতা পড়ার যেমন টুপ্‌ টুপ্‌ শব্দ হচ্ছিল তেমনি অন্ধকারে টুপ্‌ টুপ্‌ ঝ'ড়ে পড়ছিল খাস্তগীরের তন্দ্রাজড়ানো আলস্য মাখানো কথা। 'তা' অতি বুদ্ধিতে তাঁতি নষ্ট নিশানাথ না ভুলে যায়। গিন্নীকে ফাঁকি দিয়ে রাত দুপুরে কর্তার ঘরে মাংস পাঠানোর বিপদ আছে, শেষ পযন্ত না—'

'পপি টের না পায় তার ব্যবস্থা চলছে, শুনলে না, বলছিল, ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে, তালা বন্ধ ক'রে আটকে রাখবে অন্য কামরায়।' সুশী নীচু গলায় হাসল।

'আচ্ছা।' মাসী ওদিক থেকে এদিক পাশ ফিরে শোয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলে লম্বা রকম। 'যত হুঁশিয়ার হয়েই তুমি কাজ করো না বাপু, ও চাপা থাকবে না। নিজের ঘরে তো আর রান্নাবান্না হচ্ছে না, বাইরে থেকে দ্রব্যটি চালান দিচ্ছ বাংলোয়, কাজেই কেউ না কেউ দেখবেই। আজ টের না পাক কাল পপি জানতে পারবেই।'

'মানে এক হরিণেই নিশানাথ শেষ। লুকিয়ে ছাপিয়ে একদিন হয়ত প্রভুকে খাইয়ে তুষ্ট ক'রে মোটা বকশিশ আদায় করবে, দ্বিতীয়দিন আর তা সম্ভব হবে না, তাই কি?' তেমনি অল্প হেসে স্নশী প্রশ্ন করতে কমলাকে, করল না। কমলার ভারি নিঃশ্বাস পতনের শব্দ আরম্ভ হয়েছে। চুপ ক'রে শুয়ে থেকে অন্ধকারে তুই চোখ মেলে স্নশীলা একবার নিশানাথ একবার নিরঞ্জন রায় একবার পপির চেহারা দেখতে লাগল। তারপর এক সময়ে টুপ ক'রে তলিয়ে গেল ঘুমে।

আরও একটি তু'টি প্রাণী জেগে আছে শহরে। জসিম গাড়োয়ান শেষবারের মত ঘোড়ার ছোলা ও জল রেখে আস্তাবলের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। সখের লোটন পায়রাটার কথা তার আবার মনে পড়েছে নিশ্চয়। এক পাশে কেরোসিনের ডিবিটা টিমটিম ক'রে জ্বলছে, আলোর চেয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বেশি। অধ্যাপক পাড়ার আটটি ঘরে ঘুমের অন্ধকার নেমেছে, বাতি জ্বলছে কেবল একজনের ঘরে। কোন এক মদন পালের জীবন বীমা ক'রে মিনতি তখন পর্যন্ত ঘরে ফেরেনি, আর সেই ফাঁকে চুরি ক'রে আলোর সামনে ব'সে বিদ্যুৎবিকাশ রুদ্ধশ্বাসে বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখে ফেলছেন। সন্ধ্যার দিকে আকাশে নতুন মেঘ দেখে অধ্যাপকের এই প্রেরণা জেগেছিল। অন্য সব দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ওদিকে চীনা ডেন্টিস্ট চিংলুফিনের ডিস্পেন্সারীতে যেন এখনো বাতি জ্বলছে। মনে হয় স্টোভে কাছিমের মাংস চাপানো হয়েছে। গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রির বাতাসে। আলোর নীচে ব'সে খোলা বুক হয়ে লুফিন গিন্নী বাচ্চাকে মাই দিচ্ছে।

আর আলো জ্বলছে মেনকা-মীনারের গায়ে ফুলের মালার মত লাল নীল বেগুনী হলদে ইলেকট্রিক বাবগুলো সেই সন্ধ্যা থেকে সমান দ্যুতি

নিয়ে একভাবে জলছে। সাড়ে এগারোটা বেজে পৌনে বারোটা হ'তে চলল। ভুব্‌ভুব্‌ শব্দ হচ্ছে সিনেমা হলের বিরাট ডায়নামোর।

তাই চেরীর মা চুপচাপ জেগে বসে আছে।

ডায়নামোর শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নীহারের বুকের ভিতর ভুব্‌ভুব্‌ করছিল।

এখনি শো ভাঙ্গবে।

শো শেষ হলে রাসুকে সঙ্গে নিয়ে চেরী চলে যাবে সোজা প্যারাডাইজে। নীহারের নির্দেশ।

রোজ রাত নটায় ভাত খেয়ে শয্যা নেওয়ার কোনো মানে হয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 'ধুমসি' হয়ে লাভ কি।

তা ছাড়াও কথা আছে একটু বেশি রাত ক'রে আজ মেয়েকে রেস্টুরেন্টে পাঠাবার।

এবং সেকথা হয়েছে নীহারের রাসুর সঙ্গে, চেরীকে সে সব খুলে বলেনি। বলার প্রয়োজনবোধ করেনি নীহার।

কাল সন্ধ্যায়ও ওরা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল। রাসু ও চেরী।

কিন্তু তখনো ও আসেনি।

'একটু বেশি রাইত কইর‍্যা সমিতির মাইয়্যাসেলেরা রেস্টুরেণ্ডে ভিড় করে ঠাকরান, একটু বেশি রাইতে আসেন নিশাবাবু। বাবু গল্পসল্প চালান তেনাদের সাথে আর এন্তার সিগারেট খান।' বলছিল রাসু।

'বটে।' নীহার চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছিল লিলির দলকে মাঝখানে উপবিষ্ট নিশানাথকে।

'তবে বেশি রাত্রেই যাবি।' রাসুকে ব'লে দিয়েছে নীহার, 'রবং আজ রাত সাড়ে নটায় শো দেখগে সিনেমায়, সিনেমা শেষ হতে সোজা চলে যা প্যারাডাইজে।'

রাস্থ খুশি হয়েছে। খুশি চোখে চেরীর মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে নীহার রাস্থর হাতে দিয়েছে।

কিন্তু রেস্টুরেণ্টে বসে কারী কাটলেট খাওয়াই তো সব নয়। ভাবছিল নীহার ইজিচেয়ারে চুপচাপ ব'সে। এখনি শো ভাঙ্গবে, এখনি ওরা যাবে প্যারাডাইজে খেতে।

ডায়নামোর শব্দ আর হৃদপিণ্ডের ঢুব্‌ঢুব্‌ শব্দ এক হয়ে বাজছিল নীহারের কানে।

এমনো হ'তে পারে, এক সময়ে ভাবল ও, রেস্টুরেণ্টে আর দ্বিতীয় মেয়েটি নেই, লিলিরা চলে গেছে, একলা একটা টেবিলে চুপচাপ বসে সিগারেট খাচ্ছে নিশানাথ, এমন সময়ে চেরী গিয়ে ঢুকেছে ভিতরে।

চেরীর গায়ের রং শাড়ি ব্লাউজের রং ও রেখাগুলো মনের চোখে আর একবার দেখে নিল নীহার।

নিজের হাতে মেয়েকে সাজিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু কেন খট্‌কা ভাঙ্গছে না। চেলিপীসের জামা না দিয়ে গোলাপী সিল্কটা দিলে ভাল হ'ত কি না ভাবল নীহার। পাঁচশো পাওয়ার বাল্ব-এর নিচে গোলাপ ফোটে ভাল কি ময়ূরপেখম রং মনে মনে ও কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না।

প্যারাডাইজের সদর অন্যদিন ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ঢুলতে ঢুলতেও এইবার চোখ মেলে অতুল স্থর বড় খদ্দেরকে হল-কামরায় থাকতে দেখে আবার নিঃশব্দে ঢুলতে লাগল। শহরের মধ্যমণি নিশানাথ।

শহর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এই চেয়ারে বসে অতুল স্থর তা টের পায়। দোকানে একজন খদ্দেরও উপস্থিত থাকলে অতুল স্থর দরজা বন্ধ করার তাগিদ মনেও স্থান দেয় না। পাকা ব্যবসায়ী।

খদ্দেরকে টেনে আনে, এই তথ্য অতুল সুরের জানা আছে।

আর যদি একান্তই নিশানাথবাবু কাউকে টানতে না পারে, সেজন্য অতুল সুরের ব্যবসার কিছু ক্ষতি হবে না। রিফ্রিজারেটরে পুরে রাখবে গভীর রাত্রের ভাজা গলদা চিংড়ি, ডিম, মাংস, আলুর চপ। পরদিন গরম করে আবার চালাবে। চপ খাওয়ার নেশায় যখন শহরকে একবার পেয়েছে, তখন টাটকা তো বটেই বাসিও বেশ চলে। চলছে।

সেগুলো কাটছে বেলা দশটার পর। স্কুলের সময়।

লুকিয়ে চুরি করে এখানে ঢুকে দুপুরের জল-খাবারের পয়সাটা চপ-কাটলেটে খরচ করছে কিছু কিছু ছেলে মেয়ে।

অর্থাৎ বিকেলে ভিড়ের মধ্যে রেস্টুরেণ্টে ঢুকতে ওদের এখনও ভয় করে। কেননা তখন বড়রা, মানে অভিভাবক অভিভাবিকারা বৈকালিক জলযোগের জন্যে এখানে আসেন। মা, বাবা, দাদা, মামা, কারোর দিদি মাসী পিসী।

তবে হবে, অতুল সুর আশা করছে, কিছুকালের মধ্যেই দাদা দিদি মাসী পিসী বাবা মা'র সঙ্গে একসঙ্গে রেস্টুরেণ্টে বসে গালগল্প করা ও চা খাওয়ার রেওয়াজ।

এখনই একটু একটু হচ্ছে।

সন্ধ্যার অল্প আগে ইংরেজীর দুই নম্বর অধ্যাপক কৃষ্ণধনবাবু এসেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান বারো বছরের পল্টু ও অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা বেবীকে নিয়ে। এসেছিলেন অধ্যাপক-গিন্নী। চার পেয়ালা কফি, চারটে পুডিং আর কিছু কাজুবাদাম সাবাড় ক'রে গেছেন।

অর্থাৎ আস্তে আস্তে ছেলেমেয়েদের এখানে খাওয়া অভ্যাস করানো হচ্ছে। আজ প্রথম দিন কৃষ্ণধন পরিবারের প্যারাডাইজে আগমন।

কাল রাত ন'টার সময় খেয়ে গেছেন বরদা উকিল। বড় দুই মেয়ে

সঙ্গে এসেছিল। ছুটির দুপুরে শশাঙ্ক মুন্সেফ শ্যালী সহ নিরিবিলি বসে চা ও হরেকরকমের খাদ্য খেয়ে গেছেন। একটা কামরায় ঘণ্টা দুই ছিলেন দু'জন। অবশ্য খেতে ব'সে কারা কি গল্প করেন অতুল স্থর সেদিকে কান দেয় না। তোমার লক্ষ্য কথা নয়, খাওয়া, কে কি খাচ্ছে, কে কি চাইছে, মশলার কৌটো টেবিলে নেই, বয়কে হুকুম ক'রে জলদি তা যথা-স্থানে পাঠিয়ে দাও, সাব-রেজিস্ট্রারবাবু জল চাইছেন, মোহিনীবাবুর স্যালাডের দরকার, তিন নম্বর টেবিলে জেলার-গিন্নী সদ্যভাজা আর একটা চিকেন-ফ্রাই চাইছেন, কমলা মাসী দলবল নিয়ে এলো, চট্‌পট্ ওদিকের চারখানা টেবিল সাফ্ করে জায়গা ক'রে দাও, কোণার খুপ্‌রিতে হীরেন উকিল পঙ্কজ উকিল মাংসের ঝোলের জন্যে চেঁচামেচি শুরু করেছে শীগগীর সেখানে ঝোল নিয়ে যা। অতুল স্থর দেখবে এই। তাছাড়া আর কিছু দেখা আর কিছু শোনা আধুনিক রেস্টুরেণ্ট মালিকের পক্ষে অনুচিত। স্কুলের মেয়ে রেবা তৃতীয় মুন্সেফের কলেজে পড়ুয়া নয়া-গোঁফ-গজানো মলয়কুমারের সঙ্গে সাত নম্বর খুপরিতে ব'সে গ্রীল অম্‌-লেটের ফাঁকে ফাঁকে প্রেমালাপ চালাচ্ছে তাতে কান দেবার যেমন ধৈর্য্য নেই তেমনি বুড়ো সাবরেজিস্ট্রার মুরারি হাজরা বাঁধানো দাঁতে হেঁসে শুক্‌নো চামড়ার ওপর সুগন্ধ রুমাল বুলিয়ে আবহাওয়া, বর্তমান ইকনমিক্ ডিপ্রেশন্ লোক্যাল পলিটিক্স, কি শহরের গার্লস স্কুল, কি টাউন হলের সংস্কার নিয়ে পার্শ্ববর্তী যোগীন ডাক্তার বা বন্ধু মোহিনী নন্দীর সঙ্গে আলাপ করেন অতুল স্থর চুপ ক'রে ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে নিজের নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসে থাকে।

অতুল স্থরের কাছে রেবা-মলয়কুমারের আলাপনও যা সাবরেজিস্ট্রার-ডাক্তারের কথোপকথনও তা-ই।

মাল কাটলেই হ'ল।

বরং ততক্ষণে একটুকরো কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে স্থর হিসাব করে কাল আবার ক'সের চিংড়ি লাগবে, খাসী কাটা হবে কি পাঠা, ক'ডজন ডিমের দরকার, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ, লঙ্কা, তেল, ঘি, আদা, গরম মশলা কি পরিমাণ বাঁচলো কতটা কিনতে হবে।

একটু আগে কাল সকালের বাজারের ফর্দ করাও সেরে ফেলেছে অতুল, ক্যাশের চাবি হাতে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে এখন ঢুলছিল। দেয়াল ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ হচ্ছে, পিছনে রান্নাঘরে চাকদের কথা কম শোনা যাচ্ছে, উনুনের শব্দ গন্ধ প্রায় মজে গেল। এগারোটা উনচল্লিশের ডাউন এক্স-প্রেস তীব্র সিটি দিয়ে মফঃস্বল শহরের ঘুমন্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের বুক চিরে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

শহরের মাটি কাঁপছিল।

নিশানাথ কান পেতে শুনছিল আরও একটা শব্দ।

মেনকা-মীনারের ডায়নামো দু'মিনিট আগে থেমেছে।

'পপি-লজে'র কুকুরের শব্দ এখান থেকে শোনা যায় না। নিশ্চয়ই কোনো উকিল মোক্তার নাজীর পেস্কারের কুকুর। আধুনিক হয়ে শহরের সবাইর কুকুরের সখ হয়েছে, কথাটা চিন্তা করতে করতে নিশানাথ আবার যখন হাত-ঘড়ি দেখতে যাবে প্যারাডাইজের চৌকাঠ পার হয়ে ভিতরে এসে ঢুকল বাংলোর মালী ইমামবক্স।

'কি খবর? কদ্দুর?'

'পাওয়া গেছে।'

যেন ছুটে এসেছে ইমামবক্স, হাঁপাচ্ছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল নিশানাথ, অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

'কোথায় রেখে এলি?'

'সিনেমা দেখে বেড়িয়েছে, রেস্টুরেন্টে আসছে খেতে, এসে প্রফুল্ল

ব'লে।' ফিস্‌ফিসে গলায় কথা ব'লে ইমামবক্স সদরের দিকে চোখ রেখে। হাত-ঘড়ি এবং অতুল সুরকে আর একবার আড়চোখে দেখল নিশানাথ।

'লায়েক মেয়ে কি বলিস?' অল্প হেসে ম্যানেজার মালীর দিকে তাকায়। 'রাত বারোটায় রেস্টুরেন্টে খাওয়ার সখ।'

ইমামবক্স চুপ।

'যাক্‌গে, তবু যে যোগাড় করতে পারলি।' অনেকটা নিজের মনে বিড়বিড়্ করে বলল নিশানাথ।

'বললে কি আর যোগাড় কা যায় না, কর্তা। হুকুম করলে দু'দিন আগেই যোগাড় ক'রে দিতুম।' ম্যানেজারের চোখে চোখে চেয়ে ইমামবক্স ঠোঁট টিপল। 'বেহুদা আপনি গাঁয়ে ছুটছিলেন, শহরে মেলা হরিণ আছে।'

'বটে।' যেন নিশানাথ একটু লজ্জিতও হ'ল। অর্থাৎ ম্যানেজার একলা চেষ্টা ক'রে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি এবং তার এই একক চেষ্টার পিছনে সাহেবকে খুশি ক'রে ষোল আনা বখশিশ আদায়ের ইচ্ছা লুকোনো ছিল, মালীর মনের ভাব এই কিনা এক সেকেণ্ডে ইমামবক্সের চোখে চোখে তাকিয়ে নিশানাথ ভাবল এবং পরক্ষণেই চেহারা স্বাভাবিক ক'রে ফেলল। 'বটে, অনেকদিন শহরে ছিলাম না, খোঁজখবর পাই কম। যাক্‌গে, কি বললে, রাজী আছে?'

'গররাজী হবে কেন।' ঘাড় ফিরিয়ে সদর দেখতে দেখতে ইমামবক্স বলল, 'শুনছি তো পাহাড়ে থাকতে মা'র বেড়াবার জায়গা ছিল সাদা চামড়া সাহেবের বাংলো, আর এ তো—'

'বাংলাদেশ, বাঙালী সাহেব, অনেক বেশি আপনার লোক।' যোগ করল নিশানাথ এবং নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে মালীর হাতে দিল। মালী খুশি হল।

'রাস্থ আরো পাঁচটা টাকা বেশি চাইছে।'

'দেব, কেন দেব না। তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলে একটার জায়গায় দুটো পাঁচ টাকার নোট নিশানাথ ইমামবক্সের হাতে গুঁজে দিল।

'আর বলছিল ও ঝুঁকিটু কি কিছু নিতে পারবে না।' ইমামবক্স নোট দুটো পকেটে পুরল। 'গরীব লোক, শেষে না কোনো বিপদে পড়ে।'

ঘাড়ে গলায় সিল্কের রুমাল বুলিয়ে নিশানাথ মাথা নাড়ল।

'কোনো ঝুকি নিতে হবে না ওর, এখানে মাল পৌছে দিয়েই খালাস। আমি গাড়ি করে বাংলোয় নিয়ে যাব, সেজন্য ভাবতে হবে না।'

'ম্যানেজারবাবুর কাজ ম্যানেজারবাবু বোঝেন ভাল।' বিড়বিড় করে বলল ইমামবক্স।

অতুল সুর তখনও ঢুলছে। মাথাটা ওর টেবিলের গায়ে এসে ঠেকেছে।

কাঁটায় কাঁটায় বারোটা, এখনো যে এলো না দেখছি।' ঘড়ি দেখলে নিশানাথ। চোখেমুখে উদ্বেগ।

'আসবে, এসে পড়ল ব'লে। আমি রিক্সায় তুলে দিয়ে এসেছি।' বলল ইমামবক্স। আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল 'প্যারাডাইজে'র দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রিক্সা।

দমকা হাওয়া দিয়েছে তখন একটা। রেস্টুরেন্টের আলোগুলো কেঁপে উঠল। একটা পাখি ডেকে উঠল দূরে কোথায়।

বস্তুত রিক্সা থেকে দু'জনকে আর নামতে হ'ল না।

তার আগেই ছুটে গিয়ে ইমামবক্স রাস্তার একপাশে বাবলার অন্ধকারে দাঁড় করানো নিরঞ্জন রায়ের ধোঁয়াটে রঙের গাড়িখানা দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ রেস্টুরেন্টের দরজায় এসেও রিক্সা ফিরে যায়। গভীর রাত্রের চপ্-কাটলেট নিধনকারিণী নিশিপদ্ম দেখা দিয়েও চলে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী

অতুল স্থরের চোখ দু'টো ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ যেন বাঘের চোখের মত দপ করে জলে উঠল। নিশ্চয়, পরশু থেকে আরম্ভ করেছে আসতে। পরশু ঠিক সন্ধ্যায় এসেছিল চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে, কাল এসেছিল রাত আটটায়। ক্রমেই একটু বেশি রাত ক'রে আসছে। স্থান রেস্টুরেণ্টের ছ' নম্বর খুপ্‌রি। আট টাকা দশ টাকা ক'রে খাচ্ছে। চাকরের সঙ্গে ব'সে গল্প করতে করতে একটি মেয়ে—দশ বারো টাকা খায় কি ক'রে; মেয়েটা বোকা কি বুদ্ধিমতী সে-সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে যায়নি অতুল স্থর। তার লক্ষ্য অন্য জিনিস।

সে দেখছিল তার মাল কাটছে কেমন। আয়।

তার ব্যবসায়ের লক্ষ্মী।

যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ খাবে।

একটা নির্দিষ্ট কামরায় ব'সে চাকর ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ব'সে খাচ্ছে তো না-ই গল্পও যে করছে না দেখে অতুল স্থরের কেমন ভাল লাগছিল দু'দিন ধ'রে। নিশ্চয়ই, পদ্ম—নিভৃত নিশিপদ্ম, মনে মনে নাম-করণ করেছে অতুল।

এ যেন একান্ত ক'রে 'প্যারাডাইজে'র রূপ।

অবশ্য রূপ দেখবে ব'লে অতুল রেস্টুরেণ্ট খোলেনি। কামরায় একবার উঁকি দিয়ে পর্যন্ত দেখেনি সে চাকরের সঙ্গে পাশাপাশি কি মুখো-মুখি ব'সে শ্রীমতী খাচ্ছে। অতুল স্থর শুধু খবর রাখত আজও আসবে, খাবে। আর সেই অনুপাতে কারী কাটলেট্ চপ্ ফ্রাই তৈরী করিয়ে রেখেছে। ছ'নম্বর কামরায় জলের গ্লাশ মশলার কৌটো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। হায়,—তিন রাত্রি পার হল না। আসতে না আসতে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে নিশানাথ। এ জন্যেই কি এতক্ষণ ও এখানে ওৎ পেতে বসেছিল, সেই সন্ধ্যা থেকে।

বলতে ভুল হয়ে গেছে, নিশানাথ অতুল সুরের ক্লাশমেট্,—এই শহরের এক স্কুলে ছোটবেলায় দুজন একসঙ্গে পড়েছে। অতুল এসেছে ব্যবসার লাইনে নিশানাথ গেছে চাকৃরির লাইনে। কে ভাল করেছে কে মন্দ করেছে সে-বিচার আজ অতুল সুর করছে না, কি সিল্কের পাঞ্জাবী চড়িয়ে সোনার ঘড়ি এঁটে নিশানাথ নিরঞ্জন রায়ের ব্যাঙ্ক আগ্‌লাচ্ছে আর ফতুয়া গায়ে তুলসীমালা গলায় কপালে তিলক-কাটা অতুল আগ্‌লাচ্ছে নিজের আম কাঠের ছোট্ট ক্যাশবাক্স। যার যে পথ, যার যা কর্ম। কিন্তু অতুল সুর চোখের ওপর দেখল, চিরটা কাল নিশানাথ যা ক'রে এসেছে আজ আবার তাই করল। এতবড় ম্যানেজারের স্বভাবের পরিবর্তন নেই। কিন্তু কি স্পর্ধা ওর অতুলের দোকানের দরজা থেকে খদ্দের ছিনিয়ে নেবে।

নিশানাথের পিছু পিছু খড়ম পায়ে চাবি হাতে অতুল রেস্ট্‌রেণ্টের চৌকাঠ পার হয়ে বাব্‌লার অন্ধকারে স্টুডিবেকারের দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করল। 'কাজটা ভাল হচ্ছে না, আমার ব্যবসার ক্ষতি ক'রে ওরকম করাটা কোনো কাজের কথা নয়, নিশানাথ।' অতুল চেঁচিয়ে উঠল।

'তুই না ঘুমোচ্ছিলি।' ধরা পড়ে গিয়ে নিশানাথ স্বীকারোক্তি করল। হা-হা হাসল।

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলাম তোর কীর্তি।'

'তুই তো ওমনি ঢের কামাচ্ছিস চপ্‌ কাট্‌লেটের ব্যবসা ক'রে।'

'তুই খারাপ আছিস কি। বউ ব্যাঙ্ক দু'টোই তো সমানে হাতাচ্ছিস ভদ্রলোকের শুনছি। আমার ইয়ে ভাগিয়ে তোর কি লাভটা শুনি। আজ সন্ধ্যা থেকে রেস্ট্‌রেণ্টে বগার মত ঠুক ধ'রে বসে ছিলি এজন্যেই রাস্কেল।' রাগ করে অতুল সুর বলল।

'এই ছাখো।' নিশানাথ টেনে টেনে হাসে। 'রাত দুপুরে রাস্তায়

ওপর ছেলেমানুষের মত কেমন চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিয়েছে, ছাখো।' নিশানাথ অতুল্ সুরের ঘাড়ের ওপর হাত রাখল। 'আগে শোন, তারপর হল্লা করবি, এই নে সিগারেট খা।' নিশানাথ নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে সিগারেট তুলে দিল অতুলের হাতে।

'না না।' সিগারেট মুখে গুঁজে মাথা নেড়ে অতুল সুর না না করতে লাগল। 'আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে। আগে খেয়ে যাক্, তারপর যত খুশি তুমি নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করো পার্কে ময়দানে কি ইস্কুল ঘরের বারান্দায়।' অর্থাৎ স্কুল-জীবনের, প্রায় কৈশোরের অপকীর্তি-গুলোর কথাও স্মরণ করিয়ে দিল অতুল নিশানাথকে। 'আমি বাবা সংসারী লোক, ব্যবসার ক্ষতি সইতে পারি না। ছেড়ে দাও।' রাগ তো বটেই লোলুপ দৃষ্টিতে অতুল অন্ধকার গাড়িটার দিকেও একবার তাকালো। ধূসর শাদা একটা জন্তু যেন চুপচাপ ব'সে আছে গাড়ির মধ্যে। অতুলের হঠাৎ কেমন হাসি পেল।

সেই ফাঁকে নিশানাথ অতুলের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে কথা বলল। আর অমনি অতুল ফক্ ক'রে হেসে ফেলল। 'তাই বল্, সেকথা বলছিস না কেন, রাস্কেল।'

'বলার ফুরসৎ দিলি কোথায় স্টুপিড।' অতুলের কান থেকে মুখ তুলে নিশানাথ কৃত্রিম রাগ দেখাল। 'তার আগেই যে তুই রাগারাগি শুরু করলি।'

'বেড়ে নাম দিয়েছে, সূর্যমুখীর ঝাড়।' অতুল এতক্ষণ পর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। 'তা তুই আমায় বললে পারতিস, এত খুঁজতে হ'ত না।'

'যাক্‌গে, এই দিয়ে তো আজ বউনি হোক।' প্রায় শোনা গেল না এমনভাবে নিশানাথ বিড়বিড় ক'রে উঠল।

'না, বলছিলাম রোজই দুপুরে একটি দুটি আসে দোকানে। চেষ্টা করলে—'

'থাক, কাল দিনের বেলায় তোর সঙ্গে কথা হবে, আজ আমায় ছেড়ে দে।' নিশানাথ অনুনয়ের সুরে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইল। 'আমায় দিয়ে সন্দেহ করছিলি, ভাবছিলি আমি বুঝি, পাগল, সেই সময় আছে না মন।'

'একেবারে আইডিনের মত ক'রে ফেলেছিস মনটাকে, আলকাতরা।' অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু বোঝা গেল দাঁত বার ক'রে অতুল সুর হাসছে।

'তুই কি, তুইও যে কসাই হয়ে গেছিস, সূর্যমুখীর ঝাড়ের মাঝখানে বসেও কোনোদিকে চোখ ফেরাচ্ছিস না, ক্যাশের চাবিটা হাতে রেখে উবু হয়ে কেবল চেয়ারে বসে থাকিস।'

'পয়সা, পয়সা হাতে না থাকলে দুনিয়ার বেবাক পান্‌সা, নিশানাথ।' অতুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তবে আর কি, নে, ছেড়ে দে এবার যাই।'

'কিন্তু কাল এসো, ঠিক তোমার আশায় দোকানে ব'সে থাকব। পার্সেন্টেজ ঠিক ক'রে ফেলো, আমি সাপ্লাই দেব হরিণ, পাখি।'

'কেন, পচা ডিমের বড়া চিংড়ি ভাজা লোককে খাইয়ে তো নিজের দিব্যি চেহারা গোলগাল ক'রে ফেলেছিস। নিশানাথ বন্ধুর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল।

'আর তুই একা একা মনিবকে হরিণ খাইয়ে বাড়ি গাড়ি করবি, আমরা কিছুই পাব না।' অতুল আবার নিশানাথকে জোরে চেপে ধরতে চেষ্টা করল। 'কথা দে—'

'এই ভাখো, বললাম তো কাল আসব।'

বেশ একটু রুষ্ট হয়ে নিশানাথ এক পা সরে গেল। 'ঠিক কাল আসব, সিগারেট খাবি আর?'

'না।' অতুল গাড়ির দিকে চেয়ে রইল। গাছের পাতার সরসর শব্দ হ'ল। গাড়িটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

কাছাকাছি, বাবলার অন্ধকার থেকে একটু দূরে মিউনিসিপ্যালিটির জলের পাইপের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখছিল ফ্যালনা। মশার কামড়ে তার পা ফুলে গেছে।

বাবুদের নিচু গলার কথা তার কানে এল না। কেবল দেখল রিক্সা থেকে চেরীকে নামিয়ে রাস্থ বাংলোর নতুন গাড়িতে তুলে দিয়েছে। তারপর ইমামবক্সের হাত ধরে গাড়ির কাছ থেকে সরে এসেছে।

বাবুদের কথা কানে না এলেও দুই দোস্তর কথা ফ্যালনা পরিষ্কার শুনল, বুঝল।

'মন খারাপ করলিনি তুই?'

'মন খারাপের আছে কি, নগদ যহন মিলল।'

'ডর আছিল্ তোর বাবু পাছে ঠগায়।' ইমামবক্স থুক্ ক'রে কাসল কি হাসল অন্ধকারে বোঝা গেল না।

'নোটগুলোন তুমি দেইখ্যা আন্‌ছ দোস্ত?' রাস্থর গলা।

'ম্যানেজারবাবুর কাম গবরমেণ্টের মতন, বুঝলি, জালিবালি নাই। ইমামবক্স মোটা গলায় কথা বলল, 'সাহেবের নোট, কলের সিন্ধুকের টাকা।'

রাস্থ চুপ।

'অত নরম চিজ আম্‌রার পোষায় না।' ইমামবক্স থুক্ থুক্ ক'রে কাসল।

'পোষায় না আমি নি জানি না দোস্ত।' যেন একটু ভেবে রাম্ব বলল, শেষ অবধি উভ়াল দিতে জানতাম। তাই কই নগদ দামের মতন সুখ এমুন কিছু নাই।'

'তবে?' বাংলোর মালীর ভারিক্কি গলা। আম্‌রার বুদ্ধিশলা নিবি। যিডা রাখতি পারবি না হিডায় হাত বাড়াইবি না।'

'পালিশ পালিশের কাছে যায়।' থুক্ থুক্ ক'রে এবার রাম্ব হাসল। 'এক কথায় কেমুন গাড়িতে গিয়া উঠল।'

'উঠুক, মরুক।' ইমামবক্স বোঝায়। 'আমাগো কি।'

'না কই বিকাল অবধি শহরের সড়ক চিন্‌ছিল না, চিন্‌ছিল না কোন্‌ডা পোস্টাপিস, কোন্‌ডা হাসপাতাল, আদালত তেজারী'

'একবারে হাইকোর্ট চিন্‌ছে এখন।' অল্প হেসে ইমামবক্স ঠাট্টা করল। 'বাবুগো মাইয়্যারা এক সইন্ধ্যায় বিলাত চিনে, বুঝলি।'

রাম্ব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ রাম্বই যে আস্তে আস্তে সব চিনিয়ে আনছিল চেরীকে যেন ইমামবক্সকে এখন আর তা বলতে পারল না। ব'লে লাভ কি।

'ডেরায় ফিরবি নাকি?' মোড়ে এসে ইমামবক্স ঘুরে দাঁড়ায়।

'ক্যান্?' রাম্ব হঠাৎ গলা বড় করল। 'একডা বাঙলা বোতল আর চপলের ঘরে এক রাইত কাটানের খরচা যখন দিছ ডেরায় যামু ক্যান্।' হি হি হাসল রাম্ব। ভারি খুশি গলা।

'বাজারে চললি?'

'হুঁ।'

রাম্ব খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাজারের দিকে হাঁটে। ইমামবক্স মোড়

থেকে ফিরে যায়। এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের পিছু পিছু এসে ফ্যাল্‌না হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তুর পিছু পিছু বাজারে তো আর সে যাবে না। নাকি ডেরায় ফিরবে।

যেন কিছু ঠিক করতে না পেরে ফ্যাল্‌না রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ভাবে। একটু দূরে আলোর থাম। বাঁধানো সড়কের ওপর বুটের আওয়াজ শুনে ফ্যাল্‌না ঘাড় ফেরায়। ডাক্তার। যোগীন ডাক্তার মফঃস্বল থেকে ফিরছে।

টস্‌ টস্‌ করে জল ঝরছে ডাক্তারের টুপী থেকে চশমার ফ্রেম বেয়ে।

এখানে শহরে সন্ধ্যাসন্ধ্যি যে মিহি পশলাটুকু হয়ে গেল গাঁয়ে সেটা নেমেছিল মুষলধারে। সমস্ত বিকেল ধরে বৃষ্টি ছিল। সন্ধ্যায়। রাত্রেও নৌকোয় করে ফেরবার সময় নদীতে বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টি আর ঝড়। 'নৌকো প্রায় উল্‌টে গিছল।' হেসে অটলবাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ডাক্তার টুপিটা মাথা থেকে নামাল, পরে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যেন র‍্যাক্‌ খুঁজল ডাক্তার হাঠাৎ, তারপর টুপিটা চেয়ারের মাথায় রেখে দিয়ে হুট করে বসে পড়ল।

অটলবাবু গাঢ় একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। ডাক্তারের সামনে, টেবিলের ওপর রক্ষিত ওষুধ ইঞ্জেকশনের বাক্স, স্টেথস্কোপ, ব্যাগ।' একবার সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে অটলবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এই মাত্র ফিরলে ?'

ডাক্তার মাথা নাড়ল। কালো ঠুলিটা চোখ থেকে সরিয়ে খাকি রঙের একটা রুমাল দিয়ে থুঁতনি ও গলার পিছনের জলের ফোঁটাগুলো

মুছতে লাগল। পটাশের জলে ভেজা ক্লোরিনের গন্ধে ভুরভুরে রুমাল।

'উঃ সেই তুলনায়, মানে আমি গাঁয়ের কথা বলছি অটলবাবু, বিশ্বাস করা যায় না দুরবস্থা। একটা টিউবওয়েল সারাদিন সাতটা গাঁ ঘুরেও আবিষ্কার করতে পারলাম না। অবশ্য এবার আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিজে দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। দেখা যাক কদ্দুর কি হয়। কলেরা-ক্রনিক হয়ে গেছে গাঁগুলো।'

অতুলবাবু চুপ ক'রে শুনলেন। 'না আমাদের শহরগুলো দেখে দিন দিন যত আশা বাড়ছে আনন্দ হচ্ছে বাঙলার এক একটা গ্রামের দিকে তাকালে ভয়ে বুকের ভিতর হিম হয়ে যায়।'

'আমাদের শহর সম্পর্কেও আমি খুব আশান্বিত হতে পারছি না, ডাক্তার।'

অতুলবাবু থুঁতনি তুললেন।

'কি রকম?'

'তোমাদের আধুনিক শহর।' বললেন শুধু অটলবাবু। তারপর চুপ করে গেলেন।

আবার সেই। Melancholy. পেসিমিস্ট, ভয়ঙ্করভাবে লোকের মনকে ভাবিয়ে তোলার গুরু অটল দত্ত।

বিরক্ত হয়ে ডাক্তার উল্টো দিকের বেড়ার দিকে তাকাল।

যোগীন ডাক্তারের একবার বলতে ইচ্ছে হল, নিশ্চয়ই আশান্বিত গর্বিত আমরা অন্তত আমাদের ছোট শহরটুকু নিয়েও। এখন রাত বারোটা। আপনি নিশ্চিতমনে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে ফুরফুরে নিমের হাওয়া খাচ্ছেন। ঘরের দরজাগুলো এখন পর্যন্ত খোলা। আপনি চেয়ারে বসে টুপ করে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তেও পারেন। তার জন্যে তিলমাত্র

দুশ্চিন্তা নেই। কেননা, আপনি জানেন, শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্যে রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে একজন করে পুলিশ মোতায়েন আছে, আপনার ঘরবাড়ি আগলাচ্ছে। প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তায় রাতভর মিউনিসিপ্যালিটির বাতি জলছে। বলতে কি, হঠাৎ এই রাত্রে যদি আপনার গ্যাসট্রিকের পেইন ওঠে ম্যাগনেশিয়ামের ফাইল ঘরে না থাকলেও চাকরকে পাঠিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে শহরের যে কোন ডিস্পেন্সারী থেকে তা আনিয়ে নিতে পারেন। কাছারীর ওধারে বাঁধানো স্ট্যাণ্ডে রিক্সা, একা চুপচাপ অপেক্ষা করছে, গাড়োয়ানরা জেগে আছে, দরকার মত ইচ্ছা হলে আপনি এই মুহূর্তে যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ি বেড়িয়ে আসতে পারেন, অবশ্য গভীর রাত বলে ভদ্রলোক বা আপনি নিজে যদি কোন সঙ্কোচবোধ না করেন। কিন্তু যাতায়াতের কষ্ট হবে না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আশানুযায়ী আত্মীয়-বন্ধুর চিঠিটি, পার্শেলটি আপনার হাতে আসছে, শহরবাসীর সুবিধার জন্য এখানে বেশ একটি বড় ডাকঘর খোলা হয়েছে।

যোগীনবাবুর বলতে ইচ্ছা হল, সাত গাঁয়ের চিঠি একটা হলদে বস্তায় পুরে বেলা সোওয়া ন'টায় হলধর হরকরা ঘুঙুর বাজিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হয়। সময়ের ঠিক থাকে না।

এখানে মিউনিসিপ্যালিটির রিজার্ভে এই রাত দুপুরেই পাম্প করে জল তোলা হচ্ছে কাল ভোরে উঠে আপনারা খাবেন বলে। আপনারা কত সুখী।

ঠিক কোন্ কথাটি বললে অটলবাবু খুশি হবেন, যোগীন ডাক্তার ভেবে পেল না।

'দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ, চুরি-ডাকাতি, দুর্ভিক্ষ, বছরে দুবার করে ধূসর আকাশ বেয়ে নেমে-আসা লাল পাখাধারী লোলচর্ম অগ্নিচক্ষু রাশি রাশি শ্মশান-শকুন—গাঁয়ের চেহারা আপনি ভুলে যাচ্ছেন অটলবাবু। এক

দুপুরে দশটা এম্পলের বাক্স শেষ করে আমি কুলিয়ে ওঠতে পারিনি, শেষটায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।' আধুনিক শহর বলে ঠাট্টা করাতে যোগীন ডাক্তার রীতিমত সেন্টিমেণ্ট্যাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চুপ করে রইল।

'আমি ক্রমশ বেশি হতাশ হয়ে পড়ছি।' অটলবাবুর গাঢ়স্বর শোনা গেল।

'এই মর্বিডিটি—' ধমক দিতে গিয়ে ডাক্তার হঠাৎ থেমে যায়। বুঝতে পারল, অটলবাবুর আজ আরো বেশি ম্রিয়মান হয়ে পড়ার কারণ। মনে মনে ডাক্তার হাসল।

পরশু বিকেলে আবার একটা বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছেন অটল দত্ত শহরের অন্য প্রবীণদের কাছে। হেড মিস্ট্রেস মিস অরুণা সেনকে চাকরিতে বহাল রাখা না রাখার মিটিংএ। অটলবাবু হেড মিস্ট্রেসের রক্ষণশীল আচরণ সাপোর্ট করতে গিছলেন, মোহিনী নন্দীর হুংকারে আরেকদিনের মত, হয়ত আরও অনেক দিনের মত অটলবাবুর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। 'কনজারভেটিভ, ব্যাকডেটেড, ইউ ওল্ড ফুল।' মোহিনীবাবু প্রায় বলে ফেলেছিলেন।

সত্যি অটলবাবু যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছেন না, পারেন না।

যোগীন ডাক্তারের কেমন অনুকম্পা হয় ভদ্রলোকের নিরাশাব্যঞ্জক স্তিমিত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে। হেসে ডাক্তার মেরুদাঁড়া সোজা করে বসল। 'আমারও কম দুঃখ হয়নি মিস সেনের জন্যে, কিন্তু কি করব, helpless মুরারিবাবু, আমি, নাজীর, উমাকান্তবাবু—সবাই মিলে অনেক দিন বুঝিয়েছি মিস সেনকে। জেনারেশনকে আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন মিস সেন, বলেছি, দায়িত্বসম্পন্না নাগরিকা আপনি, এখানকার

উইমেনস্ এসোসিয়েশনকে অবহেলা করতে পারেন না, পারা উচিতও নয়।'

'উচিত হত না যদি-না এসোসিয়েশনের দশটি মেয়ে একটা চায়ের দোকানে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে একটি ছেলের সঙ্গে আড্ডা দিত।'

'কে সেই ছেলে?' একটা আধ-ভেজা বার্মা চুরুট পকেট থেকে বার করতে করতে যোগীন ডাক্তার হাসল, 'ফ্রি মিক্সিং তো ভালই, এ নিয়ে মন খুঁৎ খুঁৎ করলে চলবে কেন, আপনি—'

যোগীন ডাক্তারের কথা মাঝখানে থেমে গেল, অটলবাবু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ছেন। 'ফ্রি মিক্সিং আমি ভালবাসি, ডাক্তার, যদি, যদি-না সেখানে আমার ছেলে নিশানাথ না হয়ে আর কেউ হত।'

'তাই বলুন।' ডাক্তার এবার শব্দ করে হেসে উঠল। অর্থাৎ অটলবাবু সমস্ত হতাশা, ভয়, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও কল্পিত অশান্তি শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত করেন নিজের সন্তানের ওপর। কেননা, নিশানাথ এই শহরে প্রেজেন্ট জেনারেশনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। দৃপ্ত-স্বাস্থ্য, কর্মঠ, বুদ্ধিমান নতুন দিনের প্রগতিপরায়ণ পরিচ্ছন্ন এক তরুণ—যোগীন ডাক্তার ভেবে শেষ করার আগে অটলবাবু উল্টো দিকের বেড়ার গায়ে চোখ রেখে বিড় বিড় করে বললেন, 'কী ভয়ঙ্কর অপরিচ্ছন্ন ওর মন যদি তুমি জানতে ডাক্তার—'

'থার্ড ক্লাসে পড়ার সময় চুরি করে নিশানাথ সিগারেট টেনেছিল, কোন্ প্রতিবেশী ভদ্রলোকের গায়ে কিশোর ধুলো ছিটিয়ে দিয়েছিল, বিয়ে ক্লাসে পড়তে একটু লভ টবে জড়িয়ে পড়েছিল—'যোগীন ডাক্তার হাসতে লাগল, 'এই নিয়ে যদি রাতদিন আপনি মাথা ঘামান, ভেবে মরেন তো.........'

'এই নয়, ডাক্তার, শুধু এর জন্যে কোন সন্তানের পিতা মন খারাপ করে কি।'

অটলবাবু ডাক্তারের দিকে সোজাসুজি তাকান।

'তবে কি, কি এমন আপনাকে নিরাশ করে দেওয়ার মতন কাজ করলে নিশানাথ, আমি তো ভেবে পাচ্ছি না।'

বাঁ হাতে চুরুটটা ধরে রেখে ডাক্তার ডান হাতে পেণ্টুলনের পকেট খুঁজল দেশলাইয়ের জন্যে। ঘরের বেড়ার গায়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। এক ঝলক হাওয়া ভিতরে ঢুকে অটলবাবুর কাঁচ ভাঙা আলমারির তাকে রক্ষিত ধূলোভরা পুরোনো রেভিনিউ কাগজগুলো নেড়ে চেড়ে দিলে, সরসর শব্দ হল একটা।

'আমি ভাবছিলাম, কদিন ধরে গিন্নী বলছিল, মেয়ে বড় হয়েছে, তাছাড়া আপনারও তো উচিত ছেলেকে......', দেশলাইয়ের জন্যে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে যোগীন ডাক্তার অটলবাবুর সঙ্গে যেন মনে মনে কথা বলছিল, প্রায় মুখ দিয়ে বার করে ফেলেছিল প্রস্তাবটা।

অটলবাবু দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ করে আছেন। যেন লজ্জা ও গ্লানির পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ তাঁকে ঘিরে ফেলছে, আত্মরক্ষা করতে পারছেন না কোনমতে।

'পাপ নির্মূল না করা পর্যন্ত অন্ধকারে শিকড় চালিয়ে যায়, তুমি কি জান না, ডাক্তার?' হঠাৎ অটলবাবু কথা কয়ে উঠলেন, 'কি রকম?' বেশ একটু চমকে যোগীন ডাক্তার ঢোক গিলল। অটলবাবুর গলার স্বরে লজ্জা ও দুঃখ ছাড়াও অন্যরকম একটা সুর ছিল। হাত দুটো মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে স্থিরভাবে এক সময় চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি বসো ডাক্তার, শহরের প্রভাবশালী, প্রতিভাবান আধুনিকতায় পূর্ণবিশ্বাসী গণ্যমান্য অন্তত একজন প্রবীণ নাগরিককেও যদি আমি এ না দেখাতে পারি, তোমাকে তো দেখাতে পারব।' অটলবাবু উঠে যেতে যেতে বললেন, 'মোহিনীর দলকে আমি দেখাব না,

কেননা, আমার কীর্তিমান পুত্রের কথা তাদের অজানা নেই, কিন্তু একচক্ষু হরিণ হয়ে এ শহরের বাপেরা মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েরা যখন প্রগতির পূজায় মেতে গেছে. তাদের তাই করতে দাও।' এক রকম টলতে টলতে অটলবাবু, সম্ভবত নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং তখনি বেরিয়ে এলেন একটুকরো কাগজ হাতে করে।

চুপ করে অপেক্ষা করছিল যোগীন ডাক্তার। নিশানাথ এমন কি দুষ্কর্ম করেছে, অতীতে এমন কি কীর্তি সে রেখে এলো যে—

না, লিলি সংক্রান্ত ঘটনা ডাক্তার জানে না, অটলবাবুও বলেন নি। আজ তিনি বলবেন, বলবার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। অবশ্য চার বছর আগের ইতিহাস উদঘাটন আর নয় এখানে, আজ দুপুরে যা ঘটলো যোগীন তাই জেনে রাখুক।

ত্রস্ত কম্পিত আঙুলে অটলবাবু চিঠিটা আলোর সামনে মেলে দিয়ে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিলেন।

আদ্যোপান্ত দুবার চিঠিটা পড়ল ডাক্তার।

তারপর অটলবাবু মুখের দিকে তাকাল।

'কে দিলে এই চিঠি আপনাকে? এ যে হেড মিস্ট্রেসের কাছে লেখা।'

'হুঁ,' অটলবাবু মাথা নাড়লেন। আমি নিশানাথের বাপ, আমার কাছে এই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া অরুণা আর কি করতে পারত, বলো। এমনিতে দুই মেয়ের পিকনিকে যাওয়া নিয়ে মোহিনী ওরা সবাই মিলে ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে।'

ডাক্তার আর একবার চিঠির ওপর চোখ বুলোলো।

'ঠিক শহরে নয়, শহরের ধারে কাছে এসে ঘর বেঁধেছিল পুলিন ব্রহ্ম।' অটলবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'বেচারা অন্ধ হয়ে গেছে। চাকরি করত

কোথাও। চোখ গিয়ে চাকরিটা হারায়। বলে-কয়ে পুলিন তবু যাহোক একটা কাজ যোগাড় করতে পেরেছিল ওর ছেলের জন্যে নিশানাথের ব্যাঙ্কে, আমি জানতাম না, আজ শুনলাম। সতেরো বছরের ছেলে ম্যাট্রিকটাও পাশ করেনি, কি চাকরি করবে, কত বা মাইনে পায়, তবু ব্রহ্মের আশা একদিন সংসারটা দাঁড়াবে। মেয়েটাকে পড়াচ্ছিল অরুণার স্কুলে। যদি-বা পরে একটা মাস্টারি-টাস্টারি জোটাতে পারে। প্রকাণ্ড পরিবারের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্রহ্ম কি ভয়ঙ্কর বিব্রত হয়ে পড়েছে ডাক্তার, অনুমান করতে পার, আর তার সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে·····'

অটলবাবু থামলেন।

যোগীন ডাক্তার গম্ভীর। বারোটা বেজে গেছে ঘড়িতে। কিন্তু প্রসঙ্গ শেষ না হওয়া অবধি ওঠে কি করে। 'যেহেতু সে গরীব, টাকার দরকার, দুদিন গাড়ি নিয়ে গেছে নিশানাথ ব্রহ্মের বাড়িতে, একবার, শুধু একদিন সন্ধ্যাসন্ধি শান্তিকে অর্থাৎ পুলিনের মেয়েকে সে রায়ের বাংলোয় বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়—জানি না, হয়তো এই শহরের উগ্র আধুনিকতার ঝাঁজ পুলিনের আজও নাক-সয়া হয়নি, আপত্তি করেছিল, নিশানাথ শাসিয়ে এসেছে, তার ছেলে হীরালালের চাকরি যাবে।

ডাক্তার চুপ।

'শহরের প্রায় সব মেয়েই রায়ের বাংলোয় বেড়াতে যায়, শান্তির না যাওয়ার অর্থ হয় না, আর ম্যানেজার স্বয়ং গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে। হীরালাল ব্যাঙ্কে কাজ করছে বলেই তো এই যোগাযোগ ; না হলে মিসেস রায় ছাড়া নিরঞ্জন রায়ের হাওয়া গাড়িতে ওঠার সুযোগ এই শহরের দ্বিতীয় একটি প্রাণীর হয়েছে নাকি। মেয়েকে যদি পুলিন বাংলোয় না পাঠায় ছেলের চাকরি তো সে রাখতে পারবেই না, স্কুলে শান্তিরও নাম কাটা যাবে ; কেন না যে শহরের যে হাওয়া, যে জায়গার যে রীতি, নিরঞ্জন

রায় এই শহরের নারীকল্যাণ সমিতি ও মেয়ে-স্কুলের জন্যে অকাতরে টাকা ঢালছেন। সুতরাং,—একটু থেমে অটলবাবু বললেন, 'তাই অন্ধ পুলিন ব্রহ্ম চিঠি দিয়েছিল হেড্ মিস্ট্রেসের কাছে, জানতে চেয়েছে, মেয়ের লেখাপড়ার সঙ্গে সশরীরে রায়ের বাংলোয় যাওয়ার কি সম্পর্ক আছে। ব্রহ্ম ঠিক বুঝতে পারছে না। অরুণার তো আর কিছু করবার নেই, তাই পাঠিয়ে দিয়েছে চিঠি আমার কাছে, পুলিনের ছেলেটিই চিঠি নিয়ে এসেছিল।'

অটলবাবু চুপ করলেন।

যোগীন ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবছিল।

'এই তোমার আধুনিক শহরের রূপ, আর নিপুণ শিল্পীর মত আমার কীর্তিমান পুত্র তার ওপর তুলি বুলোচ্ছে, সে যে কত বড় স্কাউন্‌ড্রেল তুমি জান না ডাক্তার।' স্থির ধীর বিমর্ষ, চিরকালের মুহ্যমান অটল দত্ত উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছিলেন। 'চিঠির ভাষা ছাড়াও কিশোর হীরালাল মুখে আমার কাছে আরো যা ব'লে গেল, তা আমি বলতে চাই না, ডাক্তার যাও বাড়ী যাও, রাত হয়েছে, তোমার খাওয়া দাওয়া হয় নি।' অটলবাবু চুপ ক'রে গেলেন। শোনার আর ইচ্ছাও ছিল না ডাক্তারের।

অন্যদিন শিস দিয়ে লাফিয়ে যোগীন ডাক্তার অটলবাবুর বৈঠকখানা বারান্দা পার হ'য়ে রাস্তায় নামত, আজ আর সেটি হ'ল না। ক্লান্ত ধীর পদক্ষেপ।

বেশ বয়েস হয়েছে ডাক্তারের।

নিশানাথের মতন একটি যুবককে পুত্রবৎ স্নেহ করার বয়েস এটা তার।

তাই অটলবাবুর ঘৃণা ডাক্তারের মনেও এসে লাগল। ভয়ঙ্কর ছোট হয়ে গেল নিশানাথ তার চোখে এখন।

সভ্যতার এই রূপের সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয় ছিল না।

'শিক্ষিত সভ্য তরুণ তুমি।'

ডাক্তার মনে মনে বলল, 'তোমার এই রাস্তা কেন, বড় হবার টাকা উপার্জনের।' ডাক্তার বুঝল কেন অটল দত্ত এত মর্মাহত। এবং নিশানাথের গায়ের দামী সিল্ক, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম, দাঁত, আঙটি ও অন্য বিষয় সম্পত্তিগুলো পিতার চোখে অহরহ কেন কাঁটার মত ফুটছিল।

শিউরে উঠল ডাক্তার নিজেও। নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে কথা বলতে লাগল।

কি শোচনীয় অধঃপতন।

আর কী স্পীড্ পাপের।

বুইক্ পন্টিয়াকের চাকার চেয়েও দ্রুতগামী, দুঃস্বপ্নের নেশা নিয়ে ছুটে চলেছে, অনিবার্য ধ্বংস সামনে জেনেও হাসছে, সভ্যতার এই সরীসৃপ-রূপ নিশানাথের মধ্যে এমন প্রকট ডাক্তারের আগে চোখে পড়েনি। এখন সবটা একসঙ্গে ফুটে উঠল। চক্‌চকে পালিশ জুতো, স্ট্রীমলাইণ্ড গাড়ি, শোভন বেশভূষায় মার্জিত হাসি, আর মসৃণ চলাচলের আড়ালে ও লুকিয়ে আছে।

ডাক্তারের রাগ হ'ল, দুঃখ হ'ল অনুকম্পা হ'ল শেষ পর্যন্ত। হাঁটতে হাঁটতে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলল অটলবাবুর মন্দ ভাগ্যের কথা ভেবে। আকাশে দপ্ দপ্ তারা জ্বলছিল তখন, নিচে রাস্তায় জ্বলছিল মিউনিসিপ্যালিটির বাতি। শয়তান—ধূর্ত শেয়ালের মত নিশানাথ এসব করে বেড়াচ্ছে শহরের বুকে, নিজের মনে বিড় বিড় ক'রে বলল ডাক্তার, নির্জন শহরের বুকে একলা পাইচারী করতে করতে।

কিন্তু ডাক্তার তো আর অটলবাবু নন, যে ভেঙে পড়বেন, পর্বত

প্রমাণ তুরাশা বুকে নিয়ে অসহায় শিশুর মতন চেয়ে দেখবেন মারাত্মক ব্যাক্টেরিয়া সমাজ দেহের ফুসফুস কুক্‌ড়ে কুক্‌ড়ে খাচ্ছে।

ডাক্তার আশাবাদী।

ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস ক'রে দেহকে সুস্থ সুন্দর করতে হয় কি ক'রে তা তার জানা আছে। কেন জানি সেই রাত্রে তু'বার পেন্টুলনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ডাক্তারের নাকি মনে হয়েছিল বাগান ছেড়ে এসেছে পর পাঁচ বছরের মধ্যেও একদিন সে ভালরকমের কোনও শিকারটিকারে রিভলবারটা ব্যবহার করতে পারল না, এক নিজের ডিসপেন্সারীর সামনের বাদামগাছের তু'টো একটা নিরীহ ভীরু বাতুড় মারা ছাড়া। কথাগুলো জানা গিছল ডাক্তারের ডাইং ডিক্লারেশন থেকে।

* * *

পরদিন ভোরবেলা শহরের হাসপাতালে ডাক্তারের অন্তিমকালীন ষ্টেটমেণ্ট নেয়া হয়। আগের দিন রাত পৌনে বারোটায় অটলবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরোবার পরই নাকি ডাক্তারের কেমন হাত নিস্‌পিস্‌ করছিল। এটা তার নির্ভীক স্বীকারোক্তি। ডাক্তার জানত না গাড়িতে তার মেয়ে ছিল, চেরী।

লাশকাটা ঘরের কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তার অপেক্ষা করছিল, লক্ষ্য করছিল তুষ্ট তার বিলাসী মাতাল মনিবের মনস্তুষ্টির অছিলায় নিজের অভিষ্টসিদ্ধির জন্যে সত্যি কতটা তুষ্কর্ম করতে পারে।

না, গেটে ঢুকবার আগেই গাড়িটা যখন একটা লাইটপোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে যায় এবং ভিতর থেকে প্রথমে চেরী ও পরে নিশানাথকে নামতে দেখা যায় তখন পর্যন্ত ডাক্তারের মেজাজ ঠাণ্ডা ছিল।

খুন চেপে যায় স্কাউণ্ড্রেলটার কথা শুনে।

'তবে না শুনছিলাম তোমার বাংলো।' নীচু গলায় বলছিল চেরী।

'আরে পাগল।' খুক্ খুক্ গলায় হাসছিল নিশানাথ। 'পাহাড়ে বড় হয়ে শরীরটাই যা একটু ফুলেটুলে নাদুসনুদুস হয়েছে তোমার, মাথায় কিছু নেই। নিরঞ্জন রায়ের নাম শোননি? তাঁরই বাংলো এটা। তুমি বুঝি বাড়ি থেকে একদম বেরোও না?'

নিশানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে চেরী আস্তে আস্তে মাথা নাড়ছিল।

'তুমি কে?' প্রশ্ন করছিল ও দুবার।

'আমি তাঁর কর্মচারী, বেতনভুক ম্যানেজার, এসো আর দেরী না।' হাত ধরে টানছিল নিশানাথ চেরীর। 'ঐ গেট্ খোলা হয়েছে,—পা চালাও, রাজপুরীর দরজায় এসে এখন তুমি থামতে শুরু করে দিলে দেখছি • ...'

ডাক্তার আগে গুলী করে নিশানাথকে, তারপর খুন করে নিজের সন্তানকে, হ্যাঁ, তার মেয়ে বোকা ছিল, এই শহরের আর দশটি মেয়ের মতন মাজাঘসা বুদ্ধি ছিল না ওর, দু'টোকে সাবাড় ক'রে ডাক্তার অ্যাটেম্পট্ ক'রে নিজের ওপর......

সেইদিনই বিকেলে টাউন হলে প্রকাণ্ড মিটিং হল। যোগীন ডাক্তারের মৃত্যুতে শোক-সভা। 'শিশুর মত সরল মন, নিশুক মানুষ ছিল ডাক্তার। কিন্তু ঐ যে বললাম—, মিটিঙ সেরে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে সাব-রেজিস্ট্রারকে এক সময়ে বলছিল চেয়ারম্যান মোহিনী নন্দী। 'প্রেজেন্ট জেনারেশনটাকে ধরতে পারেনি যোগীন সেন। একটু বেশি রাত্রে নয় দু'টি ছেলে মেয়ে বেরিয়েছিল বেড়াতে তার জন্তে শেষ পর্যন্ত মাথা গরম ক'রে এই!'

'গোড়া থেকেই কেমন একটু পাগলাটে ধরণের ছিল, তুমি লক্ষ্য করনি?' ভুরু কুঁচকে মুরারি হাজরা মন্তব্য করছিল।

'আমরা অবশ্য তথাকথিত সেন্টিমেন্টাল প্রেমের পক্ষপাতী নই, কিন্তু তাই বলে বাস্তবিকই যদি এই শহরের একটি যুবক ও একটি তরুণী হৃদয়-ধর্মকে উপেক্ষা করতে না পারার মতন দুর্বল ও অসহায় থেকে যায় তবে কি তাদের প্রাণে মেরে ফেলতে হবে—অভিভাবকের এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তির আমরা প্রশংসা করতে পারি না,' প্রস্তাব করছিল পুলিশ সাহেবের স্ত্রী স্বয়ং অপরাজিতা দেবী মহিলা সমিতির জরুরী এক মিটিং ডেকে। আর সেই সভায় পুলিশ সাহেবের স্ত্রীর পাশে নিরঞ্জন রায় তো ছিলেনই অকস্মাৎ রায়-গিন্নী মানে সশরীরে শ্রীমতী পপিকে উপস্থিত থাকতে দেখে কেউ কেউ অবাক হয়েছিল। সভাটভা কোনদিনই তিনি পছন্দ করতেন না। একটু আগে পপি পুলিশের কাছে ষ্টেটমেন্ট দিয়ে এসেছিল, এবং সেখানে ব'লে এসেছিল তাদের বৈঠকখানার ঘরটা কর্মচারী হিসাবে নিশানাথকে মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দেয়া হত যেমন দেয়া হ'ত ষ্ট্ুডিবেকারটা এবং রাত এগারোটায় বাংলোর সব বাতিটাতি নিজের হাতে নিভিয়ে দিয়ে আগে মিঃ রায়কে শোবার ঘরে পাঠিয়ে পরে নিজে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর বাইরে কি ঘটনা ঘটেছিল সে বলতে পারে না। গুলীর আওয়াজ শুনে তাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একসঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়, এবং তখন তারা বেরিয়ে আসে…

কেন জানি, কোনো শোক-সভায় সেদিন উপস্থিত না থেকে দুই বন্ধু, মানে পঙ্কজ গুপ্ত ও হীরেন পালিত প্যারাডাইজের একটা খুপ্‌রিতে বসে খাচ্ছিল আর চাপাগলায় কথা বলছিল।

'যাই বলিস রায়-গিন্নীর আক্কেল ঠিক আছে, ছোঁড়ার সঙ্গে যতই

ঢলাঢলি করুক না, পপি নিরঞ্জন রায়কে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করল, নয়তো ডাক্তারের ষ্টেটমেণ্টে রায় এতক্ষণে অ্যারেষ্টেড হয়ে যেতো—'

'আরে বাবা পয়সা,—যতক্ষণ রায়ের প্রপার্টি আছে ততক্ষণ পপি জোঁকের মত ওর গায়ে লেগে থাকবেই—ভুঁড়ি মোটা মেড়ো বলে এমনি নাক সিঁটকালে কি হবে।'

'যা বলেছিস। তোর সূর্যমুখীর খবর কি?' হীরেন গুপ্ত হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল।

'চলে যাচ্ছে, আজ বিকেলের গাড়িতেই তো চলে যাবার কথা জানি।' পঙ্কজ ফোঁস ক'রে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'অন্য একটা শহর থেকে নাকি খুব ভাল অফার এসেছে—'

'এ শহরের মত, ওখানেও খুব প্রগতি টগতি চলছে তো—' মুচকি হেসে বলছিল হীরেন পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে।

নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেবদারুর মাথায় শেষ রৌদ্রের শীর্ণ সোনালী রেখা আর অগুণতি পাখি দেখতে দেখতে অরুণাও বুঝি ভাবছিল সে কথা। বাক্স-বিছানা বাঁধাছাদা হয়ে গেছে ওর, রিক্সা ডাকতে গেছে ঝি মোতির মা। একটু আগে মোতির মা'র মুখে শুনছিল অরুণা। অটলবাবু নাকি ছেলের ডেড-বডি দেখতে চাননি। সেই সকাল থেকে বুড়ো চেয়ারে উবু হয়ে ব'সে দু'হাতে মুখ ঢেকে একভাবে মাথা গুঁজে আছেন, সূর্যাস্তের পরও।

অরুণা হঠাৎ চমকে উঠল, রিক্সা নিয়ে মোতির মা নয়, ছোট মেয়েরা এসেছে অরুণাকে বিদায় দিতে। বাইরে গাছপালার রং কালো হয়ে গেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে আকাশ।

সমাপ্ত